আমাদের কোন্নগর

আমাদের কথা

শ্রদ্ধেয় ডাঃ নীলমণি বন্দ্যোপাধ্যায় শুধু লব্ধপ্রতিষ্ঠ চিকিৎসক নয়, সাহিত্যে তাঁর যেমন আগ্রহ, কোন্নগরের পুরাতন তথ্য সংগ্রহে তেমনি উৎসাহী। তথ্য সম্বন্ধীয় তাঁর কয়েকটি রচনা কোন্নগর প্রকাশিকা ও বিভিন্ন পূজা সুভেনিরে প্রকাশিত হওয়ার পর অনেকে তাঁর রচনাগুলি পুস্তকাকারে প্রকাশ করার জন্য তাঁকে অনুরোধ করেন। প্রচার বিমুখ ডাঃ বন্দ্যোপাধ্যায় এ বিষয়ে নিশ্চেষ্ট থাকায় আমরা সেগুলি যথাসাধ্য সংগ্রহ করে কোন্নগরের ইতিহাস রচনা করতে প্রয়াসী হয়েছি। লেখাগুলি অনেকদিন আগের। ইতিমধ্যে কিছু কিছু ক্ষেত্রে তথ্যগত পরিবর্তন হয়েছে। সময়াভাবে সেগুলির পরিবর্তন করা সম্ভব হয়নি, ফলে আমরা দুঃখিত। ইতিহাসটিকে সর্বাঙ্গীণ করার জন্য আমরা আরও কয়েকজনের রচনা ইতিহাসটির মধ্যে সন্নিবেশিত করেছি। আশা করি ইহা সম্পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস বলে পরিগণিত হবে।

নরেন্দ্রনাথ দেব
সম্পাদক
১৬ই ডিসেম্বর ১৯৯৫

অমলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
প্রকাশক

কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন

কোন্নগর আইডিয়াল সোসাইটির সমবায় বিভাগ "মিউচুয়াল বেনিফিট ফান্ড"-এর সুবর্ণজয়ন্তী উৎসব উপলক্ষে আমরা 'আমাদের কোন্নগর' পুস্তক প্রকাশ করিতে উদ্যোগী হয়েছি। পুস্তকটির অধিকাংশই শ্রদ্ধেয় ডাঃ নীলমণি বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা বিভিন্ন পত্রিকা থেকে সংগৃহীত। পুস্তকটিকে আরও সমৃদ্ধ করতে সর্বশ্রী অনিলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, মুরারি মিত্র, রথিন চক্রবর্তী আমাদের সাহায্য করায় আমরা এঁদের কাছে কৃতজ্ঞ।

এ ছাড়াও আরও অনেকে অন্যান্য টুকিটাকি তথ্য সংগ্রহ বা অন্য বিষয়ে বিশেষভাবে অগ্রণী হয়ে সহযোগিতা করেছেন, তাঁদের নিকটও আমরা কৃতজ্ঞ। এই প্রসঙ্গে সর্বশ্রী প্রভাসলাল দাস, প্রণবকুমার দেব, রাসবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায় এবং শ্রীমতী অশোকা ঘোষ প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য।

শ্রীঅমলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
প্রকাশক

১৬. ১২. ৯৫

ডাঃ নীলমণি বন্দ্যোপাধ্যায়ের সংক্ষিপ্ত জীবনী

'আমাদের কোন্নগর' পুস্তকটি শ্রদ্ধেয় ডাঃ নীলমণি বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিত বিভিন্ন পত্রপত্রিকা থেকে সংগৃহীত। তাই তাঁর কিছু পরিচয় দেওয়া এখানে বাঞ্ছনীয় মনে করি।

শ্রদ্ধেয় ডাক্তারবাবু তাঁর শ্রীরামপুরের মাতুলালয়ে ১৩১৩ বঙ্গাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম ৺প্রসাদকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ও মাতার নাম ৺হরিদাসী দেবী। প্রথমে হরিগুরু মহাশয়ের পাঠশালায়, পরে নিম্নপ্রাথমিক বিদ্যালয় ও শেষে কোন্নগর হাইস্কুলে শিক্ষালাভ করেন, ১৯২৪ সালে ইংরাজী ছাড়া সব বিষয়ে লেটার নিয়ে প্রবেশিকা পরীক্ষায় জেলা স্কলারশিপ লাভ করেন। পরে প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে আই. এস. সি. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে কারমাইকেল কলেজ থেকে ডাক্তারী পাশ করেন। ১৯৩৩ সাল থেকে অদ্যাবধি তিনি গ্রামেতেই ডাক্তারী পেশায় নিযুক্ত। ডাক্তারী পড়ার সময় ও পরেও বিভিন্ন বিশিষ্ট ব্যক্তির সংস্পর্শে আসেন। চিরকাল তিনি অনাড়ম্বর ও সরল জীবন যাপন করে আসছেন। দিনরাত কোন সময়েই রোগীর সেবা করতে তাঁকে বিরক্তি প্রকাশ করতে দেখা যায় না। দীর্ঘকাল তিনি বিভিন্ন শিক্ষা,

সংস্কৃতি ও জনকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠানে সংযুক্ত থেকে নিরলসভাবে এখনও কাজ করে চলেছেন। ১৯৮০ সালে হরিপ্রসাদ মেমোরিয়াল ট্রাষ্ট ফাণ্ড গঠন করে শুধু স্বর্গত মাতাপিতার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন নি, ফাণ্ডের (১,৫০,০০০) টাকা বাবদ পাওয়া সুদ থেকে প্রতি বৎসর বিভিন্ন জনহিতকর প্রতিষ্ঠানও লাভবান হচ্ছেন। এছাড়াও কোন্নগর আরবন ডেভেলপমেণ্ট এণ্ড রিলিফ অরগানাইজেসন মারফৎ মাতৃসদনে মেডিক্যাল ও সারজিক্যাল ওয়ার্ড স্থাপনকল্পে ২,০০,০০০ টাকা দিয়েছেন এবং প্রতি বৎসর ঐ দুইটি ওয়ার্ডের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য ১,০০,০০০ টাকা দেওয়ারও ব্যবস্থা করেছেন।

আমরা শ্রীভগবানের নিকট ডাঃ বন্দ্যোপাধ্যায়ের দীর্ঘায়ু কামনা করি।

নরেন্দ্রনাথ দেব
সভাপতি

অমলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
সম্পাদক

সুবর্ণ জয়ন্তী উৎসব সমিতি

লহ প্রণাম

হে বীর, হে মহান সেবক,
নহ তুমি দেবতা, নহ মহাত্মা,
দশ ও দেশের সেবায় নিয়োজিত এক প্রাণ
এক আদর্শ চিকিৎসক।

তোমার নিরলস সেবায়, তোমার অসীম দানে
ধন্য মোরা, ধন্য মোদের গ্রাম.
আজিকার এই পুণ্য লগনে
লহ মোদের প্রণাম।

চিকিৎসা তোমার পেশা, সাহিত্য তোমার নেশা,
তোমার নিরহঙ্কারী মন, তোমার আত্মসংযম
কখনো পারেনি করিতে তোমারে গ্রাস
ব্যভিচার আর অর্থের লালসা।

অতন্দ্র প্রহরী চিকিৎসক তুমি, হে নীলমণি
মুমূর্ষু রুগীর রোগশয্যার,
দৃঢ় নির্ভীক সাহিত্যিক সমালোচক তুমি, হে নিখিলেশ
মাসিক পত্রিকা কোন্নগর প্রকাশিকার।

তোমার কর্ম, তোমার শিক্ষা
পাথেয় হোক মোদের
হে বীর, আজি দিয়ে যাও তুমি
তোমারই ব্রতে মোদের দীক্ষা।

পুষ্প চন্দনের অর্ঘ্য নয় যথেষ্ট, নয় তোমা যোগ্য
তোমার চেতনা, তোমার আদর্শ
যদি পারি রাখিতে অক্ষুণ্ণ
সেই হবে তোমা পরে মোদের প্রকৃত শ্রদ্ধার্ঘ্য ॥

রাজকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
সোসাইটির প্রবাসী সভ্য

এক নজরে কোন্নগর পৌরসভা

পৌরসভার সূচনা—১৬ই জানুয়ারী ১৯৪৪ সাল
প্রতিষ্ঠাতা পৌরপ্রধান—প্রয়াত নৃসিংহদাস বসু
প্রতিষ্ঠাতা উপ পৌরপ্রধান—প্রয়াত ননীগোপাল বসু

সীমা : পূর্বে—গঙ্গানদী
পশ্চিমে—পূর্ব রেল-এর পশ্চিম পাড়
উত্তরে—রিষড়া পৌরসভা
দক্ষিণে—উত্তরপাড়া-কোতরং পৌরসভা

আয়তন—১.৬৭ বর্গমাইল
ওয়ার্ড—১৯টি
জনসংখ্যা—৬৫ হাজার (প্রায়)
মোট হোল্ডিং—১১২০০
অফিসার ও কর্মচারী—২৭০ জন
অস্থায়ী— ,, ৬০ জন
পার্ক—১০টি
রবীন্দ্র মুক্তাঙ্গন—১টি
শ্মশান—৩টি
কবর স্থান—২টি
ট্রেঞ্চিং গ্রাউণ্ড—২টি
ওভার হেড জলের ট্যাঙ্ক—২টি
(মোট ২ লক্ষ ৫০ হাজার গ্যালন জল ধরে)
আণ্ডারগ্রাউণ্ড জলের ট্যাঙ্ক—২টি
গভীর নলকূপ—১১টি
টিউবওয়েল—৩২০টি
ট্যাপকল—৪০০টি
টাউনহল—১টি
হাসপাতাল—১টি

দুধের ডিপো—২টি
পুকুর—১৬টি
পারঘাট—১টি
প্রাথমিক বিদ্যালয়—৪টি
শিশু গ্রন্থাগার—১টি
পাকা রাস্তা—৯২ কিঃ মিটার
ইঁটের রাস্তা—৪০ কিঃ মিটার
কাঁচা রাস্তা—৪০ কিঃ মিটার
পাকা ড্রেন—৮০ কিঃ মিটার
আণ্ডারগ্রাউণ্ড ড্রেন—২ কিঃ মিটার
কাঁচা ড্রেন—৪৫ কিঃ মিটার
পাইপ লাইন—১০০ কিঃ মিটার
ল্যাম্প পোষ্ট—১৫৭০টি
ময়লা বহনকারী ট্রাক্টর—৬টি
ময়লা বহনকারী রিঃ ভ্যান—১৬টি
সাইকেল—৪টি
মোটর—১টি
অ্যাম্বুলেন্স—১টি
রোড রোলার (১০ টন)—১টি

* স্বাস্থ্যকেন্দ্র (Health Administrative Unit)—১টি (Under C. U. D. P-3)

উপ স্বাস্থ্য কেন্দ্র— —৬টি

● স্বাস্থ্য কেন্দ্র (Administrative Unit) Under I P P (8) —১টি

উপ স্বাস্থ্য কেন্দ্র —৭টি

In Memorium

Save them O God ! from ignorance
Have thy kindness on them all,
In this selfish world let them
Become a true Man to stand thy call.
Chance ever comes to serve
However little it may be
And who takes the opportunity
Never to miss ; none but he
Does, who is loved by thee,
Receives thy bliss, and through whom
Anyone gets his knowledge,
Doubtless it is
Ever he remains in the heart of all,
Being loved by them as an IDOL.

Late Prafulla Kumar Deb.

স্মরণে

শিশিরের কণা সম
একে একে হায় !
সব লোক যথাকালে
পরলোকে যায় ।।
যদিচ পড়ে না আঁখি
তাহাদের 'পরে ।
পূর্ণচন্দ্র সম কেহ
আলোক বিতরে ।।
জ্ঞানালোক দেন যিনি
এই স্থানে মম ।
শিবচন্দ্র দেব তিনি
দেবতার সম ।।

৺প্রফুল্লকুমার দেব

ধন্যবাদ জ্ঞাপন

কাগজের দর অস্বাভাবিক বৃদ্ধি পাওয়াতে পুস্তক প্রকাশ আজকাল খুবই ব্যয়সাধ্য হয়ে পড়েছে। "আমাদের কোন্নগর" বইখানি প্রকাশ করতে আমরা উদ্যোগী হয়েছি শুনে কোন্নগর সম্পর্কে আগ্রহী অনেকে আমাদের দিকে আর্থিক সহযোগিতার হাত প্রসারিত করায় আমরা অনুপ্রাণিত। এই প্রসঙ্গে এঁদের নাম উল্লেখ ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন আমাদের কর্তব্য বলে মনে করি।

ডাঃ পি. কে. ব্যানার্জী
শ্রীফাল্গুনী মুখোপাধ্যায়
,, রাসবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায়
শ্রীমতী ছায়া বন্দ্যোপাধ্যায়
,, শাশ্বতী দেব
,, স্বাগতা চ্যাটার্জী
শ্রীপ্রণয়কুমার সরকার
,, সমরেন্দ্রনাথ মিত্র
,, বিমলকুমার বেরা
,, গোপালকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়
,, মুরারিমোহন মিত্র
,, বিশ্বনাথ সামন্ত
,, সুনীতকুমার দেব
,, হরেন্দ্রনাথ মিত্র
,, গৌরমোহন সামন্ত
,, অজিতকুমার মণ্ডল

শ্রীসমরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়
,, গোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
,, শিশিরকুমার দত্ত
,, রজতমোহন মুখোপাধ্যায়
,, উদয়কুমার মুখোপাধ্যায়
,, রাজকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
,, অসিতবরণ মুখোপাধ্যায়
,, ভোলানাথ দে
,, সৌমেন ধাড়া
,, সুকুমার শাসমল
,, কৃষ্ণচন্দ্র দত্ত
,, শ্যামলকুমার দেব
,, প্রভাতকুমার দত্ত
,, দুলালচন্দ্র বিশ্বাস
,, ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
,, চঞ্চল মুখোপাধ্যায়

শ্রীদেবকুমার মুখোপাধ্যায়

সূচীপত্র

কোন্নগর-পরিচিতি

"পদ্য পাঠের কবির জন্মভূমি,
হে কোন্নগর, আমার প্রিয় যে তুমি।"
প্রশস্তি বাণী ললাটের চন্দন,
কবি কুমুদের এই অভিনন্দন।
সূর্যমুখীর এই সে পিতৃধাম,
বঙ্কিম যার অমর করেছে নাম।
পূর্ব সীমানা ঘিরে আছে ভাগীরথী,
পশ্চিমে আছে পূর্ব রেলের পাঁতি।
আমড়াতলার নালা আছে দক্ষিণে,
উত্তরসীমা বাঘখালে লহ চিনে।
দ্বাদশ দেউল শোভিত স্নানের ঘাট,
নিত্য যেথায় দেব সেবা পূজা পাঠ।
দৃষ্টি সবার করিবে আকর্ষণ,
অতি রমণীয় দৃশ্য যে সুশোভন।
হাটখোলা হতে হরসুন্দর আসি,
নিরমিল ঘাট কীর্তি যা অবিনাশী।
প্রায় দুইশত বছরের স্মৃতি ঘেরা,
এ ঘাট গ্রামের সকল ঘাটের সেরা।
শৈব মাধবানন্দের আশ্রম,
জাহ্নবী তটে শোভা অতি মনোরম।
আছে হরিসভা গ্রামের মধ্যিখানে,
মুখরিত হরিভক্তের নাম গানে।
আছে দক্ষিণে মনোমোহনের বাটি,
মদনমোহন মন্দির পরিপাটি।
দুই দেবধাম হয়ে আছে অভিভূত,
রামকৃষ্ণের চরণ ধূলায় পূত।
ব্রাহ্মসমাজে শিশু রবীন্দ্রনাথ,
এসেছে একদা ঋষি জনকের সাথ।
করিয়াছে গান ব্রহ্মের সঙ্গীত,
এ নহে স্বপন, ইতিহাসে চিহ্নিত।

রাজ মহিমায় শোভিছে রাজেশ্বরী,
গ্রামের দেবতা গ্রামের অধিশ্বরী।
মাঘী পূর্ণিমা দিবসেতে হয় পূজা,
ষোড়শী মূর্তি দেবী যিনি দশভূজা।
হেথায় রয়েছে শকুনতলার কালী,
অশেষ ভক্ত সাজায়ে পূজার ডালি
সমবেত হয় বৈশাখী শনিবারে,
কৃষ্ণপক্ষে নিশার অন্ধকারে।
অতিজাগ্রতা এই মহীয়সী মাতা,
হাজার ছাগের উষ্ণ রুধিরে স্নাতা।
দিনেমারদের 'ডক' ছিল এইখানে,
তেলকল সেথা হয়েছে সকলে জানে।
পুরানো ইঁটের পাঁজার চিহ্ন তার,
এখনো পাইবে খুলিয়া স্মৃতির দ্বার।
প্রসূতি সদন আছে দেখিবার মতো
ক্রমে ক্রমে যাহা হতেছে সুবিস্তৃত।
ভুলিতে পারি না শিবচন্দ্রের কথা,
গ্রামের সকল উন্নয়নের হোতা।
স্মৃতি বিজড়িত সকল প্রতিষ্ঠান,
গ্রামের জনক—তাঁরে দাও সম্মান।
নবজাগরণের আন্দোলনের নেতা
সমাজ সেবক, তাঁহার তুলনা কোথা?
হেথায় একদা দীনবন্ধুর টোলে,
শত ছাত্রের কলরব কোলাহলে।
ন্যায়ের চর্চা, উঠেছে স্মৃতির ধ্বনি,
সারা ভারতের পণ্ডিত শিরোমণি।
প্রতিদিন যেথা সকালে ও সন্ধ্যায়
শিক্ষা দিতেন মহামহোপাধ্যায়।
দয়ালচন্দ্র শিরোমণি নাম যার
রাজ পুরোহিত, প্রতীক তেজস্বিতার

শ্রীঅরবিন্দ জনক কৃষ্ণ ধন,
বিদ্যালয়ে যেই করেছে অধ্যয়ন,
সন্তান যার বিশ্বের গৌরব,
সেইখানে আজি সাহিত্য উৎসব।
ব্যবহার জ্ঞানে স্ফুরিত যাঁহার প্রভা,
সিনেট ভবনে যাঁর ছবি পায় শোভা,
ত্রৈলোক্যের এই গ্রামে বাসগৃহ,
সে কথা ভুলিয়া যেয়ো না তোমরা কেহ।
মিত্র কুলের প্রদীপ দিগম্বব,
তার বাসভূমি এই সে কোন্নগর।
প্রথম শেরিফ হয়েছেন ভারতীয়,
শ্রদ্ধাঞ্জলি তাঁরেও সকলে দিও।
অতুল মিত্র প্রযোজক অভিনেতা,
নাট্যকারের বাস যে আছিল হেথা।
গীতিনাট্য ও কৌতুক প্রহসন
রচনায় যাঁর নিপুণতা অতুলন।
শিবচন্দ্রের জ্ঞাতি ভ্রাতা-সন্তান
গিরীশ বাড়াল বিদ্যালয়ের মান।
নবগোপালের নাম কাহারা না জানে,
"ন্যাশনাল" বলে পরিচিত সবখানে।
হিন্দু মেলার ছিলেন কর্ণধার,
জাতি কল্যাণ স্বপ্ন যে ছিল তাঁর।
ভূগোল পাঠের শশীভূষণের ধাম,
স্মৃতি বিজড়িত এই সুপ্রাচীন গ্রাম।
তারাপ্রসন্ন বদান্য যাঁর দানে,
অযুত মুদ্রা শিক্ষার কল্যাণে
বিদ্যাভবন প্রসারণে হয়ে ব্যয়,
ঘোষিছে তাহার কীর্তি অক্ষয়।
রসায়নবিদ্ ইংরাজ ক্রাইপার
বলেছিল এই গ্রাম হোল ঘর তার
কারখানা হতে অন্নের সংস্থান
বহু মানুষের—তুলনা তাঁহার দান
ঘোষাল চণ্ডীচরণ বর্ষীয়ান,
পৌর শাসনে দক্ষ-কীর্তিমান।

ভিষকপ্রবর, তাঁহারে আজিকে স্মরি,
শ্রদ্ধা কুসুম দানি অঞ্জলি ভরি।
আর্ত, পীড়িত-রোগীর দুঃখ কথা
যাঁর অন্তরে জাগাল মর্মব্যথা
মানব দরদী দয়ালু পীতাম্বর,
শ্রদ্ধা জানাই তাহারে নিরন্তর।
প্রবীণ অতুল গঙ্গো মেজদা নামে,
পুর-প্রতিনিধিরূপে পরিচিত গ্রামে।
যজ্ঞেশ্বর বেদান্তে পণ্ডিত।
স্বামী নির্মল আনন্দ নামে স্মৃত,
ওঁকারমঠ স্থাপিলা হেথায় যিনি,
বহু ভক্তের গুরু মহারাজ তিনি।
আইনজ্ঞ যে বসু নৃসিংহ দাস
পুরনায়কের এইখানে ছিল বাস
কোন্নগরের প্রচুর প্রতিষ্ঠান
বহুকাল ব্যাপী ঘোষিবে তাঁহার দান।
কিশোরীমোহন সাহিত্য অনুরাগী
আইনচর্চা করিত যে রাত জাগি।
রচিল কাব্য কর্মের অবসরে
কাব্যামোদীরা এখনো তাহারে স্মরে।
গজেন্দ্র ছিল নৃসিংহ সহচর
নীরব যদিও বিদ্যায় ভাস্বর।
শরৎকুমার দেব, সদাশয় অতি
সমাজ সেবায় রত-চিকিৎসা ব্রতী
দীনের বন্ধু তাঁহারে স্মরিয়া আজি,
অর্ঘ সাজাই ভরি শ্রদ্ধার সাজি।
রাধিকা নাথের কৃতিত্ব বিবরণ,
রচিত গ্রন্থে—"ছন্দের প্রকরণ"।
জ্যোতিষ চন্দ্র কর্মী নিষ্ঠাবান,
বিদ্যাভবনে আছে যার অবদান।
কৃতী শিক্ষক রামগোপালের স্মৃতি
আছে অমলিন,—ছাত্রগণের প্রীতি
যতীন্দ্রনাথ বাগ্মী শিক্ষাব্রতী
গান্ধী ভক্ত, বৈষ্ণব মহামতি।

সত্যচরণ গড়েছেন সমবায়,
উপকৃত সবে, আজো তার যশ গায়।
ননীগোপালের পূর্তে বিদ্যাজ্ঞান,
মূর্ত করেছে সমাজ প্রতিষ্ঠান।
রূপেন মিত্র বিচারক স্মরণীয়,
হাইকোর্টে যিনি,—সম্মান তাঁরে দিও
আজো জাগরূক ইন্দ্রনাথের স্মৃতি
কংগ্রেস নেতা, সাহিত্যে ছিল প্রীতি।
জেলা সাহিত্য সভা করি আহ্বান,
পাঠচক্রের বাড়াল যে সম্মান।
দেশের সেবায় সহেছে নির্যাতন
স্বদেশপ্রেমিক বিপ্লবী নিবারণ।
তন্তুশিল্পে ললিতমোহন গুণী
নীরব কর্মী কত সুখ্যাতি শুনি
জৈন ধর্ম, দর্শন জ্ঞানে সুধী
হরি সত্য যে কাটাইল নিরবধি।
স্নাতকোত্তর আচার্য পদে বৃত।
প্রিয় যার ছিল সাহিত্য সংস্কৃত।
তুলসীচরণ ছিলেন মিষ্টভাষী।
সমাজ সেবক সদামুখে ছিলো হাসি।
খেলার মাঠেতে "বড়বাবু" নাম যাঁর
নলিনী মিত্র—স্মৃতি মনে রেখ তাঁর
হিন্দু সভার আদর্শে বিশ্বাসী,
রমনীকান্ত কোন্নগরেতে আসি।
শিক্ষক পদে হয়েছিল সমাসীন,
সোধিতে নারিবে ছাত্রেরা তাঁর ঋণ।
দন্তবিদ্যা বিশারদ বঙ্কিম,
কল্যাণকামী গ্রামের অকৃত্রিম
যাঁর চেষ্টার অভাব ছিল না কোনো
শ্রদ্ধা জানাই তাঁহারে পুনঃ পুনঃ

শিশির মিত্র প্রাচ্য সংস্কৃতির
অভিজ্ঞ সুধী বিদ্বান অতি ধীর
অরবিন্দের জীবনী রচনা যাঁর,
পেল প্রতিষ্ঠা, তাঁহারে নমস্কার।
সুধীর চন্দ্র ক্রীড়া অন্ত যে প্রাণ
ওলিম্পিকের বাড়াল খেলার মান।
রাতের আঁধারে লণ্ঠন নিয়ে ঘুরে
খেলোয়াড়দের দিত সচেতন করে।
শ্যামাচরণের নিষ্ঠা, অকুতোভয়
তরুণ সঙ্ঘে হয়ে আছে অক্ষয়।
অরবিন্দের ভক্ত যে মতিমান,
অনুবাদে যাহা হয়েছে সপ্রমাণ
প্রভাত কুসুম শিক্ষণ সৌরভে
আমোদিত করে ছাত্র সমাজে সবে।
এই সব যত পূর্বসূরীর ঋণ
করহ শপথ, ভুলিবে না কোনদিন।
শ্রদ্ধার মালা রচি অক্ষম হাতে
জানাই প্রণতি আর সবাকার সাথে
জন্মভূমির ইতিহাস দিনু তুলে
পবিত্র যাহা গঙ্গার উপকূলে।
সপ্ত ডিঙায় সাজাইয়া মধুকর,
এই নদীপথে শ্রীমন্ত সদাগর।
উজায়ে সাগর গিয়েছিল সিংহলে,
বিপ্রদাসের পুঁথি সেই কথা বলে।
কবিকঙ্কণ চণ্ডীর পাল্লা গানে,
কোন্নগরের নাম আছে সেইখানে।
দীনবন্ধুর লেখা সুরধুনী কথা,
কোন্নগরের নাম পাইবেও তথা।
ইতিহাসে অতি পরিচিত এই গ্রাম
আমাদের প্রিয় কোন্নগরের নাম।

নিখিল ভারত বঙ্গসাহিত্য সম্মেলন, হুগলী শাখা আয়োজিত আঞ্চলিক সম্মেলন উপলক্ষ্যে প্রকাশিত।

"আমাদের দেশে প্রাচীনকাল থেকে সংস্কৃতময় সমস্ত বিদ্যা থাকার দরুন, বিদ্বান এবং সাধারণের মধ্যে একটা অপার সমুদ্র দাঁড়িয়ে গেছে। বুদ্ধ থেকে চৈতন্য, রামকৃষ্ণ পর্যন্ত,—যাঁরা 'লোকহিতায়' এসেছেন, তাঁরা সকলেই সাধারণ লোকের ভাষায় সাধারণকে শিক্ষা দিয়েছেন।"

—বিবেকানন্দ

কোন্নগর প্রসঙ্গে

কোন্নগর নামের উৎপত্তি ঃ কোন্নগর নামের উৎপত্তি বিষয়ে তিনটি মত প্রচলিত আছে।

(ক) অতীত কালে এখানে কুমার নামে এক রাজার রাজধানী ছিল। ঐ রাজধানীর উত্তর দিকের পরিখা ছিল বাঘের খালে, আর আমড়াতলার খাল ছিল দক্ষিণ দিকের পরিখা—পূর্ব সীমা দিয়া ভাগীরথী নদী প্রবাহিত হত এবং পশ্চিম সীমানায় অবস্থিত ছিল ঘন জঙ্গল ও জলাকীর্ণ ডানকুনির জলা। প্রাকৃতিক আবেষ্টনীর দ্বারা পরিবৃত থাকায় এই স্থানে শত্রুপক্ষের আক্রমণ সহজসাধ্য ছিল না। গড় বেষ্টিত এই ভূভাগ এক সময় কুমারগড় বা কুমার-নগর নামে অভিহিত হত। পরবর্তীকালে কুমারগড় অথবা কুমারনগর কোন্নগরে রূপান্তরিত হয়েছে। প্রবাদ এই যে হাতীর কুল অঞ্চলে কুমার রাজার হাতীশালা ছিল এবং বাঘের খালের নিকটবর্তী অঞ্চলে বাঘের বাস ছিল।

(খ) কোন্নগর এক কায়স্থ প্রধান অঞ্চল। তাই এই অঞ্চলের পূর্ব নাম ছিল কায়েৎনগর। কায়েতনগর—কায়েথনগর—কাননগর—কেবাথ নগর—শেষ পর্যন্ত কোণ্‌নগরে পরিণতি লাভ করেছে।

(গ) অতীতে ভাগীরথীর প্রবাহ কোন্নগরের দক্ষিণাঞ্চলে কোণের আকারে অনুপ্রবিষ্ট ছিল। বিশেষতঃ কোন্নগরের অরবিন্দ রোডের চড়কতলা পর্যন্ত যে ভাগীরথীর স্রোত প্রবাহিত ছিল গ্রামবৃদ্ধদের কথায় তার সমর্থন পাওয়া যায়। বর্তমানে চড়কতলায় যে বর্তুলাকার প্রস্তরখণ্ড বুড়ো শিবরূপে পূজিত হচ্ছে—ঐ প্রস্তরটি জোয়ারের জলে তাড়িত হয়ে এক বৃক্ষকোটরে আশ্রয় লাভ করে। ঘটনাটি দেবানুগ্রহ বলে অনুমিত হওয়ায় বুড়ো শিবরূপে যত্ন সহকারে রক্ষিত হয়ে পূজার অধিকার লাভ করেছে। বিশেষতঃ ভাগীরথীর পরপারের লোকের নিকট এই অনুপ্রবিষ্ট নদীপ্রবাহ কোণের আকারে পরিদৃষ্ট হওয়ায় তারাই এই অঞ্চলকে কোণ্‌নগর বলে অভিহিত করেন। কিঞ্চিদ্ অধিক দেড়শত বছর পূর্বে হাটখোলার হরসুন্দর দত্ত প্রতিষ্ঠিত দ্বাদশ মন্দির ঘাটের চত্বরে উৎকীর্ণ শিলালিপিতে কোন্নগরের বানান কোণ্‌নগর রূপে লেখা আছে। বর্তমান কোন্নগর নাম যে পূর্ব প্রচলিত কোণ্‌নগরের পরিণতি—সেই সিদ্ধান্ত অত্যন্ত যুক্তিসঙ্গত বলেই মনে হয়।

অবশ্য ডঃ সুকুমার সেন—বাংলার গ্রাম নাম প্রসঙ্গে ডানকুনীর জলার এক কোণে অবস্থিত বলে এই অঞ্চলকে কোন্নগর বলা হয়—এইরূপ অভিমত প্রকাশ করেছেন। কিন্তু ডানকুনির মাঠ হাওড়া জেলার শালকিয়া অঞ্চল থেকে

পশ্চিমে ব্যান্ডেল পর্যন্ত বিস্তৃত। ঐ মাঠের পূর্বদিকের কোণে একাধিক গ্রাম অবস্থিত। অন্য কোন অঞ্চলের নাম কোন্নগর না হয়ে শুধু আমাদের এই অঞ্চলই শুধু কোন্নগর নামে পরিচিত হবে কেন তার কোন যৌক্তিকতা না থাকার এই অভিমত গ্রহণযোগ্য বলে স্বীকার করা যায় না।

কোন্নগরের প্রাচীনতা ঃ বিশ্বাস করার যথেষ্ট কারণ আছে যে সপ্তম অষ্টম শতকে ভাগীরথীর মূল প্রবাহ সরস্বতী দামোদর রূপনারায়ণের সম্মিলিত খাতে তমলুক বন্দরের পাশ দিয়া নিম্নগামী হয়ে সমুদ্রে মিলিত হত। অপর একটি প্রবাহ আদিগঙ্গার খাতে জলধারা বহন করে বহু শাখায় বিভক্ত হয়ে বঙ্গোপসাগরে পতিত হত। ১৪৯৫ খ্রীষ্টাব্দে রচিত বিপ্রদাস পিপলাইয়ের মনসা মঙ্গলে চাঁদ সদাগরের সিংহল গমনের যাত্রাপথের বর্ণনা প্রসঙ্গে কোন্নগর, রিষড়া, বালী, খড়দহ, চিত্রপুর প্রভৃতি গ্রামের সঙ্গে আদি গঙ্গার তীরবর্তী কালীঘাট, বারুইপুর, ছত্রভোগ, বদরিকাকুণ্ড প্রভৃতি গ্রামেরও উল্লেখ দেখা যায়। ভাগীরথীর এই দুই প্রবাহ পথের মধ্যবর্তী দক্ষিণ বঙ্গের এইসব অঞ্চল অগভীর জলাভূমি পরিবৃত ছিল। পলি পড়ার ফলে জমির উন্নয়নে জনবসতির উপযুক্ত ভূভাগ সমূহে পরবর্তীকালে গ্রামের পত্তন হয়। ডানকুনির জলা আজও সেই পূর্বস্মৃতি বহন করে বিদ্যমান রয়েছে। সুতরাং দক্ষিণ বঙ্গের আরামবাগ মহকুমা ও সন্নিহিত স্থান ব্যতীত সমস্ত অঞ্চলই অপেক্ষাকৃত অর্বাচীন।

কোন্নগরের বয়স সম্বন্ধে কোনও পাথুরে প্রমাণ আমাদের হাতে নেই। তবে স্বর্গীয় উপেন্দ্রনাথ জ্যোতিরত্ন মশাই বসুমতী মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত হুগলী জেলার ইতিহাসে উল্লেখ করেছেন যে শ্রীঅরবিন্দ ও ক্রাইপার রোডের সংযোগস্থলের কিছু দক্ষিণ পশ্চিমে অবস্থিত দীঘিটির খননকালে মৃত্তিকা গর্ভে জাহাজের মাস্তুলের ভগ্নাবশেষ পাওয়া গিয়েছিল। তাঁর ধারণা এক সময় ভাগীরথী নদী ঐ অঞ্চল দিয়ে প্রবাহিত হত। গ্রামবৃদ্ধদের কাছ থেকে শোনা বিবরণ থেকে চড়কতলা পর্যন্ত ভাগীরথীর জলধারা প্রবাহের কথা আমি ইতিপূর্বেই উল্লেখ করেছি। নদীর পাশ্বর্বর্তী অঞ্চলে জনবসতির অবস্থান সম্ভাব্যতার পর্যায়ের মধ্যে পড়ে।

পুঁথিগত প্রমাণের মধ্যে ইতিপূর্বে ১৪৯৫ খ্রীষ্টাব্দে রচিত বিপ্রদাসের মনসা মঙ্গলের কথা উল্লেখ করেছি পরবর্তীকালে ঘনরামের তীর্থমঙ্গল ও অন্যান্য একাধিক মঙ্গল কাব্যেও কোন্নগরের উল্লেখ দেখা যায়। তবে কোন্নগরের সর্ব প্রাচীন উল্লেখ দেখ যায় **A. K. Roy** লিখিত **Lakhmi Kanta** গ্রন্থে। (১৫ এবং ৪৪ পৃষ্ঠায়)। ঐ গ্রন্থে তিনি গাঙ্গুলী বংশীয় সাবর্ণ চৌধুরীগণের আদিপুরুষ পাঁচু শক্তি খান কর্তৃক ১৪৫০ খ্রীষ্টাব্দেরও পূর্বে হালিসহর সমাজের প্রতিষ্ঠা প্রসঙ্গে বিক্রমপুর হইতে বৈদ্যগোষ্ঠী ও কোন্নগর হইতে

সম্ভ্রান্ত কায়স্থ পরিবার আনিয়া ঐ সমাজের পূর্ণতা প্রদান করার কথা উল্লেখ করেছেন।

সুতরাং ১৪৫০ খ্রীষ্টাব্দে যে কোন্নগরে সম্ভ্রান্ত কায়স্থ পরিবারের বসবাস ছিল তার নির্ভরযোগ্য প্রমাণ পাওয়া গেল। অতএব কোন্নগর গ্রামের অস্তিত্বকে আরও দু'শ বছর পেছিয়ে নিয়ে যাওয়া নিশ্চয়ই অসঙ্গত হবে না।

তাছাড়া ইংরেজ রাজত্বের প্রতিষ্ঠা হওয়ার পূর্বে বাংলা দেশের গ্রাম সমূহ যে স্বনির্ভর ছিল এ অনুমান অসঙ্গত নয়। সুতরাং কায়স্থ সমাজের সঙ্গে এখানে ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কৃষক, ব্যবসায়ী, তন্তুবায়, কর্মকার, কুম্ভকার, জালিক প্রভৃতি সকল সম্প্রদায়েরই মানুষের যে এখানে বসবাস ছিল এ ধারণাও কল্পিত নয়।

ইংরেজ আমলে কলিকাতায় রাজধানী প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় জীবিকা অর্জনের সুযোগ সুবিধা নিকটবর্তী অঞ্চলে বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে বাংলা দেশের দূরবর্তী অঞ্চলের অধিবাসীগণ এই অঞ্চলে বসতি স্থাপনে উৎসাহিত হয়েছে। এবং সেই ধারা যে এখনও অব্যাহত রয়েছে সে বিষয়েও সন্দেহের কোন অবকাশ নেই।

কোন্নগরে জনবসতির পরিসংখ্যান ও বৈচিত্র্য : কোন্নগরে জনবসতির ঘনত্ব এখন যে পর্যায়ে উপনীত হয়েছে তা এক জটিল সমস্যার সৃষ্টি করেছে। কোন্নগরের জনসংখ্যা বর্তমান শতাব্দীর গোড়ার দিকে ৪।৫ হাজারের বেশী ছিল বলে মনে হয় না। কিন্তু বর্তমানে তা ৫০ হাজারে গিয়ে পৌঁছেছে। যদিও ১৯৭৯ সালের আদম সুমারীর হিসাব অনুযায়ী তা ৪০০০০ অধিক নয়। ফলে গ্রামের ২।৩ ভূভাগের ধানচাষের জমি বাগান জমি অথবা জঙ্গল হিসাবে যা বাসের অযোগ্য বলে বিবেচিত সে সব অঞ্চল প্রয়োজনের তাগিদে বাস্তুজমিতে রূপান্তরিত হয়েছে। এমনকি মিউনিসিপ্যালিটীর ট্রেঞ্চিংগ্রাউণ্ড সংলগ্ন অঞ্চল যা ইতিপূর্বে কোনদিন বাসযোগ্য বলে ধারণা করা যেত না সেইসব অঞ্চলেও বাসগৃহ নির্মিত হয়েছে। বাসযোগ্য জমির অভাবের ফলে পুকুর ভরাট করা জমিতেও বাসভবন নির্মিত হচ্ছে। এ সমস্যা কোন্নগর এলাকার একার নয়, ভাগীরথীর উভয় তীরবর্তী সমস্ত শিল্পাঞ্চলই একই সমস্যার সম্মুখীন হয়েছে। বর্তমান শতাব্দীর গোড়ার দিকে কলিকাতা নগরীতে জীবিকা অর্জনের সুযোগ সুবিধাই ছিল এসব অঞ্চলে জনবসতির প্রধান আকর্ষণ। কিন্তু এই শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে বিশেষতঃ দেশ বিভাগের পর শিল্পাঞ্চলে জীবিকার্জনের সুযোগ সুবিধা প্রশস্ততর হওয়ার ফলে পূর্ববঙ্গ থেকে আগত উদ্বাস্তুগণ এইসব শিল্পপ্রধান অঞ্চলকে তাদের বাসভূমিরূপে নির্বাচিত করেছে। জীবিকা অর্জনের সুযোগ সুবিধার তুলনায় জনসংখ্যার চাপ অতিরিক্ত হওয়ায় বসবাসকারী জনগণের শিক্ষা স্বাস্থ্য পরিবহনব্যবস্থা

ও খাদ্য সমস্যাও ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে। বস্তুতঃ, চাকরী ব্যতীত জীবিকার অন্যান্য সহজলভ্য পথের সন্ধান যতদিন না অনায়াসলভ্য হচ্ছে ততদিন পর্যন্ত সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা, সাহস ও ধৈর্যের সঙ্গে এইসব সমস্যার সম্মুখীন হওয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই। দরিদ্র ও উন্নয়নশীল দেশ সমূহের কাছে এই পরিস্থিতি জীবন মরণ সমস্যার সমাধানের এক সুবিপুল সংগ্রামের আহ্বান।

শিল্পাঞ্চলরূপে পরিগণিত এই পৌর এলাকার অধিবাসী ব্যতীত জীবিকার সন্ধানে আগত অনান্য প্রদেশের অধিবাসীর সংখ্যাও এখানে নগণ্য নয়। বহিরাগত মানুষের মধ্যে বিহার, উড়িষ্যা, উত্তরপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, অন্ধ্র প্রভৃতি রাজ্যের অধিবাসীর সংখ্যাই বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

এক সময় অর্থাৎ ৭।৮ দশক আগে কলকারখানার শ্রমিকের কাজ করা বাঙালী মধ্যবিত্ত ঘরের যুবকের কাছে অপমানসূচক বলে মনে হত। তারা সরকারী অথবা আধা সরকারী প্রতিষ্ঠান ও সওদাগরী অফিসের কেরানীগিরি করা, অন্ততঃ স্কুল কলেজের শিক্ষকতাকে অধিকতর সম্মানজনক মনে করে সেই সকল উপজীবিকার প্রতি বিশেষ আকর্ষণ অনুভব করত।

বর্তমানে চিকিৎসা বিজ্ঞানের উন্নতির এবং প্রতিষেধক ও আরোগ্যকর ঔষধ সমূহের আবিষ্কারের ফলে ম্যালেরিয়া, কলেরা, বসন্ত, উদরাময় প্রভৃতি রোগে মৃত্যুহার যথেষ্ট হ্রাস পাওয়ায় জনসংখ্যা দ্রুতহারে বৃদ্ধি পাচ্ছে। দেশ বিভাগের পর ভারতের জনসংখ্যা ৪০ কোটি থেকে প্রায় ৭০ কোটিতে পরিণত হয়েছে। অথচ প্রয়োজনের তুলনায় উপার্জনের ক্ষেত্র সীমিত হওয়ায় তথাকথিত উচ্চশ্রেণীর মানুষেরাও কলকারখানার চাকুরী গ্রহণে বাধ্য হচ্ছে। এখানেও তাদের বিরাট প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হতে হচ্ছে। কারণ শ্রমসাধ্য কাজে বাঙালী যুবকদের অনীহা ও অক্ষমতার ফলে অন্যান্য রাজ্যের অধিবাসীগণ বাঙালীদের তুলনায় এই ধরনের চাকুরীর সুযোগ গ্রহণে অধিকতর তৎপরতা প্রদর্শন করছে।

সাম্প্রদায়িক বিন্যাস বর্ণগত বিন্যাস এবং উপজীবিকা : কোন্নগর পৌর এলাকায় হিন্দু ধর্মাবলম্বী অধিবাসীদের সংখ্যা শতকরা ৯২ ভাগের মত। মুসলমান ধর্মাবলম্বী অধিবাসী শতকরা ৮ ভাগের মত। ভিন্ন রাজ্যের অধিবাসীদের মধ্যে হিন্দু মুসলমান ব্যতীত চাকুরী ব্যপদেশে কয়েকটি শিখ ধর্মাবলম্বী পরিবার এখানে বাস করে। মুসলমান সমাজ শ্রেণীহীন হলেও বর্ণবিভাগ হিন্দু সমাজের বৈশিষ্ট্য। ব্রাহ্মণ, কায়স্থ ও মাহিষ্য সম্প্রদায়ের বাহুল্য সত্ত্বেও তথাকথিত ছত্রিশ জাতের অধিবাসীদের সংখ্যাও নগণ্য নয়। হাড়ি, বাগদী, ডোম ব্যতীত কয়েক ঘর সাঁওতাল উপজাতিও এখানে বাস করে। সম্প্রদায় ও বর্ণগত বিভেদ সত্ত্বেও অধিকাংশের উপজীবিকা চাকুরী।

সওদাগরী অথবা সরকারী ও আধা সরকারী আফিস, ব্যাঙ্ক, রেলওয়ে, ডাক বিভাগে চাকুরীই অধিকাংশের উপজীবিকা—বর্তমানে কলকারখানায় শ্রমিকের সংখ্যাও যথেষ্ট পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়েছে। জীবিকা হিসাবে শিক্ষকতাও উল্লেখের দাবী রাখে। উকীল, ডাক্তার ও ইঞ্জিনীয়ারের সংখ্যা অঙ্গুলীমেয়। কিছুসংখ্যক লোক মুদিখানা, মণিহারী দোকান ও অন্যান্য নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষের বিক্রয়ের মাধ্যমে জীবিকা উপার্জন করে। এক সময়ে রাজমিস্ত্রী অথবা দর্জিমিস্ত্রীই ছিল এখানকার মুসলমান সম্প্রদায়ের প্রধান উপ-জীবিকা। এখনও ঐ ধরণের কাজে তাদের সংখ্যাধিক্য থাকলেও কলকারখানায় শ্রমজীবী অথবা চাকুরীজীবীর সংখ্যাও যথেষ্ট।

সম্প্রদায় হিসাবে হিন্দুরাই এই অঞ্চলের আদিম অধিবাসী। এখানকার ভূভাগ বাসযোগ্য হলে নদী ও কৃষিনির্ভর মানুষেরা এখানে বসতি স্থাপন করে। এখনও নদীতীরবর্তী অঞ্চলে মৎস্যজীবী সম্প্রদায় এবং গ্রামের মধ্যবর্তী অঞ্চলে চাষী কৈবর্ত সম্প্রদায়ের আধিক্যই তার সাক্ষ্য বহন করছে।

কোন্নগরের অধিবাসী উচ্চবর্ণ গোষ্ঠীর মধ্যে ব্রাহ্মণ কায়স্থ সম্প্রদায়ই উল্লেখযোগ্য। কোন্নগরের দক্ষিণ পাড়ায় বৈদ্যবাগান বৈদ্য সম্প্রদায়ের স্মৃতি বহন করলেও বর্তমানে ঐ অঞ্চলে একঘর বৈদ্যও বাস করে না।

ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ সম্প্রদায় উভয়েই কোন্নগরে নবাগত,—বিদ্যা, বুদ্ধি, আর্থিক সঙ্গতি ও ভূ-সম্পত্তির অধিকারিত্বের ফলে তাঁরাই সামাজিক মর্যাদায় অগ্রগামী। কায়স্থ পরিবারের অধিকাংশেরই আদি নিবাস ২৪ পরগনা জেলার দক্ষিণাঞ্চলে। ব্রাহ্মণ পরিবারের অধিকাংশেরই আদি নিবাস হুগলী জেলার পশ্চিমাঞ্চলে আরামবাগ মহকুমা অথবা চন্দননগর মহকুমায়। যশোহর, খুলনা অথবা পূর্ববঙ্গের অন্যান্য অঞ্চল থেকেও কিছু পরিবার এখানে এসেছেন।

মুসলমান অধিবাসীদের কোন পরিবারই ষোড়শ শতাব্দীর পূর্বে কোন্নগরে আসেন নি। মনে হয় আকবরের রাজত্বকালে তোডরমল কর্তৃক বাংলা দেশের জমি জরিপের সময় কিছু মুসলমান সেনা এবং রাজকর্মচারী তাঁর সহগামী ছিল। তারা মহম্মদী বেগ নামক এক জায়গীরদারের অধীনে কোন্নগরের উত্তরাঞ্চলের আলিনগরের নিকট বসতি স্থাপন করে। স্থানীয় নিম্নশ্রেণীর ধর্মান্তরিত হিন্দু এবং পশ্চিমাগত মুসলমানগোষ্ঠীর সমবায়ে এখানকার মুসলমান সমাজের সৃষ্টি হয়। ঐ সমাজের একদল যারা মূলতঃ কাঠচেরার কাজে নিযুক্ত ছিল তারা কোন্নগরের মধ্যাঞ্চলে বসতি স্থাপন করে—ফলে ঐ অঞ্চল করাতিপাড়া বলে পরিচিত হয়। মুসলমান অধ্যুষিত অঞ্চল হিসাবে মিউনিসিপ্যাল রেজিস্টারে ঐ স্থান মুসলমান পাড়ারূপে চিহ্নিত। সেচের উন্নতিকল্পে মহম্মদী বেগ যে খাল খনন করেন তাকে প্রথমে বেগের

খাল বলা হত। পুরাতন বেগের খালই বর্তমানে বাঘের খালে রূপান্তরিত হয়েছে।

কোন্নগরের ঐতিহ্য ঃ কোন্নগরের ঐতিহ্য মূলতঃ ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ সম্প্রদায়কে ঘিরে গড়ে উঠেছে। ন্যূনাধিক ৭০০ বছরের ইতিহাসে এখানকার আদিম অধিবাসী হাড়ি ডোম বাগদী দুলে কেওড়া প্রভৃতি সম্প্রদায়ের সাংস্কৃতিক চেতনা এত নিম্নস্তরের যে তাদের পক্ষে কোন উল্লেখযোগ্য সাংস্কৃতিক নিদর্শন প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হয়নি। বর্তমান শতাব্দীর চতুর্থ দশকেও আমরা কোন্নগরের ধর্মডাঙা অঞ্চলে বসবাসকারী ডোম সম্প্রদায়ের মধ্যে বৈশাখী পূর্ণিমায় ধর্মপূজা উৎসব পালন করতে দেখেছি। পশুবলি, এবং নাচ গান বাজনার মাধ্যমে কয়েকদিন ব্যাপী ঐ উৎসব পালিত হত। জীবিকার প্রয়োজনে তাদের প্রায় সকলেই বর্তমানে স্থানান্তরিত। দেশ বিভাগের পর ঐ অঞ্চলে পূর্ববঙ্গের উদ্বাস্তু উপনিবেশ স্থাপিত হওয়ার ফলে অবশিষ্ট দু একটি পরিবার স্থানত্যাগে বাধ্য হয়েছে। নামমাত্র অনুচ্চ একটি বেদীই ধর্মপূজার স্মৃতি বহন করে ধর্মডাঙা নামের সার্থকতা প্রমাণ করছে। বস্তুতঃ তথাকথিত জল অনাচারণীয় সম্প্রদায়ের হাড়ী বাগদী ডোম এবং দুলে গোষ্ঠীর অধিকাংশই বর্তমানে হয় স্থানচ্যুত অথবা একান্তে অপসৃত অশিক্ষা দারিদ্র্য স্বাস্থ্যরক্ষা বিষয়ে অজ্ঞতা অযত্নজনিত ব্যাধির প্রকোপে ভগ্ন-স্বাস্থ্য অকালমৃত্যুর শিকার এই সম্প্রদায় বর্তমানে দ্রুত অবলুপ্তির পথে অগ্রসর। ভবিষ্যতে দুলেপাড়া, বাগদীপড়া ডোমপাড়া প্রভৃতি যখন অন্যনামে পরিচিত হবে তখন এইসব সম্প্রদায়ের কথা কারো স্মৃতিপথে উদিত হবার কোন সম্ভাবনাও থাকবে বলে মনে হয় না।

বর্ণাশ্রম শাসিত হিন্দু সমাজে ব্রাহ্মণের নেতৃত্ব ছিল অবিসম্বাদী। কোন্নগরের উত্তরাঞ্চলে বহু পণ্ডিত পরিবারের বসবাস ছিল। তাঁদের চতুষ্পাঠীতে প্রধানতঃ ন্যায় ও স্মৃতির পাঠই দেওয়া হত। বহিরাগত বহু ছাত্রই—এমন কি বাংলা ছাড়া অন্যান্য প্রদেশের ছাত্ররাও এখানকার টোলে পাঠগ্রহণে আকৃষ্ট হত। সপ্তদশ থেকে ঊনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত প্রায় তিনশো বছর ধরে এখানকার পণ্ডিত সমাজের সারস্বত সাধনার পরিচয়ের নিদর্শন পাওয়া যায়। বর্তমানে সেই বিদ্যাচর্চার ধারা প্রায় সম্পূর্ণরূপে অবলুপ্ত হলেও ন্যায়ালঙ্কার ন্যায়রত্ন বিদ্যাভূষণ বিদ্যারত্ন বিদ্যাসাগর প্রভৃতি পণ্ডিত পরিবারের বংশধরগণ পূর্ব ঐতিহ্যের স্মৃতি বহন করে আজও বর্তমান। মহামহোপাধ্যায় দীনবন্ধু ন্যায়রত্নের শাস্ত্রজ্ঞান অসামান্য পাণ্ডিত্যের জন্য বিধবা বিবাহ সংক্রান্ত তর্কসভায় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে তাঁর উপস্থিতির কথা ইতিহাসের পাতায় পাওয়া যায় ও তাঁর বহুবিশ্রুত পিতামহ কাশীনাথ ন্যায়বাচস্পতি ও অন্যান্য সমকালীন বিদ্বৎবর্গের পাণ্ডিত্য

প্রভায় কোন্নগর যে এক সময় দ্বিতীয় নবদ্বীপরূপে পরিচিতি লাভ করেছিল সে কথা আজ কিম্বদন্তীতে পরিণত।

উপজীবিকাসূত্রে কায়স্থগণের শাসকবর্গের সহিত ঘনিষ্ঠ পরিচয় লাভের সুযোগ থাকায় তাঁদের কেউ কেউ রাজসরকারে উচ্চপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। কোন্নগরের মিত্র পরিবারের সঙ্গে সম্পর্কিত পীতাম্বর মিত্র সম্রাট শাহ আলমের সেনাপতি এবং ঘোষ বংশের মানিক চাঁদ নবাব সিরাজউদ্দৌল্লার সৈন্যাধ্যক্ষ-রূপে ১৭৫৬ সালের জুন মাসের যুদ্ধে ক্লাইভের সেনাবাহিনীকে পরাস্ত করার সময় যে সাহসের পরিচয় দেন তার পুরস্কার স্বরূপ কলিকাতায় শাসনকর্তার পদপ্রাপ্ত হন। তবে উহাদের কেহই পৈতৃক বাসভূমি কোন্নগরে বসবাস অথবা তার উন্নতিকল্পে তাঁদের পদমর্যাদাজনিত প্রভাব প্রয়োগ করেছিলেন বলে শোনা যায় না। পরবর্তী যুগে ইংরেজ রাজত্বকালে কোন্নগরের কায়স্থ পরিবারের একাধিক প্রতিভাবান পুরুষ উচ্চপদ ও প্রতিপত্তির অধিকারী হলেও একমাত্র শিবচন্দ্র দেব ছাড়া আর কেহই কোন্নগরের সমাজ জীবনের উন্নয়নে উল্লেখযোগ্য আগ্রহ প্রদর্শন করেন নি। এমনকি শ্রীঅরবিন্দ প্রমুখ ডাঃ কে. ডি. ঘোষের স্বনামধন্য পুত্রগণের মধ্যে কারুরই যে কোন্নগরের সমাজ-জীবনের সাথে আত্মিক যোগাযোগ ছিল এমন কোন নিদর্শন লক্ষণীয় নয়।

এখানে মুসলমানগণের অবস্থিতি ১২৫ বছরের অধিক নয়। কারুশিল্পই তাহাদের প্রধান উপজীবিকা। সংস্কৃতির ক্ষেত্রে পরলোকগত তফরেজ আলি মল্লিক এবং চারুশিল্পে ঈশা মহম্মদের কৃতিত্ব উল্লেখযোগ্য। ক্রীড়াজগতে এখানকার মুসলমান যুবকগণের অবদানও উল্লেখের দাবী রাখে। সাম্প্রতিক-কালে কয়েকজন উৎসাহী তরুণ ওয়াই. এম. এ প্রতিষ্ঠা করে সংস্কৃতিচর্চায় আন্তরিক প্রয়াসের দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন।

বিংশ শতকের প্রথমার্ধ পর্যন্ত ধর্মজগতে রক্ষণশীল মনোবৃত্তিসম্পন্ন হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে সামাজিক উৎসবে মিলিত হবার পথে যে বাধার সৃষ্টি করেছিল—স্বাধীনতাউত্তরকালে উভয় সমাজের উদার মনোভাবাপন্ন মানুষের প্রচেষ্টায় সেই ব্যবধান ক্রমশঃই অপসৃত হচ্ছে। এমন কি হিন্দু সমাজের উচ্চ এবং নিম্নবর্ণের মানুষেরাও সামাজিক উৎসবে ত বটেই এমনকি পারিবারিক ক্রিয়াকলাপেও একত্রে পান ভোজনে কোন দ্বিধা অনুভব করেন না।

রক্ষণশীল মনোবৃত্তির এই রূপান্তর যে শুভ লক্ষণ সে বিষয়েও সন্দেহের অবকাশ নেই। বস্তুতঃ ভারতবর্ষের দু-হাজার বছরের ইতিহাসে যেখানে একাধিক ধর্ম ও সমাজগত রক্তাক্ত সংঘর্ষের বিবরণে কলঙ্কিত সেখানে সম্প্রীতি ও সহমর্মিতা যে এক নূতন অধ্যায়ের সূচনার ইঙ্গিত বহন করছে সেকথা উল্লেখ করা বাহুল্যমাত্র।

পর্যায়ক্রমে বেদবাদী অনুষ্ঠান সর্বস্ব মীমাংসক ও শূন্যতাবাদী বৌদ্ধ বৈতণ্ডিকগণের অভ্যুত্থান ও বিপর্যয়ের মধ্য দিয়ে ধর্ম ও সমাজ মানসের রথচক্র যে উপল বন্ধুর পথের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয়েছে খৃষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতক থেকে খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত ভারতবর্ষের ইতিহাসের পাতায় শিশুনগর, মৌর্য, সুঙ্গ, কান্ব, অন্ধ্র, গুপ্ত, পাল, সেন, বর্মণ বংশের রাজত্বকাল তার সুনির্দিষ্ট সাক্ষ্য বহন করছে।

সভ্য সমাজের শ্রেণী বিভক্ত ও শ্রেণীহীনতার আওতার বাইরে ভূত, প্রেত, অথবা বৃক্ষ, সর্প অথবা অন্য বন্য প্রাণী উপাসক উপজাতিক সমাজের কথাও সমসাময়িক ইতিহাসে বর্ণিত আছে। রামায়ণ কাহিনীতে রামের সহিত গুহক, সুগ্রীব, হনুমান ও বিভীষণ প্রভৃতি, চণ্ডাল, বানর এবং রাক্ষস সমাজের প্রাণীগণের সখ্যতার পরিচয় পাওয়া গেলেও মহাভারতের কাহিনীতে অর্জুনের সহিত চিত্রাঙ্গদা ও উলুপী, ভীমের সহিত হিড়িম্বা ও শ্রীকৃষ্ণের সহিত জাম্ববতী প্রভৃতি বর্ণাশ্রম বহির্ভূত নারীর রক্ত সম্পর্ক স্থাপনের পরিচয়ও পাওয়া যায়। ব্যবহারিক প্রয়োজনে ধর্মীয় অচলায়তনের বন্ধনের শিথিলতা হিন্দু সমাজের মত বৌদ্ধ সমাজেও ঘটেছিল। বরং উপজাতীয় চিন্তাধারায় অনুপ্রবেশ বৌদ্ধ মহাযানী সমাজের মধ্যে এত ব্যাপকভাবে প্রসারলাভ করেছিল যে বৌদ্ধধর্ম তার মৌলিক চিন্তাধারা থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিল। চর্যাগীতির একাধিক পদের মধ্যে লৌকিক ধর্মের সহিত এই সংমিশ্রণের সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়।

পরবর্তীকালে তুর্কী অভিযানের পরে এমন কি মোগলযুগেও হিন্দু সমাজের নিম্নশ্রেণীর উপদ্রুত মানুষেরা ইসলাম ধর্মের শ্রেণীহীন সমাজে আশ্রয় নিয়ে মানসিক প্রশান্তি লাভের প্রয়াস পেলেও ধর্মান্তরিতরা বহিরাগত মুসলমানদের সহিত একাসনে প্রতিষ্ঠিত হতে পেরেছিল বলে মনে হয় না। এই হীনমন্যতাই তাদের প্রেরণা দিয়েছিল হিন্দু ও ধর্মান্তরিত মুসলমান সমাজের নিম্নশ্রেণীর মানুষকে নিয়ে এক নূতন সম্প্রদায় গড়ে তোলার— যারা নিজেদের আউল বাউল সাঁই ফকিররূপে পরিচয় দিয়ে থাকে। অন্তর দেবতাই এদের প্রধান উপাস্য—দেহবাদী হলেও প্রেমের বন্ধনই এদের কাছে মানুষের শ্রেষ্ঠ পরিচয়।

যুগে যুগে এদেশে হিন্দু বৌদ্ধ মুসলমান ধর্মাবলম্বীদের সহাবস্থান ও সম্প্রীতির মধ্যেই ভারতের ভবিষ্যৎ সমাজের চিত্র প্রতিফলিত। সেই উদ্দেশ্য নিয়েই কোন্নগরের ঐতিহ্য প্রসঙ্গে ভারতের ইতিহাসের ধর্মীয় বিবর্তনের দিগদর্শনের অবতারণা। **জগতের এক মহাজাতি হিসাবে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করতে হলে বিভেদ নয় সম্প্রীতিই যে মূলমন্ত্র একথা কোনদিন বিস্মৃত হলে চলবে না।**

(হিন্দু, বৌদ্ধ ও মুসলমান ধর্মের দার্শনিক ভিত্তিভূমি তথা মুসলিম ধর্মীয় দর্শনে জীব ও জড় জগতে ঈশ্বরের সর্বময় কর্তৃত্ব প্রশ্নাতীতভাবে স্বীকৃত। ঈশ্বরের অন্বয়ত্ব স্বীকৃত হলেও তাই স্বরূপশক্তি বহির্ভূত কোন ঐশ্বর্যের অস্তিত্বই এখানে অস্বীকৃত। বৈচিত্র্যধর্মী এই জগৎ ঈশ্বরের প্রসাদ (ফয়জ), যার ব্যবহারিক সত্তা স্বীকৃত হলেও পারমার্থিক অস্তিত্ব-মায়িক অবভাসের পর্যায়ে পড়ে। ঈশ্বরের অনাদি চিৎশক্তিই তদ্ব্যতিরিক্ত অপর সকল সত্তার সৃষ্টিকর্তা ও নিয়ামক। সৃষ্ট সত্তাসমূহকে সম্ভাব্য ও নিশ্চয়াত্মক এই দুই পর্যায়ে ভাগ করা হয়েছে।)

জ্ঞানের সঙ্গে সম্পর্কিত তিনটি প্রতীয়মান সত্যের মধ্যে আছে পরিদৃশ্যমান জগৎ, যাকে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বলা হয়ে থাকে ; অবভাসের জগৎ যা নাকি অনুমান সিদ্ধ আর অবভাসের জগতের সঙ্গে সম্পর্কিত বিভিন্ন আকার সমূহের অনন্ততার মধ্যে—চিত্ত ও স্বরূপের অভ্যন্তরে প্রসুপ্ত অবস্থান সমূহের বুদ্ধিগ্রাহ্য ভাব ও তাঁর ইহজাগতিক বিকার সমূহের মধ্যে। এই প্রতিরূপগুলি নির্দিষ্টরূপে প্রতিভাত হলেও তা সম্ভাব্য সত্তা মাত্র। নিশ্চয়ার্থক সত্য একমাত্র তিনি যার সম্বন্ধে আমরা কেবলমাত্র অস্তিত্ব ব্যতীত অন্য কোন বিধেয় আরোপ করতে পারি না। এখানে বহুত্বের প্রশ্ন নেই।

অবশ্য বৌদ্ধ দর্শনে বিশেষতঃ হীনযানে ঈশ্বরের স্বীকৃতি নেই। ক্ষণিক বাদই এর মূলতত্ত্ব। দীপশিখার সঙ্গে এই মতবাদের তুলনা করা হয়ে থাকে। পরিবর্তনশীলতা ও ধারাবাহিকতা এই জগৎ ও জীবনের অস্তিত্বের মূলসূত্র। দীপশিখার মধ্যে আপাত দৃষ্টিতে অবিচ্ছিন্নতা ও ধারাবাহিকতা লক্ষ্য করা গেলেও প্রতিক্ষণে তেল ও পলতে যে শিখাটিকে সৃষ্টি করছে পরমুহূর্তে তা ধ্বংস হওয়া মাত্র নূতন একটি শিখা তার স্থান গ্রহণ করছে নূতন তেল ও পলতের দহনের মধ্যে দিয়ে। ব্যাপারটা এত দ্রুত ঘটছে যে সৃষ্টি ও বিনাশের এই ঘটনা আমাদের দৃষ্টিগোচর হচ্ছে না বলেই ব্যাপারটিকে আমরা অখণ্ড ও অবিভাজ্য বলে মনে করছি।

হিন্দু অদ্বৈত দর্শনে একমাত্র ব্রহ্মই চরম সত্তারূপে স্বীকৃত—জীব ও ব্রহ্ম অভিন্ন। বস্তু জগতের ব্যবহারিক সত্তা স্বীকৃত হলেও তার কোন পরমার্থিক সত্তা নেই। ব্রহ্ম নির্গুণ নির্বিকার অপ্রত্যক্ষ—চৈতন্য স্বরূপ মাত্র—ধ্যান ও সমাধি লভ্য। জীব সত্তার ব্রহ্ম সত্তার মধ্যে আত্মবিলোপই পরমপুরুষার্থ যাকে মুক্তি নিঃশ্রেয়স, কৈবলত্ব, অথবা ব্রহ্মনির্বাণ প্রভৃতি বিভিন্ন নামে অভিহিত করা হয়েছে। বস্তুতঃ ব্রহ্ম ও জীবের সম্পর্ক উপাস্য ও উপাসকরূপে বিভিন্ন ধর্মীয় মতবাদের এক অতিপ্রচলিত ধারণা। ঈশ্বরের পূজনীয়তা ও ভক্তবৎসলতাকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন ভক্তিশাস্ত্রের উদ্ভব হয়েছে। সেই ঈশ্বর কোথাও ভগবান, কোথাও জিহোবা, কোথাও খোদা, কোথাও প্রভু নামে

অভিহিত। ধর্মপ্রচারকেরা বিভিন্ন ধর্মে ঈশ্বরের অবতার, প্রতিভূ, প্রেরিত পুরুষ অথবা পুত্র নামে অভিহিত। এবং তাঁদের প্রচারিত ঈশ্বরের বাণীই বিভিন্ন ধর্মমত। সাধন পদ্ধতিতে কিছুটা পার্থক্য দেখা গেলেও মূলনীতি বিষয়ে বিভিন্ন ধর্মমতের পার্থক্য উল্লেখযোগ্য নয়। রীতিনীতি ও আচার আচরণে পার্থক্য দেশ কাল পাত্রগত। ভারতবর্ষে বিশেষতঃ পশ্চিমবঙ্গে দুই প্রধান সম্প্রদায় বহুদিন পাশাপাশি বাস করে চলেছে। এদের পারস্পরিক সদ্ভাব ও সম্প্রীতির মধ্যেই সমগ্র দেশের উন্নতি ও গৌরব নিহিত, কোন্নগরের ঐতিহ্যের এক উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য এই যে পারস্পরিক বিদ্বেষের বিষ এখানে এই উভয় সম্প্রদায়ের সম্পর্ককে উত্তেজনার কারণ থাকা সত্ত্বেও কলঙ্কিত করতে পারেনি। উভয় সম্প্রদায়ের দায়িত্বশীল নেতৃবর্গের ভূমিকা এ বিষয়ে প্রশংসার দাবী রাখে।

কোন্নগরের অনতি বিস্মৃত ইতিহাসের কয়েকটি স্থান ও নামের পরিচয়

১। **বাঘের খাল**ঃ—এটি একটি সেচের খাল বা মূলতঃ বর্তমান কোন্নগরের পশ্চিম সীমার কিয়দংশ ও উত্তর সীমার সম্পূর্ণ অংশ নির্দেশ করে। প্রচলিত কিম্বদন্তী অনুযায়ী খালের উভয়পার্শ্বের জঙ্গলাকীর্ণ অঞ্চলে বাঘের বাস ছিল বলেই এই খালটির নাম বাঘের খাল। কিন্তু ঐতিহাসিক তথ্য থেকে জানা যায় যে সম্রাট আকবরের রাজত্বকালে জরিপ কার্য উপলক্ষে তিনি রাজা টোডরমলের সঙ্গে যে সৈন্যবাহিনী পাঠিয়েছিলেন তার অধিনায়কের নাম ছিল মহম্মদী বেগ।

কোন্নগরেরও নিকটবর্তী অঞ্চলে জরিপ কার্য সমাপ্ত হলেও বর্ষাকাল আসায় তারা ঐ স্থানে থেকে যেতে বাধ্য হন। ঐ সময় জলপ্লাবিত অঞ্চলের জলনিকাশের জন্য তিনি ডানকুণির জলা থেকে কোন্নগরের জলপ্লাবিত মাঠ ও নিম্নাঞ্চলের মধ্য দিয়ে যে খাল খনন করেন তার নামানুসারে ঐ খালের নাম রাখা হয় বেগের খাল। **বাঘের খাল** ঐ নামের অপভ্রংশ।

আলি নামের তাঁহার এক কর্মচারী ঐ স্থানে স্থায়ীভাবে বাস করেন—তাঁহার বাসস্থান ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চল আলিনগর নামে পরিচিত হয়।

২। **হিদের জলা** (পূর্বে):—হৃদয়রাম নামক এক সম্পন্ন চাষীর নামানুসারে দক্ষিণে হাতীরকুল জেলেপাড়া, মুখুজ্যে বাগান ও পেয়ারা বাগানের উত্তর সীমা, পূর্বে জি. টি. রোড ও পশ্চিমে ধর্মডাঙা—এই চতুঃসীমা বেষ্টিত বিস্তীর্ণ অঞ্চল হিদের জলা নামে পরিচিত। বর্তমান শতাব্দীর তৃতীয় দশক পর্যন্ত এখানে ধান চাষ হত। বর্তমানে মাঙ্গীরাম বাঙ্গুরের বংশধরগণ ঐ সমস্ত জমি ক্রয় করে একাধিক শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেছেন। ফোর্ট উইলিয়াম ইস্পাতের দড়ির কারখানা ঐগুলির মধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। হিদের জলার পূর্বদিকের গ্রান্ড ট্রাঙ্ক রোড ও ভাগিরথীর পশ্চিম তীরবর্তী অঞ্চলই পূর্বোল্লিখিত আলিনগর। আলি ও তাহার সহচরগণ ঐ অঞ্চল ত্যাগ করায় স্থানীয় অধিবাসীগণ ঐখানে একটি ক্ষুদ্র শিব মন্দির নির্মাণ করেন।

বাঙ্গুর কোম্পানী ঐ জমি অধিকার করার পর জনসাধারণের প্রবেশাধিকার না থাকায় ও নিয়মিত পূজার কোন ব্যবস্থা না হওয়ায় ৺হরিসাধন বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে ও স্থানীয় হিন্দু অধিবাসীগণের সহযোগিতায় ঐ শিব লিঙ্গটিকে কোন্নগর দ্বাদশ মন্দির প্রাঙ্গণে একটি ক্ষুদ্র মন্দিরে স্থানান্তরিত করে নিত্যপূজার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

৩। **হাতীর কুল**:—হিদের জলায় দক্ষিণ পশ্চিমে অবস্থিত একটি পল্লীর নাম কিম্বদন্তী অনুসারে কুমা নামক রাজার হাতিশালা এখানে অবস্থিত ছিল। অনুমান হয় যে মহম্মদী বেগের সৈন্যবাহিনী হাতিগুলির জন্য সাময়িকভাবে ঐ অঞ্চলে বাসস্থান নির্দিষ্ট হওয়ার ফলে পরবর্তী কালে ঐ অঞ্চলই **হাতীর কুল** নামে পরিচিত হয়।

৪। **নিশান ঘাট**:—বর্ষাকালে গঙ্গানদীতে ইলিশ মাছ ধরার সময় উত্তরে ঐ ঘাটকে সীমানা হিসাবে ব্যবহার করে ভাঁটায় নৌকা ভাসিয়ে দিয়ে স্থানীয় জেলেরা জাল ফেলে মাছ ধরত বলে ঐ ঘাটকে **নিশান ঘাট** বলা হয়ে থাকে।

৫। **দিনেমার ডক** (জাহাজ নির্মাণ কারখানা):—অষ্টাদশ শতাব্দীতে শ্রীরামপুর অঞ্চল দিনেমারদের অধিকারে থাকাকালে কোন্নগরে তার জাহাজ নির্মাণের কারখানা স্থাপন করে উত্তরে হাতীর কুল ঘাটে রাস্তা দক্ষিণে বিশালক্ষ্মী ঘাট পশ্চিমে জি. টি. রোড ও পূর্বে ভাগিরথী পরিবেষ্টিত অঞ্চল ঐ ডকের চতুঃসীমা। ভিতরে একটি বৃহৎ পুষ্করিণী থেকে একটি খাল গঙ্গাগর্ভে এসে মিশেছে। জাহাজ নির্মাণ অথবা মেরামতির পর খালের ভিতর দিয়ে জাহাজকে গঙ্গাগর্ভে নিয়ে যাওয়া হত। খাল ও পুকুর বর্তমানে ভরাট করা হয়েছে। প্রথমে ইটখোলা—পরে যথাক্রমে হাতীর কুল অয়েল 'মিল, লোকগণনা অ্যাফিস বাটার জুতার কারখানা ও ক্যানাল অয়েল মিল ও ন্যাশানাল অয়েল কারখানা এখানে ক্রমান্বয়ে স্থাপিত হয়েছে।

৬। **জেলে গুরুমশাই**:—বর্তমান শতাব্দীর ৪র্থ দশক পর্যন্ত শিশুদের

বিদ্যারম্ভ (হাতেখড়ি) অনুষ্ঠানের পর তাদের নিকটবর্তী পাঠশালায় পাঠানো হতো। এখানকার শিক্ষককে গুরুমহাশয় বলা হত। হাতীর কুল অঞ্চলের গাঙ্গুলী বাড়ীর চণ্ডীমণ্ডপে এই ধরনের একটি পাঠশালা ছিল। গুরুমশায়ের নাম ছিল পবন চন্দ্র পাত্র। তিনি হাতীর কুল জেলেপাড়ায় থাকতেন। বর্তমান শতাব্দীর শেষ দিকে তিনি মারা গেলে ঐ পাঠশালা উঠে যায়।

৭। **দুই শতীনের ঘাট** (বিশালক্ষ্মী ঘাট) :—বিশালক্ষ্মী সড়কের পূর্ব প্রান্তে জি. টি. রোড সরাসরি পেরিয়ে যে সরু গলি পাওয়া যায় তা হল বিশালক্ষ্মী ঘাটের গলি। এই গলির শেষ প্রান্তে অবস্থিত গঙ্গা ঘাটের নাম বিশালক্ষ্মী ঘাট। এখানে বহু শাখা-প্রশাখা সমন্বিত এক বটগাছের তলায় বাবাঠাকুরের মূর্তি ছিল। মূর্তিটি ধর্মঠাকুরের কুর্মোপরি অবস্থিত রক্তবর্ণ লম্বোদর বিশিষ্ট চতুর্হস্ত সমন্বিত এক লৌকিক দেবতা। শনি মঙ্গল বারে এখানে কৈবর্ত জাতির পুরোহিত এসে মূর্তিটির পূজা করত। আঠারো মাসের শিশুদের মাথা কামিয়ে চুল ফেলা উপলক্ষে অথবা মানত করে অভীষ্ট ফললাভ করতে বিশেষ পূজানুষ্ঠান হত।

বিশালক্ষ্মী ঘাট নামের পিছনের ইতিহাস এই যে, ঘাটের কিনারা থেকে কিছুদূরে এক ঘূর্ণাবর্ত ছিল তার নাম ছিল বিশালক্ষ্মীর দহ। আমাদের বাল্যকালে দেখেছি যে ঘাটের সামনে দিয়ে কোন মালবোঝাই নৌকা গেলে বিশেষ করে ইট বোঝাই নৌকা থেকে একখানা ইট নিদেন পক্ষে এক আধ পয়সা ছুঁড়ে মাঝিরা গঙ্গাগর্ভে নিক্ষেপ করত।

বর্তমান শতাব্দীর প্রথমে বিশালক্ষ্মী সড়কের এক সম্পন্ন গৃহস্থ স্বর্গীয় কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—ঘাটটির সংস্কার করে পুরুষ ও মহিলাদের জন্য আলাদা দুটি ঘাট ইট দিয়ে বাঁধাই করে চওড়া ঘাট নির্মাণ করেন। ঐ ঘাট দুটি তাঁর দুই পত্নীর নামে চিহ্নিত করে কেদারবাবু ঘাটের সিঁড়ির উপর দুটি প্রস্তর ফলক স্থাপন করেন। তাঁহাদের নাম যথাক্রমে শ্রীমতী কামিনী দেবী ও শ্রীমতী গিরিবালা দেবী। পুরুষদের ঘাটের উপর একটি ছোট মন্দিরে একটি শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত ছিল। মেয়েদের ঘাটে বস্ত্র পরিবর্তনের জন্য একটি ছোট ঘরও ছিল। নদীর ভাঙনে বটবৃক্ষসহ দুটি ঘাটই সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হয়েছে। পরবর্তীকালে কানাল অয়েল মিলের মালিক ফুলচাঁদ ভগত কর্তৃক ভগ্নপ্রায় মন্দিরটির সংস্কার সাধিত হয়। এখানে কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় সম্বন্ধে একটু বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া সঙ্গত মনে করি। তিনি কোন্নগর উচ্চ বিদ্যালয় থেকে শ্রীঅরবিন্দের পিতা কৃষ্ণধন ঘোষ প্রমুখ যে ৪ জন ছাত্রের প্রথম দল ১৮৫৮ সালে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন তাঁহাদের অন্যতম ছিলেন। পরবর্তী জীবনে তিনি ইংরেজ ব্যবসায়ী Apear Companyর Book Keeper পদে নিযুক্ত ছিলেন। ১৯২৪ সালে তিনি প্রায়

৮৫ বৎসর বয়সে দেহত্যাগ করেন। মৃত্যুর কয়েক মাস পূর্ব পর্যন্ত তাঁকে রেলপথে আফিসে যাতায়াত করতে দেখা গেছে। অত্যন্ত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন সৌখীন সাজ পোষাকে তিনি আফিসে যাতায়াত করতেন বলে আফিসের ঊর্দ্ধতন ইংরেজ কর্মচারীগণ তাঁকে ডিউক কেদার বলে ডাকতেন। পরবর্তী কালে স্বগ্রামেও তিনি ঐ নামে অভিহিত হতেন। তাঁর বাড়ীতে হিন্দু ধর্ম-সম্মত সকল প্রকার পূজানুষ্ঠানই সম্পন্ন হত। পাড়ার লোকেরা পূজা উপলক্ষ্যে তার গৃহে উপস্থিত হলে তাঁদের আদর আপ্যায়নের কোন অভাব হত না। বলা বাহুল্য কেদারবাবুর দুই স্ত্রীর নামে চিহ্নিত হওয়ার ফলে ঘাটটা দুই সতীনের ঘাট আখ্যা পায়।

৮। **হরি গুরুমশাই** ঃ—বিশালক্ষ্মী সড়কে প্রবন্ধলেখকের বাড়ীর পশ্চিম-দিকের ভূখণ্ডে হরি গুরুমশায়ের বসতবাটী ছিল। তাঁর পাঠশালা বসত দুপুরে মন্দিরাপাড়ার ৺অতুল মিত্র মহাশয়ের নীচের লম্বা দালানে। ছাত্র-সংখ্যা ৬০।৭০ জনের কম ছিল না। শিক্ষক হিসাবে তাঁর যথেষ্ট সুনাম ছিল। বিশেষতঃ ছাত্রদের হস্তাক্ষর ব্যাপারে বিশেষ মনোযোগ দেওয়ার ফলে তাঁর ছাত্রদের হস্তাক্ষর বেশ সুন্দর ও পরিচ্ছন্ন ছিল।

তাছাড়া প্রতিদিন সকালে ৭টা থেকে ১০টা পর্যন্ত তাঁর বাসগৃহে পাঠশালা বসত। বর্তমান লেখক ঐ পাঠশালার ছাত্র ছিল। সকালের পাঠ-শালার ছাত্রসংখ্যা দশজনের অধিক ছিল না। হরি গুরুমশাই খইনি খাওয়ায় বিশেষ অভ্যস্ত ছিলেন। তিনি হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে অকস্মাৎ মৃত্যুমুখে পতিত হন। সম্ভবতঃ ১৯১২ সালের নভেম্বর মাসে।

৯। অন্নদাপ্রসাদ ভট্টাচার্য ঃ—ভট্টাচার্য মহাশয় বিশালক্ষ্মী সড়কের বিদ্যাভূষণ বাটীর সন্তান। ১৮৭৮ সালে কোন্নগর উচ্চবিদ্যালয় থেকে প্রথম বিভাগে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় ৫ম স্থান অধিকার করে ২০ টাকার মাসিক বৃত্তিলাভ করেন। অতঃপর তিনি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরেজীতে প্রথম শ্রেণীতে এম. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন।

পরবর্তীকালে তিনি ইংরেজী সাহিত্যে অধ্যাপকের পদ গ্রহণ করেন। তাঁর কার্যক্ষেত্র প্রধানতঃ উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, পাঞ্জাব, উত্তর প্রদেশের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। কিন্তু নিজের পাণ্ডিত্য ও আত্মমর্যাদা বিষয়ে অত্যধিক অভিমান থাকায় কলেজ কর্তৃপক্ষের সহিত সংঘর্ষের ফলে তিনি কোথায়ও দীর্ঘদিন চাকুরীতে নিযুক্ত থাকতে পারেননি। অবশেষে প্রৌঢ় বয়সে তিনি স্বগ্রামে প্রত্যাবর্তন করেন এবং শ্রীরামপুর কলেজের ইংরেজীর অধ্যাপকের পদ গ্রহণ করেন। নিয়মিত চাকুরি না থাকায় অর্থসংকটের জন্য তাঁর স্বাস্থ্য ভেঙে পড়ে এবং শ্রীরামপুর কলেজে অধ্যাপক থাকাকালে তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন।

১০। পানের ডাঙ্গা ঃ—বিশালক্ষ্মী সড়কের পশ্চিমাঞ্চলে রাস্তার উত্তর দিকের এক বিস্তীর্ণ ভূখণ্ড পূর্ব সীমানা মতিলাল চট্টোপাধ্যায়ের বাসগৃহ পশ্চিম সীমানায় ৺পার্বতী চরণ হালদার মহাশয়ের জমি এবং দক্ষিণে বিশ্বম্ভর ব্যানার্জী লেন। এই জমিতে কয়েকটি পান গাছে সব সময়েই পান ফলত। তাছাড়া এখানে বহু নারিকেল, জাম, জামরুল, লিচু, আম প্রভৃতির গাছ ছিল। বাটীর মধ্য স্থানে একটি ছোট পুকুরও ছিল। জমিটির মালিক পীতাম্বর চট্টোপাধ্যায়ের মৃত্যুর পর জমিটি হস্তান্তরিত হয়ে লেখকের পিতা ৺প্রসাদকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের অধিকারে আসে। জমিটি অরক্ষিত থাকার জন্য ২।১ টাকা বার্ষিক খাজনার ৩ ঘর প্রজা বসান হয়। ইতিমধ্যে প্রজাস্বত্ব আইন পাশ হওয়ার ফলে জমির মালিকানা প্রজাগণের হস্তে ন্যস্ত হয়। বাকী অংশটুকু ৺প্রসাদ কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের উত্তরাধিকারীগণ কয়েক বৎসর পূর্বে শ্রীনৃপেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিকট হস্তান্তরিত করেছেন। তিনি এখানে গৃহ নির্মাণ করে বসবাস করছেন।

১১। পীরালী বাগান (মাড়োয়ারী বাগান) ঃ—বর্তমানে কানোড়িয়া কটন ইণ্ডাষ্ট্রীস এবং পূর্বে লক্ষ্মীনারায়ণ জুট মিলস বিশালক্ষ্মী সড়কের দক্ষিণ পশ্চিম প্রান্তের যে বৃহৎ ভূখণ্ডের মধ্যে অবস্থিত তাহাই এককালে ছিল ননী পিরালী মহাশয়ের বাগানবাড়ী। বসতবাটী ছিল বিশালক্ষ্মী সড়কের দক্ষিণ পশ্চিম প্রান্তের প্রায় ১০ বিঘা প্রাচীরবেষ্টিত জমির উপর অবস্থিত প্রাসাদোপম অট্টালিকায়। এ জমি সহ ঐ অট্টালিকা বর্তমানে পান্নালাল চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের অধিকারে। ঐ অট্টালিকা বর্তমানে বিধ্বস্ত। পশ্চিম দিকের দ্বিতল বাটী অসম্পূর্ণরূপে ধূলিসাৎ হয়েছে। পূর্বাংশের পাচকভৃত্য প্রভৃতির বাসস্থান ও ল্যাণ্ডোগাড়ী রাখার আস্তাবলও লুপ্তপ্রায়।

ননীবাবুর পেশা ছিল ওকালতি। তিনি কলিকাতার আদালতের ওকালতি করে প্রচুর অর্থ উপার্জন করেন। অষ্টাদশ শতাব্দীর ষষ্ঠ সপ্তম দশকে তিনি এক অট্টালিকা ও বাগানবাড়ী নির্মাণ করে কোন্নগরে বসবাস করতে থাকেন।

তাঁহার বিলাসবহুল জীবনযাত্রা তৎকালীন কোন্নগর বাসীর নিত্যকার আলোচনার বিষয় ছিল। পূর্বদিকে দোতলায় এক বৃহৎ চতুষ্কোণ গৃহ নাচঘর হিসাবে ব্যবহৃত হত। দ্বিতলে ওঠবার সিঁড়িগুলি এত প্রশস্ত ছিল যে বাঈজী সহ একটি পালকী অনায়াসে ঐ সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় উঠানো যেত।

সন্তানাদি না থাকায় তাঁহার মৃত্যুর পর ঊনবিংশ শতকের অষ্টম দশকে ভবানীপুর সাউথ সুবার্বন স্কুলের প্রধান শিক্ষক নানাবিধ পাঠ্যপুস্তক সমূহের রচয়িতা বেণীমাধব গাঙ্গুলী মহাশয় ঐ সম্পত্তি ক্রয় করেন। তাঁহার

সন্তানদের মধ্যে সোমদেব ও গণদেবের বাল্যকাল কোন্নগরেই অতিবাহিত হয়। মহাদেব গাঙ্গুলী এককালে কলিকাতা জিওলজিক্যাল গার্ডেনের তত্ত্বাবধায়কের পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। মোহনবাগান ক্লাবের প্রখ্যাত খেলোয়াড় রবি গাঙ্গুলী বেণীবাবুর পৌত্র।

কলিকাতা নন্দকুমার চৌধুরী লেনে নূতন বাড়ী করে উঠে যাওয়ার পর কোন্নগরের একাধিক পরিবার ভাড়াটিয়া হিসাবে ঐ গৃহে বাস করেন।

পরে পান্নালাল চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের পিতা দীর্ঘকাল সপরিবারে ঐ ভবনে বাস করার পর এখন তার কনিষ্ঠ পুত্র পান্নালাল চট্টোপাধ্যায় মহাশয় ঐ সম্পত্তি ক্রয় করে বসবাস করছেন।

বাগানবাড়ীটি কানোড়িয়া ভ্রাতাগণ ক্রয় করে প্রথমে লক্ষ্মীনারায়ণ জুট মিল এবং পরে কানোড়িয়া কটন ইণ্ডাষ্ট্রীস স্থাপন করেছেন।

১২। **ধর্মডাঙ্গা** :—পূর্বে ও দক্ষিণে পেয়ারাবাগান লেন এবং উত্তর ও পশ্চিমে বাঘের খাল পরিবেষ্টিত এক জঙ্গলাকীর্ণ ভূভাগে মূলতঃ হাড়ি ডোম প্রভৃতি নিম্নবর্ণের হিন্দুশ্রেণীর কয়েকটি লোকের বসবাস ছিল। জনমজুরগিরি, চাষবাস ও মৎস্যশিকার ছিল তাদের উপজীবিকা। ঐ ভূখণ্ডের দক্ষিণ পশ্চিম অঞ্চলের এক উঁচু ঢিবির উপর একটি মনসা গাছের তলায় ধর্মঠাকুরের কূর্মবাহন মূর্তিটি অবস্থিত ছিল। বৈশাখী পূর্ণিমায় ছাগ, মোরগ ও শূকর বলিদান করে ধুমধাম সহকারে ধর্মপূজার উৎসব অনুষ্ঠিত হত। পূর্ববঙ্গের উদ্বাস্তুরা ব্যাপকভাবে ঐ অঞ্চলে বসতি স্থাপন করার পর আদিবাসীরা সদলে বৈদ্যবাটীর নিকটবর্তী গ্রামাঞ্চলে স্থানান্তরিত।

১৩। **ভূতের বাড়ী** :—প্রসাদময়ী দেবী লেনের অক্ষয় হালদার মহাশয়ের বাড়ীর ঠিক দক্ষিণের বাড়ীটি এককালে ভূতের বাড়ী নামে পরিচিত ছিল। বাড়ীটির মালিক হরিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের আদি নিবাস ছিল কালীঘাটে। জমি ক্রয় করে তিনি ঐ স্থানে গৃহ নির্মাণ করে বাস করেন।

বর্তমান শতাব্দীর প্রথম দশকে কোন্নগরে ব্যাপকভাবে কলেরা রোগের প্রাদুর্ভাবের সময় তাঁহার পরিবারস্থ প্রায় সকলেই মৃত্যুমুখে পতিত হওয়ায় তিনি ভীত হয়ে বাড়ী পরিত্যাগ করে কালীঘাটে প্রত্যাবর্তন করেন। একাধিক পরিবার ভাড়াটিয়া হিসাবে বাস করার সময় তাঁহাদের পরিবারের একাধিক ব্যক্তিরও অকালমৃত্যু ঘটে। স্থানীয় লোকের ধারণা হয় যে ঐ গৃহে কোনও অপদেবতার অধিষ্ঠান আছে এবং সেই সূবাদে ঐ বাড়ীটি ভূতের বাড়ী আখ্যা পায়। বহুকাল পরিত্যক্ত থাকার পর বিশালক্ষ্মী সড়কের অধিবাসী অমরনাথ তরফদার ঐ বাড়ীটি ক্রয় করে বসবাস করার পর কোনও অকাল-মৃত্যুর সংবাদ পাওয়া যায় নি। তাঁর সন্তানগণ বর্তমানে ঐ বাড়ীর মালিক।

১৪। **ষষ্ঠী পুকুর** :—প্রসাদময়ী দেবী লেনের প্রায় মধ্যস্থলে রাস্তার

পূর্বদিকের নাতিবৃহৎ পুকুরটির নাম ষষ্ঠী পুকুর। পুকুরঘাটটি ৺দেবী প্রসন্ন ভট্টাচার্য বাটীর ঠিক পশ্চিম দিকে অবস্থিত। পুকুরটির সংলগ্ন রাস্তার পশ্চিমে বিশ্বাসবাড়ীর গলির মুখে উঁচু জমির উপর ষষ্ঠী ঠাকুরের পূজার স্থান ছিল। বর্তমানে তাহার অস্তিত্ব বুঝা যায় না। যষ্ঠী ঠাকুরের পূজার স্থানের সন্নিহিত ছিল বলে পুকুরটির নাম ষষ্ঠী পুকুর।

১৫। হঠাৎ বাবু ঃ—প্রসাদময়ী দেবী লেনের ষষ্ঠী পুকুরের পশ্চিমে এবং বিশ্বাস ভ্রাতাগণের বাড়ীর পূর্বদিকের দ্বিতল বাড়িটিই হঠাৎ বাবুর বাড়ী। তাঁর পিতৃদত্ত নাম কেদারনাথ মুখোপাধ্যায়। তিনি পরলোকগত উত্থানপদ মুখোপাধ্যায়ের পিতা ও ৺ধ্রুবকুমার মুখোপাধ্যায়ের পিতামহ ছিলেন। তিনি নিম্নবিত্তের মানুষ ছিলেন। লটারীর প্রাইজে বহু অর্থলাভ করে তিনি দ্বিতল বাড়ী ও বাইরের বৈঠকখানা ঘরটি নির্মাণ করেন। লটারীর প্রাইজের অর্থে তাঁর অবস্থার উন্নতি হওয়ায় তিনি হঠাৎ বাবু আখ্যা পান।

১৬। মালীর ডাঙ্গা ঃ—প্রসাদময়ী দেবী লেনে ৺দেবীপ্রসন্ন ভট্টাচার্যের বসতবাটীর পূর্বদিকে এক বিস্তীর্ণ জঙ্গলাকীর্ণ জমি ছিল। ৺পূর্ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ঐ জমির মালিক ছিলেন। পূর্ণবাবুর বসতবাটী ছিল বিশালক্ষ্মী সড়কের লেখকের পুরাতন বাড়ীর সম্মুখে। পূর্ণবাবু ১৮৭২ সালে কোন্নগর উচ্চবিদ্যালয় থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। পরে ওভারসিয়ারী পাশ করে সরকারী চাকুরীতে নিযুক্ত হন। তিনি পৈত্রিক বাসগৃহের সংস্কার করে ঐ স্থলে এক বৃহৎ দ্বিতল গৃহ নির্মাণ করেন। তিনি কোন্নগরের বিভিন্ন অঞ্চলে বহু জমি ক্রয় করেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ তাঁহার পৌত্রগণ তাঁহার ক্রীত সমস্ত জমি এমনকি বসতবাটীও বিক্রয় করে দেন। বর্তমানে ক্ষেত্রনাথ হালদারের পুত্র সত্যাচরণ হালদার ঐ বাড়ীর মালিক। প্রসাদময়ী দেবী লেনের জমি রক্ষণাবেক্ষণের জন্য তিনি একজন মালী রাখেন। মালীর তত্ত্বাবধানে রক্ষিত ঐ জমিটি পরে মালীর ডাঙ্গা নামে পরিচিত হয়। কোন্নগর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের হেডপণ্ডিত বিহারীলাল মুখোপাধ্যায়ের পৌত্রগণ বর্তমানে ঐ জমিতে বাসগৃহ নির্মাণ করে স্থায়ীভাবে বাস করছেন।

১৭। বুনো বামুন ঃ—প্রায় দুই শত বছরের কিছু পূর্বে উপেন চ্যাটার্জী লেনের উপেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের পিতামহ ঐ অঞ্চলের বন জঙ্গলাকীর্ণ বৃহৎ ভূভাগ ক্রয় করে ঐ স্থানে স্থায়ীভাবে বসবাস করেন। বন কেটে বাস করার জন্য ঐ পরিবারের মানুষকে এককালে বুনো বামুন বলা হত।

১৮। বাবাঠাকুর ঃ—শম্ভু চট্টোপাধ্যায়ের গলি দিয়ে পশ্চিমদিকে কিছুটা অগ্রসর হলেই এক ছোট মন্দির চোখে পড়বে। ঐ মন্দিরে অবস্থিত এক গোলাকৃতি প্রস্তরখণ্ডকে বাবাঠাকুর বলা হয়। পূর্বে বাবাঠাকুর অবস্থিত ছিল গোল পাতার ছাউনি দেওয়া চালাঘরে। প্রায় ৪০ বছর আগে ডাঃ চণ্ডীচরণ

ঘোষালের স্ত্রী ঐ মন্দিরটি নির্মাণ করে দিয়েছেন। বাবাঠাকুর সম্ভবতঃ কোন্নগরের প্রাচীনতম লৌকিক দেবতা। চৈত্রমাসের সংক্রান্তির পূর্বদিনে এখানে নীলচাষীর পূজা হয়। সন্তানবতী মায়েরা অনাহারে থেকে নীল ষষ্ঠীর পূজার প্রসাদ গ্রহণ করে ব্রত ভঙ্গ করেন। পূর্বে এখানে হয়ত চৈত্র সংক্রান্তিতে চড়কের উৎসব হত। পশ্চিম দিকের অগভীর পুকুরটি শুকিয়ে গিয়ে মাঠে পরিণত হয়। ঐখানে চড়কের গাছ নিয়ে দোলার ব্যবস্থা করা হত। পরে দ্বাদশ শিব মন্দির স্থাপিত হওয়ার পর খেলাটি ঐখানে স্থানান্তরিত হয়েছে। টাটকা চড়ক এখানে এবং বাসী চড়ক চড়কতলায় অনুষ্ঠিত হয় বলে অনুমান করা যেতে পারে যে শম্ভু চ্যাটার্জী ষ্ট্রীটের বাবাঠাকুরই প্রাচীনতম।

১৯। করাতি পাড়া ঃ—প্রায় ১৮০ বছর পূর্বে বর্তমান মুসলমান পাড়ায় মুসলমান উপনিবেশ স্থাপিত হয়। অধিবাসীর অধিকাংশই আসে জি. টি. রোডের পশ্চিমে অবস্থিত জেলে পাড়া অঞ্চল থেকে। বাকী অধিবাসীরা আসে বাঘ খালের কাছ থেকে। এদের অধিকাংশের উপজীবিকা ছিল করাতের সাহায্যে কাঠ চেরাই। ঐ অঞ্চলের করাতি পাড়া নামের উৎপত্তি ঐ সূত্রেই। পরবর্তীকালে অধিবাসীর অধিকাংশই রাজমিস্ত্রী অথবা দরজিগিরির উপজীবিকা গ্রহণ করে।

ঐ পাড়ার পরলোকগত অধিবাসী তাবরেজ আলি মল্লিক কোন্নগরের এক কৃতী সন্তান। ১৮৮০ সালে কোন্নগর উচ্চবিদ্যালয় থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হয়ে তিনি সংস্কৃত সাহিত্যে প্রথম স্থান লাভ করে স্বর্ণপদক প্রাপ্ত হন। পরবর্তীকালে তিনি কলিকাতা মাদ্রাসার অধ্যক্ষপদে ব্রতী হন।

মুসলমান ধর্মাবলম্বীদের উপাসনার জন্য এখানে এক মসজিদ আছে। মসজিদটি প্রায় ১১৫ বছর পূর্বে নির্মিত। মসজিদটির তত্ত্বাবধান ও দৈনিক পাঁচদফা প্রার্থনানুষ্ঠানের জন্য একজন মৌলবী নিযুক্ত আছেন। স্থানীয় মুসলমান অধিবাসীগণের নিকট থেকে সংগৃহীত অর্থে তাঁর বেতনের ব্যবস্থা করা হয়ে থাকে।

এখানকার মুসলমান যুবকগণ খেলাধূলায় পারদর্শিতার জন্য বিশেষ সুনামের অধিকারী। এখানকার অধিবাসী সেখ ওমর আলী কলিকাতা ২য় ডিভিসন ফুটবল লীগের অরোরা স্পোর্টিংয়ের খেলায় নিয়মিত যোগদান করেছেন।

হানাফী লাইব্রেরী এ পাড়ার একটি সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান। সম্প্রতি স্থানীয় যুবকগণের আন্তরিক প্রচেষ্টায় স্বেচ্ছাদত্ত শ্রমে ও জনসাধারণের নিকট থেকে সংগৃহীত অর্থে এই প্রতিষ্ঠানটির যে দ্বিতল ভবনটি নির্মিত হয়েছে সেজন্য তারা বিশেষ প্রশংসার দাবী রাখেন।

২০। শকুন্তলা কালী ঃ—বর্তমান শতাব্দীর দ্বিতীয় দশক থেকে শিবচন্দ্র দেব গার্ডেন লেন এবং শম্ভু চ্যাটার্জী ষ্ট্রীটের সংযোগস্থলে তেমাথায় (ক্যাম্পের রাস্তা) বৈশাখ মাসের কৃষ্ণপক্ষের প্রথম শনিবারে নিকটবর্তী অঞ্চলের মূলতঃ কৈবর্তশ্রেণীর বাসিন্দাগণ কর্তৃক এখানে রক্ষাকালী মাতার পূজার প্রবর্তন হয়।

শিবচন্দ্র দেব গার্ডেন লেনের দক্ষিণ পশ্চিম প্রান্তে একটি গো-ভাগাড় ছিল। এখানে গরু, মহিষ, ছাগল প্রভৃতি মৃত জীবজন্তুর শব নিক্ষেপ করা হত। সে কারণে নিকটবর্তী আম, বট প্রভৃতি বৃক্ষসমূহে শব সমূহের মাংস ভক্ষণের উদ্দেশ্যে শকুন দলের সমারোহ ঘটত। স্থানটির ভাগাড়ের সংলগ্ন থাকায় ঐ স্থানে অনুষ্ঠিত কালী পূজাকে প্রথমে ভাগাড়ে কালীর পূজা বলা হত। ভাগাড়ে কালী নামটি রুচিসম্মত না হওয়ায় এবং পূজাস্থলের উপরে বৃক্ষে বসবাসকারী শকুন দলের অব্যাহিত নিম্নে স্থানটি অবস্থিত এবং শকুন্তলা নামটি গ্রহণযোগ্য বিবেচিত হওয়ায় এখানকার কালীপূজা শকুন্তলা কালীপূজা নামে পরিচিত হয়।

নিকটবর্তী অঞ্চলে শকুন্তলা কালীর জনপ্রিয়তা তথা বহুল প্রচারের কারণ এই যে স্বপ্নাদিষ্ট হয়ে একাধিক ব্যক্তি এখানে হত্যা দিয়ে এবং মানস করে অভীষ্ট ফললাভ করেন। এই সংবাদ সর্বত্র বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলে প্রচারিত হওয়ার ফলে—বহুদূর গ্রামাঞ্চলে অধিবাসীরা বিপুল সংখ্যায় এসে এখানে সমবেত হয়ে মনস্কামনা সিদ্ধির উদ্দেশ্যে ছাগ বলিদানে দেবীর সন্তুষ্টি বিধান করে থাকেন। বর্তমানে ছাগবলির সংখ্যা একহাজারেও অতিক্রম করেছে। এত অধিক সংখ্যক ছাগবলি একরাত্রে সম্ভব না হওয়ায় পরবর্তী শনি ও মঙ্গলবারে বাকী ছাগগুলি বলি দেওয়া হয়ে থাকে। আবরণহীন ফাঁকা জায়গায় প্রথমে পূজার অনুষ্ঠান হত। ঝড় বৃষ্টির হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য সাময়িক আচ্ছাদনই যথেষ্ট ছিল। কিন্তু বহু ভক্তের পূজা ও দর্শনীর থেকে প্রাপ্ত অর্থে পূজা সমিতির ভাণ্ডার সমৃদ্ধ হওয়ায় এখানে একটি ইষ্টক সমন্বিত পাকা ঘর নির্মাণ করা হয়।

নূতন সুরম্য মন্দিরটি ১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দে (কে, এল ডালমিয়া কণ্ট্রাকটার নির্মাণ করে দেন) নির্মিত হয়েছে। মন্দির গাত্রে একটি প্রস্তরফলকে যে দশজন প্রতিষ্ঠাতা সভ্যগণের নাম লিখিত আছে তাহাদের মধ্যে পুরোহিত দেবেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী ব্যতীত সকলেই নিম্নবর্ণের তবে কৈবর্ত শ্রেণীর লোকের নামের সংখ্যাধিক্য লক্ষ্যণীয়।

এই প্রবন্ধে মূলতঃ কোন্নগরের উত্তরাঞ্চলের নাম ও স্থানগুলির পরিচয় দেওয়া হয়েছে। ভবিষ্যতে দক্ষিণাঞ্চলের নাম ও স্থানগুলির কয়েকটি পরিচয় দেওয়ার ইচ্ছা রইল।

কোন্নগরের বয়স কত ?

কোন মানুষের বয়স কত জানতে হলে তার বাবা মায়ের কাছে জিজ্ঞাসা করতে হয়, অথবা ঠিকুজী কোষ্ঠী থাকলে তার থেকে জানতে পারা যায়। কোন গ্রাম অথবা নগরের বয়স জানা যায় তার ইতিহাস থেকে। কলিকাতা, বোম্বাই, মাদ্রাজ প্রভৃতি বড় বড় শহরের ইতিহাস লেখা হয়েছে। সুতরাং ঐ সব শহরের সব খবরই তার থেকে জানা যায়।

কোন্নগর ত গ্রাম নামেই পরিচিত ছিল, কলকারখানা, মিউনিসিপ্যালিটি, পিচ দিয়ে বাঁধান রাস্তা, জল কল, ছেলে মেয়েদের লেখাপড়া করার জন্য হাইস্কুল, খেলাধুলো করার মাঠ, ব্যাংক, পাঠাগার, যাতায়াতের জন্য রেল, বাস বড় বড় দোকানপাট বাজার প্রভৃতি থাকায় এখন এ জায়গাকে বড় জোর ছোট শহর অর্থাৎ উপনগর বলা যেতে প্যরে। আর কলকাতা শহর থেকে রেলপথে মাত্র ৯ মাইল আর হাঁটা রাস্তায় ১১ মাইল দূরে থাকায় শহরের নিকটবর্তী জায়গা বলে একে শহরতলীও বলা হয়ে থাকে।

গ্রাম থেকে শহরে পরিণত হওয়ায় আর বিশেষ করে শিক্ষা বিস্তারের ফলে এখানকার অধিবাসীদের নিজেদের গ্রাম সম্বন্ধে জানাব আগ্রহ বেড়েছে। কোন্নগরের ইতিহাসের মাল মসলা খোঁজার চেষ্টা হয়েছে। অল্পদিনের অর্থাৎ নতুন গড়ে ওঠা কোন জায়গা হলে বুড়োলোকের কাছ থেকে সে জায়গার পরিচয় সংগ্রহ করা যায়। পুরানো কালের বড় শহর—এখন আর যার কোন গুরুত্ব নেই—সেক্ষেত্রে ও মাটি খুঁড়ে সেখান থেকে আর দলিলপত্র থেকে— অথবা কোন ঐতিহাসিক ঘটনার সঙ্গে যদি সেই স্থানের যোগ থাকে তার থেকে সঠিকভাবে না হলেও সেই জায়গায় মোটামুটি বয়সের হিসাব সংগ্রহ করা যেতে পারে।

কোন্নগর সম্বন্ধে পুরানো যা দলিলপত্র আজ পর্যন্ত সংগ্রহ করা গেছে তার কোনটাই তিনশো বছরের চেয়ে পুরানো নয়। তবে সবচেয়ে পুরানো যে বইয়ে কোন্নগরের নাম পাওয়া গেছে তা হল বিপ্রদাস পিপলাইয়ের লেখা মনসা মঙ্গল কাব্য। মঙ্গল কাব্য বলতে দেবতার মহিমার সম্বন্ধে লেখা কাহিনী বোঝায়। সৌভাগ্যক্রমে এসব বই যাঁরা লিখতেন তাঁরা নিজেদের পরিচয় এবং বইটি কোন সালে লেখা হয়েছিল তার উল্লেখ ঐ বইয়ে করে থাকেন। তার থেকে আমরা জানতে পারি বইটি লেখা হয়েছিল কোন বছরে। অর্থাৎ ১৪৯৫ খ্রীষ্টাব্দে লেখা।

ঐ বইয়ে শ্রীমন্তের সমুদ্রযাত্রা সম্বন্ধে নিচের লেখা দুই পংক্তি পাওয়া যায়।

সুতরাং ঐ সময়ে গ্রাম হিসাবে কোন্নগর যে সুপরিচিত ছিল একথা ধরে নেওয়া যেতে পারে। আরও অন্ততঃ একশো বছর আগেও কোন্নগর গ্রাম যে ছিল সে অনুমানও খুব ভুল হবে না। সুতরাং কোন্নগরের বয়স যে প্রায় ছশো বছর একথা নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে।

পরবর্তীকালে লেখা একাধিক বইয়ে কোন্নগরের নাম পাওয়া যায়। তার থেকে বোঝা যায় যে সে সময়েও কোন্নগর বেশ সুপরিচিত স্থান ছিল। আর সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র ত সূর্যমুখীর পিত্রালয়রূপে কোন্নগরের পরিচয় বাংলা জানা সবলোকের কাছেই তুলে ধরেছেন। রবীন্দ্রনাথের লেখা উপন্যাসে এবং গৃহপ্রবেশ নাটকে কোন্নগরের উল্লেখ আছে। তাছাড়া আধুনিক কালের বহু সাহিত্যিকের উপন্যাসে অথবা গল্পেও কোন্নগরের নাম পাওয়া যায়। এর থেকে বোঝা যাচ্ছে কোন্নগর শুধু প্রাচীন গ্রামই নয় এটি একটি অতিপরিচিত গ্রামও বটে।

কোন্নগর পৌরসভা প্রতিষ্ঠার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের সপ্ততিতম জন্ম জয়ন্তীর মানপত্র রচনা করতে গিয়ে শরৎচন্দ্র বলেছিলেন "কবিগুরু তোমার প্রতি চাহিয়া আমাদের বিস্ময়ের সীমা নাই।" মহাত্মা শিবচন্দ্র দেবের প্রয়াণের শতাধিক বর্ষ পরেও কোন্নগরবাসী আমরা তাঁর কথা চিন্তা করে বিস্ময়ে অবাক হয়ে যাই। একজন মানুষ তাঁর জীবনের বহুবিধ কর্মকাণ্ডের মধ্যে,—কোন্নগরের কল্যাণ চিন্তা কত করতে পারেন,—কতদূর করতে পারেন, ভাবলে বিস্ময়ে চিত্ত বিহ্বল হয়। আমরা জানি, জন্ম থেকে মৃত্যু অবধি জীবন যাপনে একজন মানুষের যে সব প্রতিষ্ঠান বা, সংস্থার প্রয়োজন হয়, কোন্নগরে সে সব কিছুর ব্যবস্থাই তিনি করে গেছেন। তাই, কোন্নগরের শিক্ষা, সংস্কৃতি, সমাজ ব্যবস্থা সম্বন্ধে কিছু বলতে গেলেই অবধারিতভাবে আসবে শিবচন্দ্রের কথা।

আজ কোন্নগরের পৌর ব্যবস্থার ইতিকথা লিখতে গিয়েও দেখতে পাই কোন্নগর পৌর-প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনীয়তার ভাবনা চিন্তার পথিকৃৎও সেই তিনি। আজ থেকে দেড়শো বছরেরও পূর্বে, কোন্নগরে যখন আধুনিক নগর পরিষেবার ধ্যানধারণাই মানুষের মধ্যে ছিল কিনা সন্দেহ, সেই তখন থেকেই

কোন্নগরে সুন্দর পরিচ্ছন্ন নগর গড়ে তোলার জন্য মিউনিসিপ্যাল ব্যবস্থা প্রবর্তনের চিন্তায় শিবচন্দ্র উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন।

১৮৫২ সালে উত্তরপাড়ার জমিদার বাবু জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে উত্তরপাড়ায় একটি নগর উন্নয়ন সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয় এবং উক্ত সালের ২রা জুন উক্ত সংস্থা স্থানীয় "স্বায়ত্ত শাসন সংস্থা" হিসাবে সরকারের স্বীকৃতি লাভ করে। প্রকৃত পক্ষে, উত্তরপাড়ায় এই পৌর সংস্থা প্রতিষ্ঠার চেষ্টা ১৮৪০ সাল থেকেই হচ্ছিল। কিন্তু, আইনগত নানা ত্রুটির জন্য যেসব সংস্থা দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। যেমন, এই ১৮৫২ সালের সরকারী স্বীকৃত সংস্থাটিও বেশীদিন স্থায়ী হয়নি।

উত্তরপাড়ায় পৌরসভা প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে দীর্ঘকাল ধরে এই যেসব কার্যাবলী চলছিল নিশ্চয় তা জয়কৃষ্ণ-সুহৃদ শিবচন্দ্রের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল এবং হয়তো তিনি তার শরিকও ছিলেন। উত্তরপাড়া ও কোন্নগরের মধ্যবর্তী স্থানে কোতরং অবস্থিত। এটিও একটি প্রাচীন জনপদ এবং সেখানেও পৌরসভা প্রতিষ্ঠার চেষ্টা চলছিল। কারণ আমরা দেখতে পাই ১৮৬৯ সালের ১লা এপ্রিল কোতরং পৌরসভা প্রতিষ্ঠিত হয়।

যেসব ন্যূনতম শর্তগুলি পূর্ণ করলে তবে পৌরসভা গঠনের প্রস্তাব বিবেচনা করা যায়, সেকালে কোন্নগর গ্রামের ক্ষেত্রে সেসব সম্ভাবনা সুদূর-পরাহত ছিল। অতএব অনুমান করা যায়, শিবচন্দ্রের নেতৃত্বে কোন্নগরের নাগরিকগণ সচেষ্ট হয়েছিলেন কীভাবে কোন্নগর গ্রামকে পৌর পরিষেবায় (Municipal Services)-এর আওতায় আনা যায়। মনে হয় সে জন্যই সুদূরবর্তী শ্রীরামপুর শহরের জন্য প্রস্তাবিত মিউনিসিপ্যালিটির আওতায় কোন্নগর পর্যন্ত অন্তর্ভুক্ত করার চেষ্টা করা হয়। শ্রীরামপুর পৌরসভা গঠনের নেপথ্য কাহিনী উদ্ঘাটিত হলে এসব তথ্য সবিস্তারে পাওয়া যাবে। জানা যাবে শিবচন্দ্রের নেতৃত্বে কোন্নগরবাসীর উদ্যোগের কথা। অবশ্য বিভিন্ন সরকারী দলিল ও বিজ্ঞপ্তি থেকেও তা বেশ বোঝা যায়।

পূর্বেই বলা হয়েছে, ১৮৪০ সাল থেকে ১৮৫২ অবধি বিবিধ নোটিফি-কেশানের বলে গঠিত পৌর সভাগুলি আইনগত নানা অসুবিধার জন্য স্বল্পকাল স্থায়ী হয়েছিল। অতঃপর আইনের সকল প্রকার ত্রুটি সংশোধন করে ১৮৬৪ সালের তিন আইন (Act III of 1864) প্রণীত হয়। এই আইনের ৩ ও ৪নং ধারা বলে ১৮৬৫ সালের ৩রা এপ্রিলের নোটিফিকেশান অনুসারে উক্ত সালের ১লা মে হুগলী জেলার শ্রীরামপুর ও উত্তরপাড়ার জন্য পৃথক পৃথক দুইটি মিউনিসিপ্যালিটি গঠিত হয়। শ্রীরামপুরের ক্ষেত্রে এই আইন বলবৎ করার জন্য যে এলাকা নির্দিষ্ট হয় তা এইরূপ : "শ্রীরামপুর শহর এবং চাতরা, বল্লভপুর, মাহেশ, জাননগর, মল্লিকপাড়া, দেওরা,

আলিনগর ও কোন্নগর প্রভৃতি শ্রীরামপুর শহরের নিকটবর্তী গ্রাম, যাদের পূর্ব সীমানা হুগলী নদী এবং পশ্চিমে ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়ে।" (লক্ষ্য করা যায়, এই বিজ্ঞপ্তিতে রিষড়া নামে কোনও অঞ্চলের উল্লেখ নেই) উক্ত সীমানাসহ শ্রীরামপুর পৌরসভার জন্য যে সরকার মনোনীত মিউনিসিপ্যাল কমিটি গঠিত হয়, কোন্নগর এলাকা থেকে তার কমিশনার মনোনীত হন বাবু শিবচন্দ্রদেব, অবসরপ্রাপ্ত ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট এবং বাবু শম্ভুচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, তালুকদার। ১৮৬৪ সালের ১লা মে থেকে এই কমিটির কার্যকাল আরম্ভ হয়। এই পৌরসভা পরিচালনের বিশিষ্ট ব্যাপারে শিবচন্দ্র যে বিবিধ বিষয়ে উদ্যোগী পুরুষ ছিলেন তা ঐ সভার পরবর্তী রিপোর্ট প্রভৃতি থেকে জানা যায়। প্রায় নয় বৎসর এই মনোনীত কমিটি কার্য করার পর ১৮৭৩ সালের ২৭শে ডিসেম্বর শ্রীরামপুর পৌরসভার নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। সারা ভারতের মিউনিসিপ্যাল ইতিহাসে এই নির্বাচন একটি ঐতিহাসিক ঘটনা! কারণ, বাংলা বিহার উড়িষ্যা আসাম বর্মাদেশ নিয়ে যে Bengal Presidency (সুবে বাংলা) তার মধ্যে সর্বপ্রথম এই শ্রীরামপুর মিউনিসিপ্যালিটিতেই ভোটের মাধ্যমে নির্বাচন হয়। আমাদের গর্ব যে এই নির্বাচনের দাবী শিবচন্দ্রদেব করেছিলেন যা পরবর্তী সরকারী রিপোর্ট থেকে জানা যায়। উক্ত নির্বাচনের অব্যবহিত পরেই ৩০শে ডিসেম্বর '৭৩ তদানীন্তন শ্রীরামপুরের মহকুমা শাসক মিষ্টার জে, ই, বি, জেফ্রী (যিনি পদাধিকারবলে পৌরসভায় ভাইস চেয়ারম্যান ছিলেন) উক্ত নির্বাচনের বিশদ বিবরণ ও তাঁর মন্তব্য একটি রিপোর্ট আকারে হুগলী জেলা ম্যাজিস্ট্রেট (যিনি পদাধিকারবলে মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান) তাঁর নিকট প্রেরণ করেন। রিপোর্টটি ভারতবর্ষের মিউনিসিপ্যালিটির ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ দলিল। জেলা ম্যাজিস্ট্রেট রিপোর্টটি অবিলম্বে বর্ধমানের ডিভিশানাল কমিশনার মিঃ সিটি বাক্‌ল্যাণ্ড আই. সি. এসের নিকট পাঠান এবং তিনি তাঁর সুপারিশসহ রিপোর্টটি বাংলা সরকারের রেভিনিউ সেক্রেটারীর নিকট পাঠান। অতঃপর সরকার কর্তৃক এর গুরুত্ব বিবেচনা করে পূর্ণাঙ্গ রিপোর্টটি ১৮৭৪ সালের ৪ঠা ফেব্রুয়ারী কলিকাতা গেজেটের ক্রোড়পত্র (সাপলিমেণ্ট) রূপে প্রকাশিত হয়।

উক্ত রিপোর্ট থেকে আমরা দেখতে পাই, ১৩ই মে ১৮৭৩ সাল শ্রীরামপুর মিউনিসিপ্যালিটির কমিশনারগণের সভায় বাবু শিবচন্দ্র দেব মহাশয়ের প্রস্তাবক্রমে সিদ্ধান্ত হয় যে, এই পৌরসভায় অবিলম্বে নির্বাচন পদ্ধতি প্রবর্তনের জন্য সরকারের কাছে আবেদন করা হোক। সরকার কর্তৃক উক্ত প্রস্তাব অনুমোদিত হওয়ায় ১৮৭৩ সালের ১লা অক্টোবর শ্রীরামপুর মিউনিসিপ্যালিটির নির্বাচনী নিয়মাবলী কলিকাতা গেজেটে প্রকাশিত হয়। ১৮ই

অক্টোবর পৌর কমিশনারবৃন্দের সভায় ঐ নিয়মাবলী অনুযায়ী যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য মহকুমা শাসকের নেতৃত্বে তিনজন কমিশনারকে নিয়ে একটি কমিটি গঠন করা হয়। তার অন্যতম সদস্য ছিলেন শিবচন্দ্র দেব। এই কমিটির তত্ত্বাবধানে শ্রীরামপুর মিউনিসিপ্যালিটির প্রথম নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। তখন শ্রীরামপুর পৌরসভার প্রতিনিধি (কমিশনারের) সংখ্যা ছিল ১৮ জন। তার মধ্যে ১৫ জন নির্বাচিত এবং ৩ জন সরকার মনোনীত। উক্ত ১৫ জন নির্বাচিত কমিশনারগণের মধ্যে (১) চাতরা বল্লভপুর সহ শ্রীরামপুর শহর থেকে নির্বাচিত হবেন ৯ জন (২) রিষড়া ও মাহেশ এলাকা থেকে ৩ জন এবং (৩) কোন্নগর এলাকা থেকে ৩ জন শ্রীরামপুর মিউনিসিপ্যালিটি গঠনের সময় নোটিফিকেশানে যে এলাকা ঘোষণা করা হয়েছিল, দেখা যাচ্ছে, তার মধ্যে জান্‌নগর মল্লিকপাড়া ও জেওরার স্থলে নির্বাচনী নোটিশে "রিষড়া" উল্লেখ করা হয়েছে। আর আলিনগরকে কোন্নগরের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। অবশ্য কোন্নগরের গঙ্গা তীরবর্তী বাগখাল দ্বারা চিহ্নিত প্রত্যন্ত উত্তর অংশ, আলিনগর নামেই পরিচিত ছিল। উক্ত রিপোর্ট থেকে দেখতে পাই সমস্ত নির্বাচনী নিয়মাবলী, ভোটারগণের তালিকা, নির্বাচন গ্রহণ কেন্দ্রের ঠিকানা প্রভৃতি সুষ্ঠুভাবে প্রচারের জন্য, স্কুল ভবন, পুলিশ ফাঁড়ী, মহকুমা কাছারী ভবন, রেলষ্টেশন, পোষ্টঅফিস, বাজার প্রভৃতি যেসব স্থানে জনসাধারণেব যাতায়াত আছে, টাঙ্গাইয়া দেওয়া হয়। নিয়মাবলীর সারাংশ বাবু শিবচন্দ্র দেব বাংলায় তর্জমা করেন। কিছুদিন অন্তর ৫০টি করে উক্ত নিয়মাবলীর কপি দু'বার বিভিন্ন স্থানে টাঙ্গাইয়া দেওয়া হয়। তাছাড়াও বিশিষ্ট এবং প্রভাবশালী ব্যক্তিবর্গের নিকট ডাকযোগে প্রেরণ করা হয়। তাছাড়া, ১৫ দিন ধরে প্রতিদিন ঢোল শহরৎ যোগেও তা জানিয়ে দেওয়া হয়। এইরূপে, নির্বাচনী নিয়মাবলী ও ভোটার তালিকার সুষ্ঠু প্রচারের যে ব্যবস্থা সেকালে করা হয়েছিল তা বোধ হয় আজও অনুকরণ যোগ্য। উক্ত রিপোর্টে আরও দেখতে পাই কোন্নগর অঞ্চলের ভোটারগণের নামের তালিকা কোন্নগরের "মিউনিসিপ্যাল অফিসে" টাঙ্গাইয়া দেওয়া হয়। তাহলে দেখা যাচ্ছে, সেই সুদূর অতীতে প্রায় একশত পঁচিশ বৎসর পূর্বে কোন্নগরে "মিউনিসিপ্যাল অফিস" ছিল। তার অবস্থান কোথায় ছিল, কোন বাড়ীতে তা ছিল, বর্তমানে সে তথ্য জানা নেই। কোন্নগর মিউনিসিপ্যাল জীবনের ইতিহাসে ঐ ভবনটির অবস্থান নির্ণয় করার যে বিশেষ গুরুত্ব আছে তা অনস্বীকার্য।

শ্রীরামপুর মিউনিসিপ্যালিটির সেই প্রথম নির্বাচনের ফলাফলে দেখতে পাই, কোন্নগর অঞ্চল থেকে যে তিনজন নির্বাচিত হয়েছিলেন তার মধ্যে প্রথম হন—বাবু যদুগোপাল চট্টোপাধ্যায়, সম্পাদক সাপ্তাহিক সমাচার। দ্বিতীয়

হন—বাবু শিবচন্দ্র দেব অবসরপ্রাপ্ত ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট। আর তৃতীয় হন—বাবু—শম্ভুচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—তালুকদার।

শ্রীরামপুর মিউনিসিপ্যালিটির উক্ত প্রথম নির্বাচনে প্রার্থী হয়ে মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছিলেন কোন্নগরের অন্যতম কৃতি সন্তান ডঃ ত্রৈলোক্য নাথ মিত্র। কিন্তু, সে সময় নিয়ম ছিল একমাত্র করদাতা ছাড়া আর কাহারো ভোটাধিকার হবে না। ত্রৈলোক্য মিত্র মহাশয়ের পিতৃদেব তখন জীবিত এবং তিনিই করদাতা হওয়ায় ভোটার। সুতরাং ত্রৈলোক্যনাথের ভোটাধিকার না থাকায় তাঁর মনোনয়নপত্র বাতিল হয়ে যায়। অবশ্য পরবর্তীকালে ত্রৈলোক্যনাথ দীর্ঘকাল শ্রীরামপুর মিউনিসিপ্যালিটির কমিশনার ছিলেন। শুধু তাই নয়, অস্থায়ী ভাইস চেয়ারম্যান এবং প্রথম ভারতীয় চেয়ারম্যান পদেও নির্বাচিত হয়েছিলেন। সেই প্রথম নির্বাচনে ত্রৈলোক্যনাথের মত কৃতবিদ্য মানুষ, যিনি হাইকোর্টের উকিল এবং হুগলী কলেজের অধ্যাপক, আইনের বিধানে নির্বাচনে দাঁড়াতে পারেন নি। একই ভাবে, রিষড়া অঞ্চল থেকেও হাইকোর্টের উকিল ক্ষেত্রমোহন মুখোপাধ্যায় নির্বাচনে বঞ্চিত হয়েছিলেন। মিঃ জেফ্রির উক্ত রিপোর্টে এঁদের দুজনের নাম উল্লেখ করে এইরূপ ঘটনার পুনরাবৃত্তি রোধের জন্য সত্বর নিয়মাবলী সংশোধনের সুপারিশ করেন। কারণ মিউনিসিপ্যালিটির স্বার্থে এইসব ব্যক্তির কমিশনার হওয়া বাঞ্ছনীয়। ঐ রিপোর্ট থেকে আরও জানা যায় যে, বাংলা প্রেসিডেন্সির (সুবে বাংলা) প্রথম সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠান সর্বাঙ্গীণভাবে ত্রুটিহীন ও সফল হয়েছিল এবং এই কার্যে যাঁরা মহকুমা শাসককে সর্বতোভাবে সাহায্য করেছিলেন তাঁদের মধ্যে "বিশেষভাবে বাবু শিবচন্দ্র দেব সরকারের ধন্যবাদ পাওয়ার যোগ্য" বিবেচিত হন।

পূর্বেই বলা হয়েছে, যে সব ন্যূনতম শর্ত পূরণ না হলে কোনও অঞ্চলে পৌরসভা গঠন করা যায় না—কোন্নগব বা রিষড়া. কোনও এলাকার ক্ষেত্রেই সে সময় তা সম্ভব ছিল না। অতএব একথা অনুমানের অপেক্ষা রাখে না যে, কোন্নগরের সমাজ সচেতন ব্যক্তিগণের মনে নিজস্ব পৌরসভা গঠনের আকাঙ্ক্ষা তীব্র থাকলেও, তাঁদের দীর্ঘকাল অপেক্ষা করতে হয়। ১৮৬৪ সাল থেকেই শ্রীরামপুর পৌরসভার অন্তর্ভুক্ত থাকায় পৌর পরিষেবা কোন্নগরের জনসাধারণ পাচ্ছিলেন। পৌর জীবনের প্রতি তাঁদের আগ্রহ ও অনুরাগ যে তীব্র ছিল তা কোন্নগরের নেতৃস্থানীয় শিবচন্দ্র দেব মহাশয়ের, শ্রীরামপুর পৌরসভার কমিশনার হিসাবে তাঁর কার্যাবলী থেকেই পাওয়া যায়। কিন্তু আইনের অসুবিধার জন্য তখন অপেক্ষা করা ছাড়া উপায় ছিল না। ইতিমধ্যে ১৮৯০ সালে শিবচন্দ্র দেহ রক্ষা করেন। তাই, যতদূর জানা যায় শ্রীরামপুর পৌরসভার প্রথম নির্বাচন ১৮৭৩ সালে হবার প্রায় ৪০ (চল্লিশ)

বছর পরে, ১৯১২ সালে, শ্রীরামপুর পৌরসভা থেকে বেরিয়ে এসে অন্ততঃ রিষড়া ও কোন্নগর এলাকা নিয়ে একটি পৃথক মিউনিসিপ্যালিটি গঠনের চেষ্টা আরম্ভ হয়। ইতিমধ্যে ১৯১৪ সালে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ বেধে যাওয়ায় সে চেষ্টাও কিছুটা বাধাপ্রাপ্ত হয়। কিন্তু তারই মধ্যে আগ্রহ ও প্রচেষ্টা বজায় থাকায়, ১৯১৬ সালে শ্রীরামপুর পৌর এলাকা থেকে আলাদা ক'রে, রিষড়া ও কোন্নগরের যুক্ত এলাকার জন্য "রিষড়া কোন্নগর মিউনিসিপ্যালিটি" প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু তাতেও কোন্নগরের নিজস্ব পৌরসভার জন্য কোন্নগরবাসীর মনোবাসনা পূর্ণ হয় না। তাঁরা নিরন্তর সে চেষ্টা করে গেছেন। আইন অনুযায়ী কোনও পৌরসভার কমিশনারবৃন্দই সে এলাকার বিভাজন, অর্থাৎ, এলাকার পরিবর্ধন বা সংকোচন তথা, ওয়ার্ড সমূহের সীমানা নিরূপণের অধিকারী। তাঁরা প্রস্তাব গ্রহণ করে সরকারের কাছে সুপারিশ করলে, সরকার বিবেচনান্তে তা গ্রহণ করে, গেজেটে প্রচার দ্বারা তাকে আইনগত প্রতিষ্ঠা দেন।

১৯১৪ সালে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ এবং ১৯৩৯ সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হয়। এই দুই বিশ্বযুদ্ধের মধ্যবর্তী কালেও কিন্তু কোন্নগরবাসীগণ তাঁদের নিজস্ব মিউনিসিপ্যালিটি লাভের জন্য চেষ্টায় ক্ষান্ত হননি। সে অধিকার লাভের জন্য নিরন্তর যুদ্ধ করে গেছেন। এই প্রচেষ্টার নেপথ্য কাহিনী খুবই ব্যাপক এবং কৌতূহলোদ্দীপক। পূর্বে বলেছি কোনও মিউনিসিপ্যালিটি এলাকা বিভাজনে সেই মিউনিসিপ্যালিটির কমিশনারবৃন্দের সম্মতি একান্ত প্রয়োজন। তাছাড়া দেখতে হবে যে পৃথক হবার পর যে নূতন মিউনিসিপ্যালিটি গঠিত হবে তার আর্থিক সঙ্গতি এবং যথাযথ পরিষেবার সামর্থ্য থাকবে কিনা। যাই হোক, কোন্নগর এলাকা থেকে বারবার দাবী করা সত্ত্বেও, তৎকালীন "রিষড়া কোন্নগর মিউনিসিপ্যালিটির কমিশনারবৃন্দের এ বিষয়ে উদ্যোগী হতে অনেক সময় লাগে। কারণ আমরা দেখতে পাই, কোন্নগর এলাকার বিশিষ্ট নাগরিকবৃন্দ অন্ততঃ দুবার বাংলা সরকারের স্বায়ত্ত শাসন বিভাগে যুক্তভাবে আবেদন (Memorendum) পাঠাচ্ছেন। ১৯২৮ সালে ১০০ জন বিশিষ্ট নাগরিকের স্বাক্ষরিত এবং ১৯৩২ সালে ২২০ জনের স্বাক্ষরিত আবেদনে "রিষড়া-কোন্নগর মিউনিসিপ্যালিটি" ভেঙে আলাদা "কোন্নগর মিউনিসিপ্যালিটি" গঠনের জন্য নির্দেশ দানের অনুরোধ করা হয়। কোন্নগরের নিজস্ব মিউনিসিপ্যালিটি গঠিত হ'লে তা যে আর্থিকভাবে স্বনির্ভর হবে—বিভিন্ন তথ্য ও পরিসংখ্যা দিয়ে তাও প্রতিপাদন করা হয়। এই পর্যায়ে আন্দোলনে মুখ্য ভূমিকায় ছিলেন ননীগোপাল বসু, বিজলীনাথ বসু, ষষ্ঠীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, সত্যচরণ মুখোপাধ্যায়, ইন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, তুলসীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি এবং প্রধান পরামর্শদাতা অবশ্যই

নৃসিংহ দাস বসু। এই প্রচেষ্টা শিবচন্দ্র দেব প্রতিষ্ঠিত "কোন্নগর করদাতা সমিতির" নামে (**Konnagar Rate Payee's Association**) করা হয়। অতঃপর দেখা যায় ১৯৪৩ সালের গোড়ায়, "রিষড়া কোন্নগর মিউনিসিপ্যালিটির" কমিশনারবৃন্দ, "রিষড়া" "কোন্নগরের" জন্য পৃথক পৃথক দুটি মিউনিসিপ্যালিটি গঠনের জন্য সর্বসম্মতভাবে প্রস্তাব গ্রহণ করেন। "রিষড়া-কোন্নগর" মিউনিসিপ্যালিটিতে মোট চারটি ওয়ার্ড ছিল। রিষড়া অঞ্চলে দুটি—১নং ও ২নং এবং কোন্নগর অঞ্চলে দুটি—৩নং ও ৪নং ওয়ার্ড। রিষড়া ও কোন্নগরের জন্য যখন পৃথক দুইটি মিউনিসিপ্যালিটি গঠনের প্রস্তাব গ্রহণ করা হয় তখন প্রস্তাবিত দুইটি মিউনিসিপ্যালিটির প্রত্যেকটিকে চারটি ক'রে ওয়ার্ডে ভাগ করে দেওয়া হয়, এবং জনসাধারণের মতামতের জন্য যথারীতি ওয়ার্ডগুলির সীমানাসহ তা কলিকাতা গেজেটে প্রকাশিত হয়।

কোন্নগরের নিজস্ব নূতন মিউনিসিপ্যালিটির জন্মের প্রাক্ মুহূর্তেই দেখা দেয় দারুণ সংকট। জনগণের মতামতের জন্য গেজেটে প্রকাশিত প্রস্তাবে, দুইটি বিষয়ে বিশেষ আপত্তির কারণ ঘটে। (১) ওয়ার্ডগুলির মধ্যেকার সীমানা রেখা (**Ward Boundery**) সম্পূর্ণ অবাস্তব, কাল্পনিক ও বেআইনী। (২) প্রস্তাবিত ১, ২ এবং ৪নং ওয়ার্ডের প্রত্যেকটিতে সাধারণ আসনে দুইজন করে নির্বাচিত প্রতিনিধি (কমিশনার) রাখা হয় কিন্তু ৩নং ওয়ার্ড, যেটি কোনও ভাবেই অন্যগুলি থেকে ন্যূন নয় তাতে একজন প্রতিনিধি রাখা হয়।

প্রস্তাবিত "কোন্নগর মিউনিসিপ্যালিটি" গঠনের প্রস্তাবের মধ্যকার এইসব মারাত্মক ত্রুটিগুলির অন্তর্নিহিত আইনগত জটিলতা ও অসুবিধার কথা শ্রদ্ধেয় নৃসিংহ দাস বসুর নিকট থেকে শ্রদ্ধেয় ননীগোপাল বসু অবগত হন এবং এই বিষয়ে প্রতিকারের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণের উদ্দেশ্যে করদাতা সমিতির সভা আহ্বানের জন্য আমাকে বলেন। আমি (লেখক) তখন, "কোন্নগর করদাতা সমিতির" সহঃ সম্পাদক। সম্পাদক রমেশচন্দ্র মিত্র তখন অসুস্থ। এর পর এই নিয়ে কোন্নগরে যে বিরাট আন্দোলন হয় তার আলোচনা ইতিপূর্বে ৺নৃসিংহ দাস বসু শতবার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষে যে স্মারক গ্রন্থগুলি প্রকাশিত হয় তাতে সবিস্তারে করা হয়েছে। স্থানাভাবের জন্য এখানে তার পুনরাবৃত্তি থেকে বিরত থাকা গেল। শুধু সংক্ষেপে এইটুকু উল্লেখ করা যায় যে, "রিষড়া-কোন্নগর" মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান, জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, ডিভিশনাল কমিশনার, সরকারের স্বায়ত্ত শাসন বিভাগের সচিবালয় সর্বত্র আবেদন ক'রেও কোনও প্রতিকার না পাওয়ায়, অবশেষে এই বিষয়ে পরামর্শ ও সাহায্যের জন্য তখনকার সর্বজনমান্য জাতীয় নেতা ও প্রথিতযশা সলিসিটার নির্মলচন্দ্র চন্দ্র মহাশয়ের নিকট যাওয়া স্থির হয়।

করদাতা সমিতির সভাপতি, বিশিষ্ট কংগ্রেস নেতা ইন্দ্রনাথ চক্রবর্তী ও আমার উপর ভার অর্পণ করা হয়। আমরা কলিকাতার ২৩নং ওয়েলিংটন ষ্ট্রীটে চন্দ্র মহাশয়ের বাড়ীতে গিয়ে সমস্ত কাগজপত্র দেখাই এবং আমাদের বিপদের কথা তাঁকে জানাই। সব দেখে শুনে তিনিও নূতন প্রস্তাবিত মিউনিসিপ্যালিটির ওয়ার্ডগুলির সীমানার (Boundery) অবাস্তবতায় বিস্মিত হন। তৎক্ষণাৎ তিনি তদানীন্তন স্বায়ত্ত শাসন বিভাগের মন্ত্রী (L. S. G. Minister) সন্তোষকুমার বসু মহাশয়কে টেলিফোনে সমস্ত বলে এই বিষয়টির অবিলম্বে প্রতিকার করতে বলেন। অন্যথায় আইনগত অনুরূপ ব্যবস্থা ক'রতে হবে তাও জানান। তারপর, বোধ হয় সাতদিনের মধ্যেই উক্ত প্রকাশিত আপত্তিকর গেজেট নোটিফিকেশনটি বাতিল ঘোষণা করা হয় এবং নূতন প্রস্তাব গেজেটে প্রকাশ করা হয়। দেখা যায়, "রিষড়া-কোন্নগর" মিউনিসিপ্যালিটির কমিশনারবৃন্দ, কোন্নগরের ক্ষেত্রে তাঁদের প্রস্তাবিত সেই চারটি ওয়ার্ড বাতিল করে এবার কোন্নগরকে পূর্বের মত দুইটি ওয়ার্ড ভাগ করে দেন। কেবল, ওয়ার্ড নং গুলির পরিবর্তন করেন। পূর্বের ৩নং, ৪নং-এর পরিবর্তে ১নং ও ২নং করেন। এইভাবে প্রথম আপত্তিটির প্রতিকার হয়। তার ফলে নবজাতক প্রস্তাবিত "কোন্নগর মিউনিসিপ্যালিটি" জন্ম লগ্ন থেকেই অযথা নানা জটিলতা ও মামলা মোকদ্দমার বিভীষিকা থেকে রক্ষা পায়। কিন্তু দ্বিতীয় আপত্তিটির প্রতিকার না হওয়ায় অশান্তি থেকে যায়। নূতন নোটিফিকেশনে কোন্নগরের ২নং ওয়ার্ডের সীমানা ঘোষিত হয়। উত্তরে—এস. সি. চ্যাটার্জী স্ট্রীটের দক্ষিণ পাড় ; পূর্বে—ভাগীরথী নদী ; দক্ষিণে ধাড়সা (কোতরং) ; পশ্চিমে রেল লাইন। যে সব লক্ষণ বিবেচনা ক'রে প্রতিনিধি সংখ্যা নির্ণয় করা হয় যথা—**Area, Population, Number of Holding, Income, Number of Voters, Places of Importance** প্রভৃতি এই সব বিষয়েই ২নং ওয়ার্ড বড় হওয়া সত্ত্বেও এই ওয়ার্ডে সাধারণ আসনে নির্বাচিত প্রতিনিধি দেওয়া হয় তিনটি, পক্ষান্তের এ সব বিষয়ে ন্যূন হওয়া সত্ত্বেও ১নং ওয়ার্ডে প্রতিনিধি রাখা হয় চারটি। এই কারণে ২নং ওয়ার্ডে দারুণ বিক্ষোভ দেখা দেয়। কিন্তু ইতিমধ্যে মিউনিসিপ্যাল আইন অনুযায়ী, নূতন মিউনিসিপ্যালিটির ক্ষেত্রে যা নিয়ম—এক বছরের জন্য সব কজন গভর্ণমেণ্ট মনোনীত সদস্য নিয়ে ১৬ই জানুয়ারী ১৯৪৪ সালে কোন্নগরের নিজস্ব মিউনিসিপ্যালিটি প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায় এবং আগামী বর্ষের অর্থাৎ ১৯৪৫ সালের ২৩শে মার্চ প্রথম সাধারণ নির্বাচনের দিনও ঘোষণা হয়ে যায়। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, বহু মানুষের বহু চেষ্টার ফলে কোন্নগরের নিজস্ব মিউনিসিপ্যালিটি প্রতিষ্ঠা হলো বটে, কিন্তু দুইটি ওয়ার্ডের মধ্যে নির্বাচিত প্রতিনিধির সংখ্যার অন্যান্য তারতম্য থাকায় তার

জের আরও এক বছর, প্রথম সাধারণ নির্বাচন পর্যন্ত চলে। এইখানে উল্লেখ্য যে উপরিউক্ত সময়, অর্থাৎ ১৯৩২ থেকে ১৯৪৩ সাল প্রায় দশ বৎসরকাল নৃসিংহ দাস বসু রিষড়া-কোন্নগর মিউনিসিপ্যালিটির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন না।

সেই অসন্তোষের নিবারণ কীভাবে হলো সে কথা না বলা হলে, কোন্নগর পৌরসভার প্রতিষ্ঠার ইতিহাস সম্পূর্ণ হয় না। সুতরাং সংক্ষেপে জানাই,—প্রথম সাধারণ নির্বাচনের দিন স্থিরীকৃত হয়ে যাওয়ায় চেষ্টা করা হয় যাতে অন্ততঃ সাধারণ নির্বাচনের পূর্বে ২নং ওয়ার্ডের প্রতি যে অবিচার প্রত্যক্ষতঃ অফিসের সামান্য ভুলে হয়েছে তার নিবারণ করা যায়। এজন্য নিয়ম অনুযায়ী নবগঠিত কোন্নগর পৌরসভার চেয়ারম্যান ও কমিশনার-বৃন্দের নিকট যথারীতি আবেদন করা হয়। সঙ্গে সঙ্গে ঊর্ধ্বতন সমস্ত কর্তৃপক্ষের নিকট আবেদন করা হয়। দীর্ঘ দশ মাস কাল আবেদন নিবেদন সাক্ষাৎকার সত্ত্বেও যখন কোনও প্রতিকার হয় না তখন—২নং ওয়ার্ডের জনসাধারণের মধ্যে দারুণ আলোড়ন সৃষ্টি হয়, কারণ নির্বাচন আসন্ন। ২নং ওয়ার্ডের করদাতাগণের তীব্র আন্দোলনের ফলে অবশেষে তদানীন্তন স্বায়ত্ত শাসন বিভাগের সচিব (Secretary L. S. G. Dept.) মিঃ এ. ডাবলুউ হল্যান্ড আই. সি. এস. মহোদয় লিখিতভাবে স্বীকার করেন যে, প্রতিনিধি নির্ণয়ের ক্ষেত্রে ২নং ওয়ার্ডের প্রতি অবিচার করা হয়েছে। কিন্তু যেহেতু কোনও নূতন মিউনিসিপ্যালিটির প্রথম নির্বাচনের দিন স্থির করেন গভর্ণর স্বয়ং এবং যেহেতু এই নির্বাচনের নির্দিষ্ট দিনটি আর্থিক বৎসরের শেষে, মার্চ মাসের তৃতীয় সপ্তাহে পড়েছে, সুতরাং নির্বাচন স্থগিত রেখে ত্রুটি সংশোধন করতে গেলে বহুবিধ আইনগত জটিলতার সৃষ্টি হবে, সুতরাং নির্বাচনের পূর্বে এই ত্রুটি সংশোধন সম্ভব নয়। তবে তিনি আশ্বাস দেন যে, নূতন নির্বাচিত বোর্ডে উভয় ওয়ার্ডের প্রতিনিধি সংখ্যার সমতা বিধানের জন্য (Parity), গভর্ণমেণ্ট মনোনীত সদস্য হিসাবে, ২নং ওয়ার্ডের একজন করদাতাকে প্রতিনিধি হিসাবে মনোনয়ন দেওয়া হবে এবং নূতন বোর্ড, এই ত্রুটি সংশোধনের জন্য যাতে অবশ্যই প্রস্তাব গ্রহণ করে সে নির্দেশ দেওয়া হলো বলে জানান। অতএব, সেইভাবে ১৯৪৫ সালের মার্চ মাসে নির্দিষ্ট দিনে "কোন্নগর মিউনিসিপ্যালিটির" প্রথম সাধারণ নির্বাচন বিপুল উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্যে অনুষ্ঠিত হয়। **কোন্নগর মিউনিসিপ্যালিটির প্রথম সাধারণ নির্বাচনে গঠিত পৌরসভার কমিশনারগণের নাম ঃ—**

সাধারণ আসনে নির্বাচিত—১নং ওয়ার্ড—(১) ডাঃ নীলমণি বন্দ্যোপাধ্যায়
(২) ফণীন্দ্রনাথ গাঙ্গুলী
(৩) প্রভাতকুসুম বন্দ্যোপাধ্যায়
(৪) নৃসিংহদাস বসু

" " " —২নং ওয়ার্ড—(১) অতুল্য দেব (২) মুরারি মিত্র
(৩) অনিলকুমার ঘোষ।
সংখ্যালঘু সংরক্ষিত আসনে
—আব্দুল খালেক।

সরকার মনোনীত—২নং ওয়ার্ডের সমতা বিধানের জন্য। জ্যোতিষচন্দ্র
গাঙ্গুলী।

" " —শিল্প প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি—(১) সুধীরকুমার দত্ত
(২) আর, বি, সেমুর

কোন্নগর জি, টি, রোডের উপর গঙ্গাতীরবর্তী "দেব ভিলার" নিকটে ডাক্তার শচীন সর্বাধিকারীর বাড়ীটি ভাড়া নিয়ে কোন্নগরের নিজস্ব পৌর-সভার অফিস "Konnagar Municipal Officer" হয়। মাত্র ১২৩ টাকা নগদ, আর কিছু কাঠের পুরাতন টেবিল চেয়ার ও আলমারী এবং বিপুল পরিমাণ পুরাতন খাতাপত্র দলিল দস্তাবেজ নিয়ে "কোন্নগর পৌরসভার যাত্রা সুরু হয়।" সে এক কঠিন ধূসর পথে যাত্রা। সংকল্পের দৃঢ়তায়, কৃচ্ছ্রসাধনে ও নিয়মানুবর্তিতায় সমুজ্জ্বল। কোন্নগরের সৌভাগ্য যে জন্মলগ্ন থেকেই পৌরসভা পেয়েছিল নৃসিংহদাস বসুর মত আইনজ্ঞ এবং ননীগোপাল বসুর মত আদর্শ কর্মীর নেতৃত্ব।

ভাইস চেয়ারম্যান ননীগোপাল বসু অতি সত্বর কোন্নগরের পুঙ্খানুপুঙ্খ ক্ষেত্র Demand Register প্রস্তুত করে, প্রথম নির্বাচনের জন্য ভোটারগণের তালিকা প্রস্তুত করে দেন। কোন্নগর পৌর সভার Rates and Taxes আদায় করার জন্য Demand Register যে যুক্তিযুক্ত ও বিজ্ঞানসম্মত নীতিতে প্রস্তুত করা হয়, তা স্বায়ত্ত শাসন বিভাগের দ্বারা বিপুলভাবে প্রশংসিত হয়, এবং প্রকাশ, যে উক্ত নীতি অতঃপর রাজ্যের অন্যান্য পৌরসভাগুলিকে গ্রহণ করার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়।

১৯৪৫ সালে প্রথম নির্বাচিত পৌরসভা গঠিত হবার অব্যবহিত পরবর্তী বছরগুলি ভারতের ইতিহাসে অভূতপূর্ব ঘটনাবলীতে সমাকীর্ণ। ১৯৪৬ সালে সাম্প্রদায়িক অশান্তি, দেশ ভাগ, ১৯৪৭ সালে স্বাধীনতা ঘোষণা ও তার পরের বছরগুলির সমস্যাবহুল পরিস্থিতি আজ বর্ণনা করে বোঝানো যাবে না। কিন্তু তারই মধ্যে নবজাত "কোন্নগর পৌরসভা" অকুতভয়ে, সততা, দৃঢ়তা ও অসীম ধৈর্যের সঙ্গে কোন্নগরে পৌর পরিষেবা ও নাগরিক উন্নতি বিধানে অগ্রসর হয়ে গেছেন। পূর্বোক্ত রাষ্ট্রীয় পটপরিবর্তনের কারণেই বোধ হয়, প্রথম নির্বাচিত বোর্ডের কার্যকাল এক বৎসর বৃদ্ধি পেয়ে ১৯৫০ পর্যন্ত ছিল। এই সময় মধ্যেই পৌরসভার নিজস্ব ভবনের জন্য জমি কেনার ব্যবস্থা, মাতৃসদন এবং জল-কল প্রকল্প অনুমোদন (Water-works Scheme

Sanction) করানো সম্ভব হয়। ১৯৪৪ সালে অতি নিঃস্বভাবে আনুষ্ঠানিক প্রতিষ্ঠা এবং ১৯৪৫ সালে প্রথম নির্বাচিত বোর্ড গঠনের পাঁচ বৎসরের মধ্যে ঐ সব উন্নয়নমূলক প্রকল্প গ্রহণ অবশ্যই প্রশংসার দাবী রাখে এবং সেই উন্নতির ধারাই আজও অব্যাহত আছে। "কোন্নগর পৌরসভার" বয়স আজ ৫০ অতিক্রান্ত। এই অর্ধ শতাব্দী কালে পৌরসভার ইতিহাসে গর্ব করার মত অনেক কিছু আছে।

উনিশ শতকের কোন্নগর

স্মৃতির দুয়ার খুলিয়া কোন্নগরের অতীত ঐতিহ্যের পানে তাকালে স্বভাবতই ঊনবিংশ শতাব্দীর কথাই মনে পড়িবে। ঐ শতাব্দীর প্রথমার্ধে বাংলাদেশে যে নবজাগরণ আন্দোলনের সূত্রপাত হয় কোন্নগরে তাহার পুরোধারূপে আমরা যাঁহাকে পাই তাঁহার নাম মহাত্মা শিবচন্দ্র দেব। এই কর্মবীর তাঁহার ৭৯ বৎসর ব্যাপী (১৮১১—১৮৯০) বাংলাদেশের বহু সমাজ হিতকর ও ধর্ম সংস্কারমূলক আন্দোলনের সহিত জড়িত থাকিলে ও জন্মভূমি কোন্নগরের সর্বাঙ্গীণ কল্যাণ প্রচেষ্টায় একান্তভাবে সর্বশক্তি, উদ্যম ও অর্থ নিয়োজিত করেন।

কোন্নগরের উন্নতি সাধনের প্রয়াসে গ্রামবাসীগণের সহযোগিতায় তিনি 'লোকহিতৈষণী সভার' প্রতিষ্ঠা করিয়া প্রধানতঃ ঐ প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে কোন্নগরের উন্নয়ন প্রচেষ্টায় অগ্রণীর ভূমিকা গ্রহণ করেন। হিতৈষিণী সভার তিন বৎসর (১৮৫২-৫৫) স্থায়ী জীবনে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ঘটনা হইল ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা।

বেসরকারী উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত মফঃস্বলের বিদ্যালয়গুলির মধ্যে স্থান সম্ভবতঃ দ্বিতীয় কোন্নগর ইংরেজী বিদ্যালয় সম্ভবতঃ দ্বিতীয় অথবা তৃতীয় স্থানের দাবী রাখে।

শিবচন্দ্রের অতুলনীয় কীর্তির মধ্যে ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে কোন্নগর সাধারণ গ্রন্থাগার এবং ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে বালিকা বিদ্যালয় স্থাপনও বিশেষভাবে উল্লেখনীয়।

এতদ্ব্যতীত ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে নব পর্যায় বঙ্গ বিদ্যালয়, ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দে

কোন্নগর রেলষ্টেশন এবং ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে ডাকঘর, ১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দে হোমিওপ্যাথিক দাতব্য চিকিৎসালয়, ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে এলোপ্যাথিক দাতব্য চিকিৎসালয়, ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে কোন্নগর করদাতা সমিতি প্রতিষ্ঠায় শিবচন্দ্রের নেতৃত্ব অবিস্মরণীয়।

এতদ্ব্যতীত গ্রামের রাস্তাঘাট ও সেতু সংস্কার, দস্যুভয় নিবারণে পাঠক নিয়োগ, গ্রামে দুঃস্থ ব্যক্তিগণকে সাহায্য দানের প্রয়াসও উল্লেখের দাবী রাখে।

ব্রাহ্মমতে ধর্মসাধনার উদ্দেশ্যে শিবচন্দ্র ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দে নিজ বাসগৃহে ব্রাহ্ম সমাজের প্রতিষ্ঠা করেন। প্রতিষ্ঠা উৎসবে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর পৌরোহিত্য করেন। পরবর্তীকালে গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড সংলগ্ন জমিতে সমাজের নিজস্ব ভবন নির্মিত হইলে ১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দে ঐখানেই উপাসনার ব্যবস্থা করা হয়। বালক রবীন্দ্রনাথ মহর্ষি সমভিব্যাহারে একাধিক বার এখানে ব্রহ্ম-সঙ্গীত গাহিয়া দর্শকবৃন্দের পরিতৃপ্তি সাধন করেন।

বলাবাহুল্য শিবচন্দ্রের সমাজ উন্নয়ন প্রচেষ্টাসমূহ বিনা বাধায় অনুষ্ঠিত হয় নাই। রক্ষণশীল সমাজের প্রতিরোধ যে নগণ্য ছিল একথা কিছুতেই স্বীকার করা যায় না। শিবচন্দ্র যে সময় লোক হিতৈষিণী সভা প্রতিষ্ঠা করিয়া গ্রামের উন্নয়নমূলক কার্যে প্রবৃত্ত হন, সেই ১৮৫০ সালে রক্ষণশীল সমাজ মহামহোপাধ্যায় দীনবন্ধু ন্যায়রত্ন মহাশয়ের সম্পাদনায় ধর্মমর্ম প্রকাশিকা নামক একটি মাসিকপত্র প্রকাশ করিয়া নিজেদের মতামত প্রচার করিতেন। বছর দুই পরে পত্রিকাটির প্রকাশ বন্ধ হয়ে যায়। কিন্তু গিরীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের সম্পাদকত্বে ১৮৫৫ সালে ঐ পত্রিকা পুনরায় প্রকাশিত হইতে থাকে।

দীনবন্ধু ন্যায়রত্ন মহাশয় কোন্নগরের এক লব্ধপ্রতিষ্ঠ পণ্ডিত বংশের সন্তান ছিলেন। ন্যায়শাস্ত্রে ব্যুৎপত্তির জন্য তিনি ভারতের সর্বত্র সুপরিচিত ছিলেন। তাঁহার পিতা হরচন্দ্র বিদ্যালঙ্কারও পাণ্ডিত্যের জন্য সুনাম অর্জন করেন! কিন্তু এই বংশের সর্বাপেক্ষা উজ্জ্বলতম জ্যোতিষ্ক ছিলেন দীনবন্ধুর পিতামহ কাশীনাথ তর্কবাচস্পতি। তাঁহার অসাধারণ পাণ্ডিত্যের জন্য ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল হইতে বহু ছাত্র অধ্যয়নের জন্য তাঁহার চতুষ্পাঠীতে সমবেত হইত। কোন্নগরের উত্তরাঞ্চলে তৎকালে বহু পণ্ডিতের বসবাস থাকিলেও প্রধানতঃ কাশীনাথের পাণ্ডিত্যের গৌরবের জন্যই ঐ সময় কোন্নগর দ্বিতীয় নবদ্বীপ আখ্যা লাভ করে। মহারানী ভিক্টোরিয়ার রাজত্বের সুবর্ণ জয়ন্তী উপলক্ষে ১৮৮৭ সালে মহেশ ন্যায়রত্ন চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার প্রভৃতি সাতজন সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতের সহিত তাঁহাকেও মহামহোপাধ্যায় উপাধিদানে সম্মানিত করা হয়। এতদ্ব্যতীত তিনি রাজা রাধাকান্ত দেবের সভাপণ্ডিত ছিলেন এবং বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সহিত বিধবা বিবাহ

সংক্রান্ত তর্কসভায় তিনি বিরোধীপক্ষের মুখপাত্র ছিলেন।

১৮৫১ সালে কোন্নগর হইতে জ্ঞানোদয় নামে এক মাসিকপত্র প্রকাশের বিবরণ পাওয়া যায়। সম্পাদকের নাম ছিল চন্দ্রশেখর দেব। চন্দ্রশেখরই শিবচন্দ্রেরই জ্ঞাতি গোষ্ঠীভুক্ত ছিলেন। চন্দ্রশেখর সম্পাদিত ঐ মাসিকপত্রে সাধারণতঃ নব্য-সমাজের ভাবধারা প্রচার করা হইত।

রক্ষণশীল ও প্রগতিশীল সমাজের এই দ্বন্দ্বে শেষ পর্যন্ত প্রগতিশীল দলের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়।

যুক্তিবাদ ও স্বাধীন চিন্তার প্রসারের ফলে পাশ্চাত্য সাহিত্য ও জ্ঞান বিজ্ঞান আহরণের বাধা অপসারিত হওয়ার জীবনের সর্বক্ষেত্রে উন্নতির লক্ষণ দেখা যায়।

শিবচন্দ্রের চরিত্রের বিশেষত্ব ছিল এই যে তিনি কখনও নিজেকে পাদ-প্রদীপের সম্মুখে আনিয়া আত্মগরিমা প্রকাশের সুযোগ খুঁজিতেন না। সম-মতাবলম্বী গুণী ব্যক্তিবর্গকে কোন্নগর বাহির হইতে আনিয়া ও তিনি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের পরিচালক সমিতির সদস্যরূপে তাঁহাদের সাহায্য গ্রহণ করিতে সব সময়েই আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে নিম্নলিখিত ব্যক্তি-বর্গের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ঃ—

১। রাজা জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়—উত্তরপাড়া রাজ পরিবার স্বনামধন্য ব্যক্তি ও তৎকালীন প্রগতিবাদী আন্দোলনের সহিত বিশেষভাবে জড়িত। বদান্যতা ও শিক্ষা বিস্তারে অকৃপণ সাহায্যের জন্য সুবিখ্যাত।

২। রাজা রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়—উত্তরপাড়া রাজ পরিবার। বিদ্যোৎ-সাহী ও উত্তরপাড়ার বিভিন্ন জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের সহিত জড়িত ছিলেন।

৩। রাজা দিগম্বর মিত্র—কলিকাতা প্রবাসী কোন্নগরের মিত্র বংশের সন্তান—তৎকালীন কলিকাতার সমাজের অত্যন্ত সুপরিচিত। কলিকাতার প্রথম ভারতীয় শেরিফ। এবং জমিদার সভার সম্পাদক ও সভাপতি। তৎকালীন বাংলাদেশের বিভিন্ন বিভিন্ন রাজনৈতিক ও সমাজ হিতকর আন্দোলনের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত।

৪। ডাঃ ত্রৈলোক্যনাথ মিত্র কোন্নগরের সন্তান—এম এ ডি এল। কলিকাতা হাইকোর্টের সুবিখ্যাত ব্যবহারজীবী। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম ডি. এল; বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট ও সিণ্ডিকেটের সদস্য। **Dean of the faculty of law, Tagore Law Lecturer** কংগ্রেস আন্দোলনের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত ছিলেন। মাত্র ৫০ বৎসর জীবিত ছিলেন।

৫। যদুগোপাল চট্টোপাধ্যায়। কবি ও সাহিত্যিক—তিনভাগ পদ্যপাঠ রচয়িতা, শেক্সপিয়রের গল্প প্রভৃতি গদ্য সাহিত্য—চললো চিত্তচাপল্য নামক নাটকের রচয়িতা। তৎকালীন সাহিত্য জগতে অত্যন্ত সুপরিচিত ব্যক্তি।

৬। গিরিশচন্দ্র দেব—এম. এ.। শিক্ষাবিদ ও সমাজসেবী; কোন্নগরের দেব বংশের সন্তান—শিবচন্দ্রের ভ্রাতুষ্পুত্র, সমাজসেবার ক্ষেত্রে শিবচন্দ্রের দক্ষিণ হস্তস্বরূপ ছিলেন। একাদিক্রমে ৩৭ বৎসরকাল (১৮৫৪-৯১) কোন্নগর ইংরাজী বিদ্যালয়ের সম্পাদকের পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। দীর্ঘ ৩০ বৎসর-কাল হেয়ার স্কুলের প্রধান শিক্ষকের পদ অলঙ্কৃত করেন।

৭। রায় বাহাদুর মহেন্দ্রনাথ বসু—এম. এ. বি. এল.। কোন্নগর বসুমণি পরিবারের সন্তান। অস্থায়ীভাবে কলিকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন।

৮। বেণীমাধব গঙ্গোপাধ্যায়—এম্. এ.। শিক্ষাবিদ ও সমাজসেবী। কোন্নগর উচ্চবিদ্যালয়ের পরিচালক সমিতির সদস্য ছিলেন। তিনি দীর্ঘকাল সাউথ সুবার্বান স্কুলের প্রধান শিক্ষকের পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। একাধিক ছাত্রপাঠ্য পুস্তক ও ইংরাজী বাংলা অভিধান রচয়িতা।

৯। নবগোপাল মিত্র—হিন্দুমেলার প্রবর্তক। সাংবাদিক সমাজ-সংস্কারক জাতীয়তাবাদী এবং খেলাধুলা ও ব্যায়ামচর্চায় যুবক সমাজের উৎসাহদাতা। ঠাকুর পরিবারের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত এবং মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের দক্ষিণ হস্তস্বরূপ ছিলেন।

১০। শশীভূষণ চট্টোপাধ্যায়—এফ আর জি এস। কোন্নগরের রাজ-রাজেশ্বরীতলার চট্টোপাধ্যায় বংশের সন্তান। মানচিত্র ও গ্লোব প্রকাশক প্রথম ভারতীয়রূপে পরিচিত। একাধিক ভূগোল গ্রন্থের রচয়িতা ছাত্রপাঠ্য পুস্তক —বিশেষতঃ শৈশব পাঠ ১ম হইতে ৫ম ভাগ পাঠ্যপুস্তকরূপে বিদ্যালয়ের বিভিন্ন শ্রেণীতে ব্যবহৃত হইত। একখানি সংক্ষিপ্ত অভিধানও রচনা করেন।

১১। নিত্যকৃষ্ণ বসু—এম. এ.। কোন্নগরের হাইস্কুলের যশস্বী প্রধান শিক্ষক। চাকুরী ব্যপদেশে কোন্নগরে বাস করিতেন। 'মায়াবিনী' ও 'প্রেমের পরীক্ষা' প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করিয়া সুনাম অর্জন করেন। তাঁহার লেখা সাহিত্য 'সেবকের ডায়েরী' সাহিত্য মাসিকপত্রে নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হইয়া সাহিত্যরসিক নামে বিশেষ প্রশংসা লাভ করে।

১২। কালীপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়—বি এল। পেশা ওকালতী হইলেও সঙ্গীতজ্ঞরূপেই বিশেষ পরিচিত। অপেরা সঙ্গীত ও জুড়িগান রচনায় সিদ্ধহস্ত ছিলেন। তানপুরা, পাখোয়াজ বাজাইয়া ওস্তাদরূপে সুনাম অর্জন করেন। বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে পরলোকগমন করেন।

১৩। অতুলকৃষ্ণ মিত্র—কোন্নগর মন্দিরপাড়ার মিত্র বংশের সন্তান। যশস্বী নাট্যকার সু-অভিনেতা ও নাট্যশালার অধ্যক্ষ। তাঁহার রচিত একাধিক নাটক বিশেষতঃ গীতিনাট্য সাফল্যের সহিত কলিকাতা রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হয়।

সাপ্তাহিক বসুমতীর প্রথম সম্পাদক। 'আন্দোলন' নামক মাসিকপত্রেরও সম্পাদকতা করেন।

১৪। ললিতমোহন বসু—ক্লাইপার রোড বকুলতলার বসু বংশের। ব্যায়ামচর্চায় বিশেষ সুনামের অধিকারী। একাধিক কুস্তি প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান অধিকার করিয়া পদক লাভ করেন। কোন্নগর নৌকাবাইচ দলের অধিনায়ক ছিলেন।

১৫। ডাক্তার আশুতোষ মিত্র। কাশ্মীর রাজ্যের চিকিৎসা বিভাগের সর্বোচ্চ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। রাজকীয় মন্ত্রিমণ্ডলীরও অন্যতম ছিলেন।

১৬। ডাঃ কৃষ্ণধন ঘোষ। কোন্নগরের অধিবাসী ও কোন্নগর উচ্চবিদ্যালয় হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষোত্তীর্ণ প্রথম দলের ছাত্রবৃন্দের অন্যতম। ঋষি অরবিন্দের পিতারূপে সুপরিচিত। বিলাত হইতে চিকিৎসা শাস্ত্রে উচ্চশিক্ষা লাভ করিয়া সিভিল সার্জনরূপে অবিভক্ত বাংলার বিভিন্ন জেলায় চাকুরী করেন।

১৭। পূর্ণচন্দ্র বসু—কোন্নগরের অধিবাসী প্রথম ভারতীয় দিয়াশলাই প্রস্তুতকারকরূপে স্মরণীয়।

কোন্‌নগর দেবপাড়ার ঐতিহ্য

কোন্‌নগরের পূর্বাঞ্চলের দুটি রাস্তা শিবচন্দ্র দেব ষ্ট্রীট ও শ্যামাচরণ দেব লেন সংলগ্ন এলাকাকে দেবপাড়া বলা হয়ে থাকে। আমাদের বাল্যকালে শ্যামাচরণ দেব লেনের উত্তর দক্ষিণে বিস্তৃত বাহুটিকে নীতি পাগলীর গলি বলে অভিহিত করা হত।

সংলগ্ন জি. টি. রোডকে দেবপাড়ার অন্তর্ভুক্ত করে নিলে বাজার, রেল ষ্টেশন, খেয়াঘাট, শ্মশানঘাট এবং হাসপাতাল ছাড়া গ্রাম জীবনের অবশ্য-প্রয়োজনীয় সকল প্রতিষ্ঠানগুলিই এই অঞ্চলে অবস্থিত।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে কোন্‌নগর উচ্চবিদ্যালয়, হিন্দু বালিকা বিদ্যালয়, শিবচন্দ্র প্রাথমিক বিদ্যালয়, কোন্‌নগর সাধারণ গ্রন্থাগার, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ এবং ওঁকার মঠ ও দক্ষিণাকালীর মন্দির এই এলাকার মধ্যে পড়ে। আর্থিক লেনদেন সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠান কোন্‌নগর সমবায় ব্যাঙ্ক লিমিটেড

এবং পোষ্ট অফিস, শান্তিরক্ষা বিষয়ক প্রতিষ্ঠান—কোন্‌নগর পুলিশ ফাঁড়ী ব্যতীত রাজ্যবীমা কর্মচারী স্থানীয় অফিস, রেশন অফিস ও ব্রাহ্মসমাজ গৃহে অবস্থিত মহিলা শিল্প প্রতিষ্ঠান ও কিশোর ব্যায়াম প্রতিষ্ঠান এই অঞ্চলে অবস্থিত।

পঞ্চাশ বছর আগেও এই অঞ্চলটি একদম বিরল এলাকা ছিল। সেইসময়ে কয়েকটি মৎস্যজীবী পরিবার, দেব পরিবার এবং তাঁদের দৌহিত্রবংশীয় বসু, ঘোষ ও পালিত পরিবার ছাড়া পশ্চিম অঞ্চলের দু'চারটি মুসলমান পরিবারের বসতিই এই এলাকার উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য বলে গণ্য করা হত।

ক্রমে ক্রমে এই অঞ্চলের বিস্তীর্ণ ফাঁকা জমিসমূহে অনেক নতুন গৃহ নির্মিত হয়েছে। প্রায় সমস্ত গৃহই ইঁট নির্মিত দেওয়াল ও ছাদযুক্ত। সকল বর্ণের মানুষই ঐ সকল গৃহের অধিবাসী, অবশ্য কায়স্থ পরিবারের সংখ্যাধিক্য বিশেষভাবে ক্ষুণ্ণ হয়েছে বলে মনে হয় না।

বারাকপুর থেকে আগত নিধিরাম দেব বংশসম্ভূত দেব পরিবারের মানুষেরা মূলতঃ দেবপাড়ার ঐতিহ্যের ধারক ও বাহক। এই ঐতিহ্যের ধারায় মহাত্মা শিবচন্দ্র দেবই যে শীর্ষস্থান অধিকার করে আছেন সে কথা উল্লেখ করা বাহুল্য মাত্র। কোন্‌নগর উচ্চবিদ্যালয়, কোন্‌নগর বালিকা বিদ্যালয়, প্রাথমিক বিদ্যালয়, সাধারণ গ্রন্থাগার, রেল ষ্টেশন, পোষ্ট অফিস, করদাতা সমিতি, ব্রাহ্মসমাজ, হোমিওপ্যাথিক দাতব্য চিকিৎসালয়, সমাজ ঘাট, সামাজিক নিরাপত্তার উদ্দেশ্যে চৌকিদার নিয়োগের ব্যবস্থার প্রবর্তন করে তিনি কোন্‌নগরের গ্রামবাসীদের সর্বাঙ্গীণ উন্নয়নের পথ প্রশস্ত করে গেছেন। সুতরাং তাঁর ক্ষেত্রে কোন্‌নগরের জনক নামের সার্থকতা প্রশ্নাতীত।

দেব পরিবারের পরবর্তী উল্লেখযোগ্য নাম ৺গিরীশচন্দ্র দেব। তিনি কলকাতা হেয়ার স্কুলের প্রধান শিক্ষক ছিলেন। তিনি মহাত্মা শিবচন্দ্রের ভ্রাতুষ্পুত্র ও একান্ত বিশ্বাসভাজন ছিলেন। তাঁর উপর বিদ্যালয়ের সম্পাদনার ভার প্রদান করে শিবচন্দ্র নিশ্চিন্ত ছিলেন। একাধিক্রমে ৩৭ বৎসরকাল দক্ষতার সঙ্গে ঐ দায়িত্ব পালন করে ঐ বিশ্বাসের সার্থকতা তিনি প্রতিপন্ন করেছেন।

দেব পরিবারের পরবর্তী উল্লেখযোগ্য নাম ডাঃ শরৎকুমার দেব, এল, এম, এস। শুধু হৃদয়বান চিকিৎসক হিসাবেই নয়, সমাজসেবার ক্ষেত্রেও তাঁর অবদান স্মরণীয়। তিনি কোন্‌নগর উচ্চ বিদ্যালয়ের সম্পাদক ও কোন্‌নগর সাধারণ গ্রন্থাগারের সভাপতির পদ অলংকৃত করেছেন। কয়েক বছরের জন্য তিনি রিষড়া-কোন্‌নগর মিউনিসিপ্যালিটির কমিশনার পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। কোন্‌নগরের উচ্চ বিদ্যালয়ের সংস্কার কার্যে, বিশেষতঃ কোন্‌নগর বাজারের, বর্তমান শ্মশানঘাট পুনর্নির্মাণে তাঁর কৃতিত্ব প্রশংসনীয়।

ডাঃ শরৎকুমার দেবের ভ্রাতা ৺ললিতকুমার দেব বহুকাল কোন্নগর সাধারণ গ্রন্হাগারের সম্পাদক ছিলেন। কোন্নগর সাধারণ গ্রন্হাগারের শিশুবিভাগ তাঁর স্মৃতিরক্ষণকল্পে প্রতিষ্ঠিত।

৺ললিতকুমার দেবের জ্যেষ্ঠ পুত্র ৺প্রফুল্লকুমার দেব কোন্নগর সমবায় ব্যাংক লিমিটেডের প্রতিষ্ঠাতা, সভ্য ও সম্পাদকরূপে এবং কোন্নগর উচ্চ বিদ্যালয়ের ও সাধারণ গ্রন্হাগারের পরিচালক সমিতির সভ্যরূপে সমাজ-সেবার উল্লেখযোগ্য নিদর্শন রেখে গেছেন।

প্রফুল্লকুমারের কনিষ্ঠ ভ্রাতা ৺অতুল্যকুমার দেব কোন্নগর পৌরসভার সদস্য ছিলেন। উচ্চ বিদ্যালয়ের পরিচালক সমিতির সভ্য, শিবচন্দ্র প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহ সভাপতি ও কোন্নগর সমবায় ব্যাংকের পরিচালক সমিতির সদস্যরূপে জনসংযোগের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত তিনি স্থাপন করে গেছেন।

দেব পরিবারের রামদুলাল দেব উচ্চ বিদ্যালয়ের একজন কৃতী ছাত্র ছিলেন। চাকুরীজীবনে তিনি সাব জজের পদে অধিষ্ঠিত হন; কয়েক বৎসর-কাল তিনি উচ্চ বিদ্যালয়ের পরিচালক সমিতির সহ সভাপতির পদেও অধিষ্ঠিত ছিলেন।

এঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতা রামধন দেবের পুত্র ৺নির্মল দেব সরকারী কৃষি বিভাগের কর্মচারী হয়েও সাহিত্যসেবকরূপে সুযশ অর্জন করেছেন। তাঁর রচিত দুটি উপন্যাসের নাম যথাক্রমে "ছিন্ন তার" ও "ঝড়ের ফুল"। "ঝড়ের ফুল" উপন্যাসটি কথাশিল্পী শরৎচন্দ্রের প্রশংসাধন্য।

দেবপাড়ার বসু পরিবারের রায়বাহাদুর রাধিকানাথ বসু এম, এ, উচ্চ বিদ্যালয়ের এক প্রতিভাবান ছাত্র। এম, এ পাশ করে কিছুকাল তিনি উত্তর-পাড়া প্যারীমোহন কলেজের অধ্যক্ষ হিসাবে কাজ করেন। অতঃপর পাবনা এডওয়ার্ড কলেজে অধ্যক্ষরূপে যোগদান করেন এবং অবসর গ্রহণ না করা পর্যন্ত তিনি ঐ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। "Notes on Rhetoric and Prosody" তাঁর ইংরাজী ছন্দ বিষয়ে গভীর জ্ঞানের পরিচায়ক। বইখানি মহাবিদ্যালয়ের ছাত্রগণের পক্ষে অপরিহার্য গ্রন্হ। পাবনা কলেজে যোগদানের পূর্বে তিনি উচ্চ বিদ্যালয়ের পরিচালক সমিতির সদস্য ছিলেন এবং বিদ্যালয়গৃহের পুনর্নির্মাণে গুরুত্বপূর্ণ অংশগ্রহণ করেন।

পাবনা থাকাকালে পাবনার সাংস্কৃতিক জীবন ব্যতীত সমাজজীবনেও তাঁর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। তিনি বহুকাল পাবনা মিউনিসিপ্যালিটির সভাপতিরূপে ঐ শহরের উন্নয়নমূলক প্রচেষ্টার সঙ্গে জড়িত ছিলেন। সমাজ-সেবামূলক কর্মের স্বীকৃতিস্বরূপ তৎকালীন বৃটিশ শাসকগণ কর্তৃক রায়বাহাদুর উপাধি দ্বারা তিনি সম্মানিত হন।

রাধিকানাথ বসুর মধ্যম ভ্রাতা বিজলীনাথ বসু কোন্নগর সাধারণ

গ্রন্থাগারের পরিচালক সমিতির সভ্য ছিলেন। মূলতঃ তাঁরই উদ্যোগে ১৯৩৫ সালে সাধারণ গ্রন্থাগারের শিশু বিভাগের প্রতিষ্ঠা হয়।

কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীনরেন্দ্রনাথ বসু সদ্য প্রয়াত। আনুমানিক ১৯১৭ সালে তাঁরা কয়েকজন বন্ধু একত্রে কোন্নগর ফ্রেন্ডস এসোসিয়েশনের প্রতিষ্ঠা করেন। ইংরাজী রচনা, বাংলা এবং ইংরাজী কবিতা আবৃত্তিতে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় প্রথম স্থানাধিকারী উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্রদের এসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে পুরস্কার দান করে উৎসাহিত করা হত। তাছাড়া ঐ এসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্রদের মধ্যে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় ইংরাজী, বাংলা, অংক বিষয়ে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থানাধিকারীদের পদক এবং পুরস্কার দানে উৎসাহিত করা হত। সম্ভবত ১৯১৭ থেকে ১৯২৫ সাল—এই ৯ বছর ঐ প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা গৃহীত হয়েছিল। নরেন বসু মহাশয় বালিকা বিদ্যালয়ের কোষাধ্যক্ষ ও উচ্চ বিদ্যালয়ের পরিচালক সমিতির সদস্য ছিলেন। ৺রামদুলাল দেবের পুত্র মলয়কুমার দেব ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান সমূহের হিসাব পরীক্ষকরূপে সুপরিচিত। কলকাতা হাইকোর্টের কাছে তাঁর কার্যালয় বর্তমান। হিন্দু বালিকা বিদ্যালয়ে এককালীন ১০,০০০ টাকা দান করে তিনি পিতার স্মৃতিতে একটি ব্লক নির্মাণে সহায়তা করেছেন। হিন্দু বালিকা বিদ্যালয়ের তিনি একজন প্রাক্তন সম্পাদক।

কোন্নগরের দেবপাড়ার ৺চন্দ্রশেখর দেব কোন্নগর তথা বাংলাদেশের ইতিহাসে এক স্মরণীয় নাম। তিনি মহাত্মা শিবচন্দ্রের সমকালীন এবং বয়সে এক বছরের বড় ছিলেন। তিনিও হিন্দু কলেজের ছাত্র ছিলেন এবং চাকুরী জীবনে সরকারী ডেপুটি কালেক্টর ছিলেন। রামমোহনের আদি শিষ্যবর্গের মধ্যে তিনি অন্যতম। সমাজ সংস্কার, স্ত্রী স্বাধীনতা, স্ত্রীশিক্ষা বিস্তার, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা রক্ষা, খ্রীষ্টান মিশনারী প্রভাব এড়ানো হিন্দু চ্যারিটেবল ইনস্টিটিউশনের প্রতিষ্ঠা এবং বৃটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটি স্থাপনে তিনি উদ্যোগী ছিলেন। ১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দের তিন নং রেগুলেশনের সাহায্যে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা হরণের প্রতিবাদে তিনি ১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দে টাউন হলের সভার বক্তৃতায় বিশিষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করেন। তাঁর সম্পাদনায় ১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দে 'জ্ঞানোদয়' নামে মাসিক পত্র প্রকাশিত হয়। জীবনের অধিকাংশ সময় কলকাতা ও গিরিডির ব্রাহ্ম উপনিবেশে বাস করার ফলে তিনি কোন্নগরবাসীগণের কাছে তেমন পরিচিত ছিলেন না।

৺শরৎকুমার বসু ও ৺পূর্ণচন্দ্র মিত্র উভয়েই কোন্নগরের জামাতা ছিলেন। তাঁরা দুজনেই চাকুরী জীবনে ভারতীয় সৈন্যবাহিনীর হিসাব পরীক্ষকের অফিসে চাকুরী করতেন। অবসর গ্রহণের পর শরৎবাবু মহাত্মা শিবচন্দ্র দেবের প্রাসাদোপম অট্টালিকা ক্রয় করে সেখানে বসবাস করেন। পূর্ণ মিত্র মহাশয়

শ্বশুর ধাম সংলগ্ন জমিতে গৃহনির্মাণ করে এখানকার স্থায়ী বাসিন্দা হন।

শরৎবাবুর বাসভবন বর্তমানে গৌরধাম নামে পরিচিত। শরৎবাবু ও পূর্ণবাবু উভয়েই কোন্‌নগরের হলিডে ক্লাবের পদাধিকারী সভ্য ছিলেন এবং দেবপাড়ার ক্রীড়া প্রতিযোগিতার প্রবর্তন করে বিদ্যালয়ের ছাত্রগণের মধ্যে খেলাধুলায় উৎসাহ দান করেছেন। অবশ্য ললিতকুমার দেবের মধ্যম পুত্র অমূল্যকুমার দেবই ছিলেন এই ব্যাপারের প্রধান উদ্যোক্তা।

দেবপাড়ার পালিত বংশের সন্তান লেঃ কর্ণেল অনাথনাথ পালিত ভারতীয় সৈন্যবাহিনীর ডাক্তার ছিলেন। তিনি কোন্‌নগর উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্র এবং চাকুরী থেকে অবসর গ্রহণের পর স্থায়ীভাবে বিহারের বাঁকীপুরে বাস করেন।

১৭১২ শকাব্দে ৺কৃষ্ণমোহনদাস ঘোষ ও শ্রীমতী রাসমণি দাসী কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত কালীমন্দিরটি দেবপাড়ার একমাত্র ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান। মধ্যাস্থিত কালীমন্দিরটির দুপাশে একটি করে শিবমন্দির। দুপাশের শিবমন্দির দুটির তুলনায় কালীমন্দিরটি যথেষ্ট বড়। মূর্তিটি দক্ষিণাকালীর; সুচিক্কণ কালো কষ্টিপাথরে নির্মিত। এখানে নিত্যপূজার ব্যবস্থা আছে। বর্তমান সেবায়েতগণের নাম যথাক্রমে সর্বশ্রী প্রসন্নকুমার, প্রকাশচন্দ্র ও প্রভাতচন্দ্র পালিত। পালিত ভ্রাতৃবৃন্দ ঘোষ দম্পতির দৌহিত্র বংশীয়। এঁদের বর্তমান ঠিকানা ২০বি, নলিন সরকার ষ্ট্রীট, কলকাতা। মন্দিরগুলির তদারকীর ভার কোন্‌নগর নিবাসী শ্রীঅজিত মজুমদারের উপর অর্পিত। মন্দির সংলগ্ন জমি হস্তান্তরিত হয়ে গৃহ নির্মাণের সরঞ্জাম ও কয়লার গোলা, তথা বাসগৃহ ইত্যাদি নির্মিত হওয়ার ফলে মন্দিরটির শোভা যথেষ্ট পরিমাণ হ্রাস পেয়েছে।

দেবপাড়া নিবাসী ঈশা মহম্মদ একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ চারুশিল্পী এবং গভর্ণমেণ্ট আর্ট কলেজেব অধ্যক্ষ ছিলেন।

সঙ্গত কারণেই শ্রীমলয়কুমার দেব, শ্রীনরেন্দ্রনাথ বসু ও চারুশিল্পী ঈশা মহম্মদ ব্যতীত অন্যান্য জীবিত ব্যক্তিবর্গের নাম এখানে যথাসম্ভব পরিহার করার চেষ্টা করা হয়েছে।

এই প্রবন্ধে মোটামুটিভাবে দেবপাড়ার ঐতিহ্যের একটি চিত্র তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। লেখকের অজানিত কিছু কিছু তথ্য বাদ পড়ার সম্ভাবনার কথা অস্বীকার করা যায় না।

কোন্নগরে নবজাগরণ আন্দোলনের প্রভাব

ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়া

প্রাচীন গ্রীক এবং ল্যাটিন সাহিত্য ও শিল্পের অনুসরণে ষোড়শ শতাব্দীর ইউরোপের সাংস্কৃতিক চিন্তাধারা যে নব অভ্যুত্থানের রূপ পরিগ্রহ করেছিল ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলার নবজাগরণ আন্দোলন ঠিক সে পথে অগ্রসর হয়নি। চিন্তার স্বাধীনতা ও যুক্তিনির্ভরতা-এর প্রধান অবলম্বন হলেও ধর্মীয় সংস্কার ও মানবতাভিত্তিক মতবাদকে আশ্রয় করে তৎকালীন বাংলাদেশে এই আন্দোলনের সূচনা করেন মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়— ঊনবিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশকে।

বৈদান্তিক ব্রহ্মবাদ, মুসলমান ধর্মের একেশ্বরবাদ ও পৌত্তলিকতা বিরোধিতাকে কেন্দ্র করে তিনি আত্মীয় সভার মাধ্যমে ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর প্রগতিশীল মানবতাবাদী চিন্তার প্রতিফলন রয়েছে সহমরণ প্রথা নিবারণ, ইংরেজী ভাষায় ব্যুৎপত্তিলাভের সাহায্যে ইউরোপীয় সাহিত্য, শিল্প ও জ্ঞান বিজ্ঞানের সঙ্গে পরিচয়ের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা সঞ্চয় তথা মনের প্রসারতা ও প্রচলিত ধর্মীয় আচার-ব্যবহারের কূপমণ্ডুকতা থেকে অব্যাহতি লাভের পথ উন্মোচন। এ বিষয়ে দ্বারকানাথ ঠাকুরের সহায়তা অনস্বীকার্য।

পরবর্তীকালে দ্বারকনাথের পুত্র মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর নিজ বাসভবনে আদি ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠা করে ব্রাহ্মধর্মের ভিত্তিকে দৃঢ়তর করেন। রামমোহন বৈদান্তিক ব্রহ্মতত্ত্বের নিরাকার নৈর্ব্যক্তিক উপাসনাকে গুরুত্ব প্রদান করলেও দেবেন্দ্রনাথ ধ্যানলব্ধ আত্মপ্রত্যয় সিদ্ধ ও উপলব্ধি সঞ্জাত ব্যক্তিস্বরূপ ঈশ্বরের উপাসনাকে স্বীকৃতি দান করেন। রামমোহনের চিন্তায় তন্ত্রের ও ইসলামের প্রভাব লক্ষ্য করা গেলেও দেবেন্দ্রনাথ উপনিষদের ভাবধারায় অনুপ্রাণিত ছিলেন। রামমোহন পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করেছিলেন। অপরপক্ষে দেবেন্দ্রনাথ ভারতীয় সংস্কৃতির উপর আস্থা স্থাপন করে সংস্কৃত ভাষাচর্চার অনুরাগ প্রদর্শন করেন এবং ভাবের আদান-প্রদানে সম্ভবপক্ষে ইংরেজী ভাষাকে বর্জন করারই চেষ্টা করে গেছেন এবং সকল ব্যাপারে স্বাদেশিকতাকেই গুরুত্বদানের পক্ষপাতী ছিলেন। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় ধর্মীয় আলোচনা এবং ন্যাশন্যাল পেপারের মাধ্যমে স্বদেশানুরাগ প্রচার তাঁর মূল লক্ষ্য ছিল।

এই বিষয়ে কোন্নগরের যে দুজন কৃতী পুরুষ তাঁকে বিশেষভাবে সহায়তা করেন তাঁরা যথাক্রমে মহাত্মা শিবচন্দ্র দেব ও নবগোপাল মিত্র।

শিবচন্দ্রের মনস্বিতা ও ধর্মানুরাগ দেবেন্দ্রনাথের প্রসাদ পুষ্ট হওয়ার ফলে মহর্ষি একাধিকবার তাঁর গৃহে পদার্পণ করে উপাসনা সভায় অধ্যক্ষতা করেন উপরন্তু শিবচন্দ্র কর্তৃক স্থানীয় ব্রাহ্মসমাজ স্থাপনেও দেবেন্দ্রনাথ বিশেষভাবে সহায়তা করেন।

গ্রামবাসীদের প্রবল বিরোধিতার সম্মুখীন হয়েও শিবচন্দ্র স্থানীয় ব্যক্তিগণের মধ্যে যাঁদের আকৃষ্ট করেন তাঁদের মধ্যে পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়, দয়ালচন্দ্র শিরোমণি ও চন্দ্রশেখর দেব প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য।

অপর পক্ষে গ্রামোন্নয়নের ক্ষেত্রে তিন ভ্রাতুষ্পুত্র গিরীশচন্দ্র দেব, রাজা দিগম্বর মিত্র ও ডাঃ ত্রৈলোক্যনাথ মিত্রের সহযোগিতালাভে সমর্থ হন। ধর্মমতের বিভিন্নতা সত্ত্বেও সমাজ হিতৈষণা বিষয়ে কোন্নগরের জনসাধারণ তাঁর প্রচেষ্টাকে সমর্থন করতে কার্পণ্য করেননি।

সমাজসেবা ও জাতীয় ভাবোদ্দীপক পরিকল্পনা রূপায়ণে নবগোপাল ছিলেন মহর্ষির দক্ষিণ হস্তস্বরূপ। "শরীরচর্চা, স্বদেশী কৃষি ও পণ্যের উন্নতি —সাহিত্য ও শিল্পকলার উদ্বোধন—শিক্ষা, রাজনীতি ও অর্থনীতির সকল দিকে জাতিকে আত্মনির্ভরশীল ও স্বয়ম্ভর করে তোলাই ছিল তাঁর স্বপ্ন। ন্যাশন্যাল পেপারের মাধ্যমে প্রচার ও ন্যাশনাল সোসাইটির সভায় চিন্তাপ্রসূ আলোচনা দ্বারা শিক্ষা, সাহিত্য, বিজ্ঞান, ধর্ম, সমাজ ও অর্থনীতি বিষয়ে জ্ঞানলাভে অনুপ্রেরণা দান নবগোপালের অবিস্মরণীয় কীর্তি।" তা ছাড়া বাঙালী যুবকদের জন্য সামরিক শিক্ষার ব্যবস্থা, শাসনকার্যে ভারতীয়দের ন্যায্য অধিকার দান, নির্বাচন প্রথার মাধ্যমে স্বায়ত্তশাসন পরিচালনা, দেশীয় সংবাদপত্রের স্বাধীনতা রক্ষা প্রভৃতি আন্দোলনে তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেন।

বার্ষিক হিন্দুমেলায় স্বদেশীপণ্যের প্রদর্শনী ও দেশাত্মবোধক প্রবন্ধ ও কবিতা পাঠের দ্বারা তিনি দেশীয় যুবকগণের মধ্যে জাতীয়তা বোধের উদ্দীপনা সঞ্চারে বিশেষভাবে সাহায্য করেন।

পরবর্তী পর্যায়ে ধর্মসম্পর্ক বিবর্জিত উদার মানবিকতা ও ইউরোপীয় জ্ঞান-বিজ্ঞানের শিক্ষাকে প্রাধান্য দিয়ে স্বাধীন চিন্তা ও মানবাধিকারের সমূহের উপর গুরুত্ব আরোপ করে যিনি শিক্ষা বিস্তার ও সমাজ সংস্কার আন্দোলনে অগ্রসর হলেন সেই ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের প্রভাব কোন্নগরে প্রতিফলিত হয়েছিল শিবচন্দ্র দেব স্থাপিত কোন্নগর হিতৈষিণী সভার মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত, কোনগর উচ্চবিদ্যালয়, কোন্নগর বালিকা বিদ্যালয়, বঙ্গ বিদ্যালয়, কোন্নগর সাধারণ পাঠাগার প্রভৃতিতে। সহকর্মীরূপে তিনি যাঁদের পেয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে ত্রৈলোক্যনাথ মিত্র, দিগম্বর মিত্র এবং পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় ব্যতীত চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়, শম্ভুচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, যদুগোপাল

চট্টোপাধ্যায়, গোবিন্দচন্দ্র মিত্র, রায়বাহাদুর মহেন্দ্রনাথ বসু ও তিতুচরণ তরফদার প্রভৃতি নামও উল্লেখযোগ্য।

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বিধবাবিবাহ প্রবর্তন ও বহুবিবাহ নিবারক আন্দোলনে শিবচন্দ্র যথেষ্ট সাহায্য করলেও কোন্নগরের রক্ষণশীল সমাজ বিশেষতঃ সুপ্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক দীনবন্ধু ন্যায়রত্ন ও রাজা দিগম্বর মিত্র এই আন্দোলনের প্রবল বিরোধিতা করেন। এমনকি রাজা রাধাকান্ত দেবের শোভাবাজার রাজবাটীতে অনুষ্ঠিত বিধবা বিবাহ সংক্রান্ত তর্কসভায় ন্যায়রত্ন মহাশয় প্রতিপক্ষের মুখপত্রের ভূমিকা গ্রহণ করেন।

শিবচন্দ্রের অন্যান্য জনহিতকর কার্যকলাপের মধ্যে দাতব্য চিকিৎসালয়, করদাতা সমিতি, ডাকঘর ও রেলওয়ে ষ্টেশন স্থাপন ও চৌরভয় নিবারণকল্পে চৌকীদার প্রথার প্রবর্তন বিশেষভাবে স্মরণীয়।

কোন্নগর পৌর এলাকা শিবচন্দ্রের জীবিতাবস্থায় শ্রীরামপুর পৌরসভার অন্তর্ভুক্ত ছিল। কোন্নগরের প্রতিনিধিরূপে ডাঃ ত্রৈলোক্যনাথ মিত্র, শিবচন্দ্র দেব ও শম্ভুচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়গণ এই পৌরসভার সভ্যপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। বিশেষ গৌরবের কথা এই যে ডাঃ ত্রৈলোক্যনাথ মিত্র এই পৌরসভার প্রথম বে-সরকারী ভারতীয় সভাপতির পদ অলঙ্কৃত করেন। ঠাকুর আইন অধ্যাপকের পদে অধিষ্ঠান, বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন সংক্রান্ত সভার অধ্যক্ষতা, ১৮৮৭ সনে মাদ্রাজ কংগ্রেস অধিবেশনে বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্ব, হিন্দু বিধবাগণের আইন-সম্মত অধিকার বিষয়ে প্রামাণ্য গ্রন্থরচনা ত্রৈলোক্যনাথের উল্লেখযোগ্য কৃতিত্ব। তা ছাড়া তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম ডি. এল।

শিবচন্দ্র দেব প্রতিষ্ঠিত কোন্নগর উচ্চ বিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্রদের মধ্যে অরবিন্দ-জনক কৃষ্ণধন ঘোষ আই. এম. এস., পদ্যপাঠ রচয়িতা যদুগোপাল চট্টোপাধ্যায়, ভারতীয় ভাষায় প্রথম ভূগোলগ্রন্থ রচয়িতা এবং মানচিত্র ও ভূ-গোলকের নির্মাতা শশীভূষণ চট্টোপাধ্যায় এফ. আর. জি. এস. এর নামও উল্লেখের দাবী রাখে। বিদ্যালয়ের ছাত্র রায়বাহাদুর মহেন্দ্রনাথ বসু কলিকাতা হাইকোর্টের বিচারপতির পদ অলঙ্কৃত করেন।

কিন্তু পরবর্তীকালে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জীবিতাবস্থায়ই ধর্মীয় ঐতিহ্যের ধারাবাহিকতার সূত্র অবলম্বন করে মূর্তিপূজার আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা ও ধর্ম সমন্বয়ের বাণী বহন করে ভবতারিণীর পূজারী সাধক রামকৃষ্ণের আবির্ভাব হিন্দুধর্মের পুনরুজ্জীবনে নূতন গতিবেগ সঞ্চার করে। রামকৃষ্ণের শিষ্য বিবেকানন্দ এই পুনরুজ্জীবনবাদী আন্দোলনের এক বিস্ময়কর আবিষ্কার। বিবেকানন্দ বেদান্তের জীবশিববাদকে ব্যবহারিক জীবনে প্রয়োগ করার উদাত্ত আহ্বান জানিয়ে বাঙালী যুবসমাজকে সামাজিক ও রাজনৈতিক

আচার-অনুষ্ঠানগত অবাঞ্ছনীয় বাধাবিঘ্নসমূহ অতিক্রম করতে বিশেষভাবে উদ্বুদ্ধ করেন। তাঁর আহ্বানে সাড়া দিয়ে একদল যুবক সমাজ-সেবায় আত্মনিয়োগ করে, অপর দল স্বদেশমন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণ করে পরাধীনতার শৃঙ্খল-মোচনে প্রবৃত্ত হয়। ইতিপূর্বেও কয়েকজন যুবক রামকৃষ্ণ পরিমণ্ডলের অন্তর্ভুক্ত হয়ে দক্ষিণেশ্বরে যাতায়াত শুরু করে। কোন্নগরের দক্ষিণপাড়া নিবাসী মনোমোহন মিত্র ঘনিষ্ঠ যোগসূত্র স্থাপন করে রামকৃষ্ণ পরিকরগণের অন্যতমরূপে পরিগণিত হন। সেই সময়ে শ্রীরামকৃষ্ণের সহিত কোন্নগর গ্রামের অধিবাসীগণের ঘনিষ্ঠ সংযোগের কথাও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কোন্নগরের ভারত বিখ্যাত নৈয়ায়িক দীনবন্ধু ন্যায়রত্নের সহিত সাক্ষাৎকার ও আলোচনা —কোন্নগরের ভক্তবৃন্দ সমভিব্যাহারে হরিসংকীর্তন পূর্বক গ্রাম পরিক্রমা, একাধিকবার হরিসভার ধর্মানুষ্ঠানে যোগদান প্রভৃতি ব্যাপারের সূত্রে এখানকার রক্ষণশীল সমাজ তাঁহার সমন্বয়মূলক চিন্তাধারা ও দেশের প্রচলিত সংস্কারে সমর্থনসূচক মতবাদের সহিত পরিচয় লাভ করে বিশেষ উৎসাহিত হয়। রামকৃষ্ণকে যুগাবতারের স্বীকৃতি দানও মনোমোহন প্রমুখ কোন্নগরের ভক্ত-মণ্ডলীর এক স্মরণীয় কৃতিত্ব।

পরবর্তী যুগে রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দের তিরোধানের পরেও বিবেকানন্দ ভাবধারায় অনুপ্রাণিত স্থানীয় যুবকগণের মধ্যে যতীন্দ্রনাথ রায় ও নৃপেন্দ্র-নাথ ঘোষ অনাথভাণ্ডার স্থাপন করে আর্তসেবায় ব্রতী হন। অপরপক্ষে ললিতমোহন ঘোষাল আমেদাবাদে গিয়ে তাঁতশিল্পে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে দেশীয় বস্ত্র কারখানায় তন্তুশিল্প শিক্ষকের পদে যোগদান করেন।

সমসাময়িক ব্যক্তিবর্গের মধ্যে ডাঃ চণ্ডীচরণ ঘোষাল, নৃসিংহ দাস বসু, ডাঃ শরৎকুমার দেব, রায়বাহাদুর রাধিকানাথ বসু, পিতাম্বর চট্টোপাধ্যায়, রায়সাহেব জ্যোতিষচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, হরিচরণ চট্টোপাধ্যায়, ননীগোপাল বসু, কিশোরীমোহন ঘোষাল, সত্যচরণ মুখোপাধ্যায়, ডাঃ হরিসত্য ভট্টাচার্য প্রমুখেরা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, পৌরসভা অথবা সমবায় প্রতিষ্ঠানে যোগদান করে সমাজসেবায় আত্মনিয়োগ করেন। ইন্দ্রনাথ চক্রবর্তী প্রত্যক্ষভাবে এইসব প্রতিষ্ঠানের সহিত যুক্ত না থাকলেও এই গোষ্ঠীরই অন্তর্ভুক্ত থেকে স্থানীয় কংগ্রেস সংগঠনের দায়িত্ব গ্রহণ করেন এবং সাধারণ পাঠাগারের উন্নয়নেও বিশিষ্ট অংশ গ্রহণ করেন।

বঙ্কিমচন্দ্রের ভাবশিষ্য শ্রীঅরবিন্দ আনন্দমঠে প্রচারিত বন্দেমাতরম্ মন্ত্রের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে বঙ্গভঙ্গ নিরোধ আন্দোলন চলাকালে দেশের স্বাধীনতা অর্জনের উদ্দেশ্যে সশস্ত্র বিপ্লবের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করেন। মানিকতলা বোমা মামলার নিষ্পত্তি হলে আলিপুর জেল থেকে মুক্তিলাভের পর ১৯০৯ সালে শ্রীঅরবিন্দের কোন্নগরে আগমন ও ভাষণদানে উৎসাহিত হয়ে

স্থানীয় যুবকবৃন্দের কয়েকজন দেশোদ্ধারকল্পে গুপ্ত বিপ্লবী আন্দোলনের প্রতি আকৃষ্ট হন এবং সরকারের কোপদৃষ্টিতে পড়ে কয়েক বৎসরের জন্য অন্তরীণাবদ্ধ বন্দী জীবনযাপনে বাধ্য হন। এই গোষ্ঠীর যুবকগণের মধ্যে কুমুদকুমার মিত্র (জ্ঞানভাই) নিবারণচন্দ্র মিত্র, হেমন্তকুমার দে ও ক্ষেত্রনাথ মিত্র প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য।

কয়েক বৎসর পরে মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে অসহযোগ আন্দোলনের দুর্বার তরঙ্গে সমগ্র দেশ যখন প্লাবিত হয় তখন ইন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর পরিচালনায় সভাসমিতির মাধ্যমে স্থানীয় জনগণের মধ্যে কংগ্রেসের আদর্শের সফল প্রয়াসের নিদর্শনস্বরূপ স্থানীয় যুবক শিশিরকুমার মিত্র কলেজের শিক্ষা পরিত্যাগ করে পূর্ণোদ্যমে দেশসেবায় আত্মনিয়োগ করেন। গৌড়ীয় বিদ্যায়তনে ছাত্রাবস্থায় তিনি প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিষয়ে গবেষণা করে সুনাম অর্জন করেন। অধ্যাপক কালিদাস নাগের নির্দেশে শিশিরকুমার শান্তিনিকেতনে শিক্ষকের পদে যোগদান করেন। কয়েক বৎসর পরে অরবিন্দের চিন্তাধারায় আকৃষ্ট হয়ে পণ্ডিচেরীর অরবিন্দ আশ্রমে শিক্ষকের পদ গ্রহণ করেন ও মাধ্যমিক শিক্ষাবিভাগের প্রধানের পদ অলঙ্কৃত করেন। তাঁহার রচিত ভারতীয় সংস্কৃতি বিষয়ে একাধিক গ্রন্থ আন্তর্জাতিক খ্যাতি লাভ করেছে। কোন্নগরের অন্যতম কৃতীসন্তান অরবিন্দ ভক্ত শ্যামাচরণ চট্টোপাধ্যায় রচিত অরবিন্দ দর্শনের একাধিক গ্রন্থও অরবিন্দ অনুরাগী মহলে বিশেষ সমাদৃত।

দেশবন্ধু পরিচালিত তারকেশ্বর সত্যাগ্রহ আন্দোলনে যোগদানকারী কংগ্রেস কর্মীগণের মধ্যে সতীশচন্দ্র দাসের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। আন্দোলনে যোগদান করে তিনি কারাদণ্ড ভোগ করেন। এই সময় ইন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর নেতৃত্বে নগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় প্রমুখ কংগ্রেস কর্মীরা জাতীয়সঙ্গীত সহকারে কোন্নগরও নিকটবর্তী অঞ্চলসমূহ পরিক্রমা করে স্বেচ্ছাসেবক ও অর্থসংগ্রহ করে।

১৯৩২ সালে লবণ আন্দোলন চলাকালে ইন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর নেতৃত্বে বেআইনীভাবে লবণ প্রস্তুত করার সময় কোন্নগরের যে ছয়জন যুবক ধৃত হয়ে কারারুদ্ধ হন তাঁদের নাম যথাক্রমে বিশ্বনাথ চট্টোপাধ্যায়, ননীগোপাল চট্টোপাধ্যায়, রাধারমণ মুখোপাধ্যায়, বিজয়কুমার ঘোষ, রাজকৃষ্ণ মিত্র ও শম্ভুনাথ মল্লিক।

সমসাময়িককালে শ্রীকাননবিহারী মুখোপাধ্যায়ের উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত ও ইন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর সভাপতিত্বে পরিচালিত পাঠচক্রের কার্যকলাপ কোন্নগরের সংস্কৃতির জগতের এক উল্লেখযোগ্য ঘটনা। বিশেষতঃ বহু লব্ধপ্রতিষ্ঠিত সাহিত্যিক ও কলারসিকবৃন্দের উপস্থিতিতে কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র

চট্টোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত প্রথম হুগলী জেলা সাহিত্য সম্মিলন বাংলাদেশের সাহিত্য জগতে এক আলোড়নের সৃষ্টি করে। তৎকালে সাহিত্যিক গোষ্ঠীর সহিত সংযোগ স্থাপনে পাঠচক্রের কর্মীবৃন্দের ও অতিথি আপ্যায়নে কুমার শরৎ মিত্রের বিশেষ অবদান আছে।

কোন্নগরের কংগ্রেস আন্দোলন কখনও দ্রুত কখনও শ্লথ গতিতে অগ্রসর হলেও এখানকার কংগ্রেসসেবীরা বিশেষ উপলক্ষে ও বিশেষ অনুষ্ঠানে সাড়া দিতে কখনও পশ্চাৎপদ হননি। বিশেষতঃ স্বাধীনতা দিবস, ২৬শে জানুয়ারীতে কোন্নগর দ্বাদশ মন্দির প্রাঙ্গণে কংগ্রেসের পতাকা উত্তোলন ও স্বাধীনতার সংকল্প বাক্যপাঠ ছিল নৈমিত্তিক ঘটনা। বক্তৃতা প্রসঙ্গে স্বাধীনতা অর্জনের উদ্দেশ্যে ত্যাগ ও দুঃখবরণের জন্য যুবকবৃন্দকে উদ্বুদ্ধ করা হত।

১৯৪২ সালে "ভারত ছাড়" আন্দোলন চলাকালে স্থানীয় কংগ্রেস কর্মীবৃন্দ ডাকঘরের কার্যকলাপ ও রেল চলাচল ব্যবস্থা সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত করে দেয়। আন্দোলন সম্পর্কে গুপ্তসংবাদ সংগ্রহ ও তথ্য প্রচারের দ্বারা স্থানীয় কংগ্রেস কর্মীগণকে অবহিত করা বিষয়ে ইন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর ভূমিকা উল্লেখনীয়।

১৯৪৭ সালে স্বাধীনতালাভের পর স্থানীয় কংগ্রেস কর্মীবৃন্দ গঠনমূলক কার্যকলাপে সচেষ্ট হন এবং নিখিলভারত কংগ্রেস ও জেলাকংগ্রেসের নির্দেশ-সমূহ নিষ্ঠা সহকারে পালন করেন।

১৯৬২ সালে চীন কর্তৃক ভারত আক্রমণের সময় এবং ১৯৬৪ সালে পাকিস্তান কর্তৃক ভারত আক্রমণকালে প্রফুল্লচন্দ্র সেন ও বিজয় সিংহ নাহারের সভাপতিত্বে দ্বাদশ মন্দির ও কোন্নগর উচ্চবিদ্যালয় প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত যুদ্ধের ব্যয়নির্বাহের জন্য অর্থসংগ্রহ অভিযানে স্থানীয় কংগ্রেস গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে সংগ্রহের মধ্যে অর্থ ব্যতীত কিছু স্বর্ণালঙ্কার এবং লেখক কর্তৃক প্রদত্ত বিশেষ কৃতিত্বের জন্য পুরস্কারলব্ধ দুইটি স্বর্ণপদকও ছিল।

১৯৭২ সালে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস দ্বিধাবিভক্ত হওয়ার পর এখানকার বর্ষীয়ান কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ ঐ প্রতিষ্ঠানের সহিত সক্রিয় সংযোগে বিরত থাকেন।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যেতে পারে স্বাধীনোত্তরকালে ভারতবর্ষে বিশেষতঃ পশ্চিমবঙ্গে কম্যুনিষ্ট আন্দোলনের যে প্রসার লাভ ঘটে কোন্নগরের যুবকদের এক গণনীয় অংশ ঐ আন্দোলনের শরীক হয়ে এতদঞ্চলে সাম্যবাদী ভাবাদর্শ প্রচারে বর্তমানে বিশেষ সচেষ্ট আছেন।

মূলতঃ ধর্মীয় সংস্কারের উদ্দেশ্যে রামমোহন যে আন্দোলনের সূত্রপাত করেন ক্রমান্বয়ে তা সমাজ ও শিক্ষা সংস্কারের পথে প্রবাহিত হয়ে মানবিক

অধিকারের সর্বাঙ্গীণ প্রতিষ্ঠা ও দেশাত্মবোধের উদ্দীপনা সঞ্চারের দ্বারা কিভাবে স্বাধীনতা ও সাম্যবাদী আন্দোলনের মধ্যে পরিণতি লাভ করে কোন্নগর অঞ্চলকে উপলক্ষ করে তার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস এই প্রবন্ধের মাধ্যমে পরিবেশিত হল।

মহামহোপাধ্যায় দীনবন্ধু ন্যায়রত্ন

বঙ্গদেশের ঊনবিংশ শতাব্দীর সংস্কৃত চর্চার ইতিহাসে কোন্নগরের এক বৈশিষ্ট্যপূর্ণ অবদান সর্বজন স্বীকৃত। কোন্নগরের উত্তরাঞ্চলের অধিবাসীগণের মধ্যে ব্রাহ্মণগণের সংখ্যাধিক্য থাকায় সংস্কৃতাভিজ্ঞ পণ্ডিতগণও ঐ অঞ্চলেই তাঁহাদের চতুষ্পাঠী স্থাপন করিয়া শিক্ষাদানে ব্যাপৃত ছিলেন।

কোন্নগরের বিশালাক্ষী সড়ক ও হাতীরকুল অঞ্চলেই বিদ্যাভূষণ, বিদ্যাসাগর, বিদ্যারত্ন, বিদ্যানিধি, ন্যায়রত্ন, ন্যায়বাচস্পতি প্রভৃতি উপাধিধারী বহু পণ্ডিত বাস করিয়া অধ্যাপনায় ও শাস্ত্রচিন্তায় কালাতিপাত করিতেন। কোন্নগরের বহুখ্যাত দুই পণ্ডিতের নাম যথাক্রমে কাশীনাথ ন্যায়বাচস্পতি ও মহামহোপাধ্যায় দীনবন্ধু ন্যায়রত্ন। কাশীনাথ ন্যায়বাচস্পতির বিদ্যাবত্তা অষ্টাবিংশ শতাব্দীর শেষ দুই দশকে বঙ্গদেশে তো বটেই, এমনকি সমগ্র ভারতে এতদূর পরিব্যাপ্ত হয়েছিল যে তৎকালীন কোন্নগর দ্বিতীয় নবদ্বীপ নামে পরিচিতি লাভ করে। তাঁহার চতুষ্পাঠীতে বঙ্গদেশ ব্যতীত ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে শিক্ষালাভের উদ্দেশ্যে ছাত্রগণ সমবেত হতেন।

কোন্নগরের চতুষ্পাঠীগুলিতে যে বিষয়ে শিক্ষাদান করা হত তাহা মূলতঃ ব্যাকরণ, ন্যায় ও স্মৃতি এবং কোন কোন চতুষ্পাঠীতে জ্যোতিষশাস্ত্র সম্বন্ধেও শিক্ষাদানের ব্যবস্থা ছিল। বেদান্তচর্চা কোন্নগরে প্রায় অজ্ঞাত ছিল। অবশ্য ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে ফরিদপুর কোটালীপাড়া নিবাসী যজ্ঞেশ্বর বেদান্তভূষণ মহাশয় কোন্নগরে স্থায়ীভাবে বসতি স্থাপন করিলে তিনি ছাত্রগণকে বেদান্ত বিষয়ে শিক্ষাদান করেছেন। উত্তর জীবনে তিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করে পরিব্রাজকার্য দণ্ডীস্বামী নির্মলানন্দ সরস্বতী নাম গ্রহণ করে ওঁকার মঠ স্থাপন করেন, সেখানে কিছুকাল বসবাস করেন এবং মঠের মধ্যে বিন্দুবাসিনী নামে কালীদেবীর এক মন্দিরের প্রতিষ্ঠা করেন। প্রাণ

বিয়োগের পর তার মরদেহ দণ্ডায়মান অবস্থায় ঐ মঠের মধ্যে সমাহিত করা হয়।

সংস্কৃত শিক্ষার দুইটি ধারা এদেশে প্রচলিত। এক শ্রেণীর পণ্ডিত চতুষ্পাঠী স্থাপন করে ছাত্রগণের শিক্ষাদানকে জীবনের ব্রতরূপে গ্রহণ করেছিলেন। অপর শ্রেণী প্রচলিত ব্যাকরণ, স্মৃতি, ন্যায়, বেদান্ত প্রভৃতি শাস্ত্রের টীকা ভাষ্য রচনা করে তাঁহাদের বিদ্যা ও জ্ঞানানুশীলনের পরিধিকে প্রসারিত করে গেছেন। দুঃখের বিষয় কোন্নগরের পণ্ডিতগণের মধ্যে বহু প্রথম শ্রেণীর পণ্ডিতের পরিচয় পেলেও দ্বিতীয় শ্রেণীর কোনও পণ্ডিতের সন্ধান আমরা পাই না।

এই প্রথম ধারায় ঐতিহ্যবাহী কোন্নগরের পণ্ডিত সমাজের কাশীনাথ ন্যায় বাচস্পতির পাণ্ডিত্য বিষয়ে খ্যাতির কথা আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি। কিন্তু তার সমসাময়িক প্রত্যক্ষদর্শীর নিকট থেকেই পাওয়া কোন বিবরণ আমাদের অধিগত না হওয়ার ফলেই তার জ্ঞান গরিমার কোন বিস্তারিত আলোচনা বর্তমানে সম্ভব নয়। কিন্তু তাঁর পৌত্র মহামহোপাধ্যায় দীনবন্ধু ন্যায়রত্নের জীবিতকালের মানুষেরা তথা সমসাময়িক যুগের ইতিহাস রচয়িতারা যে উপকরণ সংগ্রহ করেছেন তার থেকে দীনবন্ধু ন্যায়রত্ন মহাশয়ের পাণ্ডিত্য প্রতিভা তথা তর্ক কুশলতার ঘনিষ্ঠ পরিচয় লাভ সহজসাধ্য হয়েছে। বর্তমানে আমরা সেই প্রসঙ্গে কিছুটা বিস্তারিত আলোচনায় প্রবৃত্ত হচ্ছি।

ভাগীরথীর পশ্চিম তীরবর্তী কোন্নগরের পণ্ডিত সমাজে বহু পণ্ডিত বংশের অবস্থিতি প্রায় তিনশত বৎসরের মত। তার মধ্যে একটি বিশেষ বংশের পাণ্ডিত্য কোন্নগরের মুখোজ্জ্বল করেছে। যশোর জেলার কাঁটাদিয়া নিবাসী গঙ্গাগতি ভট্টাচার্য মহাশয়ের পুত্র নারায়ণ খাঞ্জর একাদশ পুত্রের অন্যতম আনন্দ সার্বভৌম। আনন্দ সার্বভৌম কোন্নগরের উত্তরাঞ্চলের বিশালাক্ষী সড়কে প্রায় তিনশত বৎসর পূর্বে বসতি স্থাপন করেন এবং নব্যন্যায়ের অধ্যাপনার উদ্দেশ্যে চতুষ্পাঠী স্থাপন করেন। তাঁর ছয় পুত্রের কনিষ্ঠতম ছিলেন শ্রীনিবাস তর্কবাগীশ। মহামহোপাধ্যায় দীনবন্ধু ন্যায়রত্ন ছিলেন তাঁর বংশে চতুর্থ অধঃস্তন পুরুষ। যথাক্রমে শ্রীনিবাস→রামকান্ত তর্কসিদ্ধান্ত →কাশীনাথ ন্যায় বাচস্পতি→হরসুন্দর তর্কালঙ্কার→দীনবন্ধু ন্যায়রত্ন। ১৩০২ বঙ্গাব্দে ৭৬ বৎসর বয়সে তাঁর দেহান্তর ঘটে। কাশীনাথ নদীয়ার শঙ্কর তর্কবাগীশের ছাত্র এবং দিগ্‌বিজয়ী নৈয়ায়িকরূপে পরিচিত ছিলেন। তার জীবিতাবস্থায় কোন্নগর দ্বিতীয় নবদ্বীপ আখ্যালাভ করে। নবদ্বীপের কাশীরাম শিরোমণির প্রথমাবস্থার এক বিচারে কাশীনাথ একজন মধ্যস্থ ছিলেন। দীনবন্ধুর জীবিতকাল পর্যন্ত কোন্নগরের পাণ্ডিত্য খ্যাতি অক্ষুণ্ণ ছিল।

দীনবন্ধু প্রথমতঃ উত্তরপাড়ার জয়শঙ্কর তর্কালঙ্কারেরও পরে নদীয়ায় মাধব তর্কসিদ্ধান্তের ছাত্র ছিলেন। তাঁর পাণ্ডিত্য প্রতিভা ও অধ্যাপনা গুণে আকৃষ্ট হয়ে বহু ছাত্র তাঁর চতুষ্পাঠীতে শিক্ষালাভ করেন। ভবিষ্যতে যাঁরা কৃতবিদ্য হয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে বাকলা কলমকাঠির কাশীশ্বর তর্কবাগীশ ও চণ্ডীচরণ তর্কবাগীশ ১৮৮০ সালে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। সুরেন্দ্রলাল ও লক্ষ্মণচন্দ্র তর্কতীর্থ ১৮৯২ সালে প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন। এতদ্ব্যতীত কোঠালি পাড়ার আশুতোষ তর্করত্ন ও যশোরের নহাটার কৃষ্ণনাথ ন্যায়ভূষণও তাঁর ছাত্র ছিলেন।

দীনবন্ধু কলিকাতা পণ্ডিত সভার প্রথম সভাপতি ও কোন্নগরের ধর্মমর্ম প্রকাশিকা সম্পাদক ছিলেন। তিনি শোভাবাজারের রাজা রাধাকান্ত দেবের সভাপণ্ডিত ছিলেন এবং বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সহিত বিধবা বিবাহ বিষয়ক তর্কসভায় প্রতিপক্ষের মুখপাত্র ছিলেন।

১৮৮৭ সালে রানী ভিক্টোরিয়ার রাজত্বকালের সুবর্ণ জয়ন্তী উপলক্ষে প্রদত্ত প্রথম মহামহোপাধ্যায় উপাধি প্রাপ্ত পণ্ডিতগণের তিনি অন্যতম ছিলেন।

৺জয়কৃষ্ণ মুখার্জীর জীবদ্দশায় বৌদ্ধাধিকার আলোচনার জন্য দুইজন ইউরোপীয় পণ্ডিত কলিকাতায় আসেন। জয়কৃষ্ণ তাঁদের তৎকালীন নৈয়ায়িক শ্রেষ্ঠ কোন্নগরের দীনবন্ধু ন্যায়রত্ন মহাশয়ের কাছে পাঠান। দীনবন্ধু বলেন ঐ গ্রন্থের পঠন পাঠন বঙ্গদেশে বিলুপ্তপ্রায়। দীনবন্ধু তাঁর অধ্যাপক মহানৈয়ায়িক জয়শঙ্কর তর্কালঙ্কারের এক মাদ্রাজী ছাত্রের নিকট তাঁদের প্রেরণ করেন। তাঁরা সেখানে প্রয়োজনীয় তথ্য অবগত হয়ে জয়কৃষ্ণের নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

ন্যায়রত্ন মহাশয়ের তর্ককুশলতা -নৈয়ায়িক পারদর্শিতা ও পরিহাস রসিকতা বিষয়ে নানা কাহিনী গ্রামে প্রচলিত আছে। তাহার মধ্যে তর্ক-কুশলতা ও নৈয়ায়িক বিচক্ষণতার দুইটি ঘটনা নিম্নে বিবৃত করা হল।

তর্ককুশলতা—ন্যায়রত্ন মহাশয়ের জীবিতাবস্থায় এক সময় এক দণ্ডী সন্ন্যাসী উত্তর ভারত হতে বঙ্গদেশে এসে তাকে তর্কযুদ্ধে পরাস্ত করার আহ্বান জানাইয়া বিভিন্ন অঞ্চলে পরিভ্রমণ করছিলেন। ন্যায়রত্নের ছাত্রেরা তাঁর আহ্বানে সাড়া দিয়ে তাঁকে তাঁদের অধ্যাপক ন্যায়রত্ন মহাশয়ের নিকট উপস্থিত করেন। ন্যায়রত্ন মহাশয় বলেন নৈয়ায়িক হিসাবে তর্ক করাইত তাঁর পেশা। তবে দণ্ডী সন্ন্যাসী মহাশয়ত নিশ্চয়ই বৈদান্তিক—। সুতরাং পরিভাষাগুলি আমাকে বুঝাইয়া দিলে আমি তাঁর সহিত তর্কযুদ্ধে সর্বদাই প্রস্তুত আছি।

সন্ন্যাসী মহাশয় পরিভাষাগুলি বুঝাইয়া দিলে স্থানীয় পণ্ডিতবর্গের

মধ্যস্থতায় তর্কযুদ্ধ আরম্ভ হল এবং সন্ন্যাসী পরাজয় স্বীকারে বাধ্য হলেন। দুঃখের বিষয় তর্কসভার অবসানে এক অপ্রীতিকর ঘটনার উদ্ভব ঘটে। সভার শেষে ন্যায়রত্ন মহাশয় আসন পরিত্যাগ করে যখন সভাকক্ষ ত্যাগ করিতে উদ্যত সেই সময় উল্লসিত ছাত্রবৃন্দ গুরুর আসনটি সন্ন্যাসীর মস্তকে স্থাপন করেন। অপমানিত সন্ন্যাসী ক্রুদ্ধ হয়ে বলেন যে, তর্কযুদ্ধে পরাজয়ত এক স্বাভাবিক ঘটনা—কিন্তু তাঁর শিষ্যগণ কর্তৃক আমাকে এভাবে অপদস্থ হতে দেখেও ন্যায়রত্ন মহাশয় যখন তাঁদের প্রতিনিবৃত্ত করলেন না—তখন আমি অভিশাপ দিচ্ছি যে তাঁর বংশে আর কোন পণ্ডিত জন্মাবে না। তাঁর এই অভিশাপ বাণী অক্ষরে অক্ষরে সত্য বলে প্রমাণিত হয়েছে। বস্তুতঃ ন্যায়রত্ন মহাশয়ের পর ঐ সুপ্রসিদ্ধ বংশের পাণ্ডিত্যের ধারা সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হয়েছে।

নৈয়ায়িক কূটবুদ্ধি—ন্যায়রত্ন মহাশয় উত্তরপাড়ার জমিদার জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের কুলপুরোহিত ছিলেন। মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের মৃত্যুর পর তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র রাজা প্যারীমোহন মহা সমারোহে দানসাগর যজ্ঞ সহকারে শ্রাদ্ধানুষ্ঠানের ব্যবস্থা করেন। দান সামগ্রীর মধ্যে স্বর্ণ ও রৌপ্য নির্মিত তৈজসাদি, মহার্ঘ রেশমের বস্ত্র এবং হাতীও ছিল। শ্রাদ্ধান্তে প্যারীমোহন বাবু ন্যায়রত্ন মহাশয়কে বলেন যে এই সমস্ত মহামূল্য দান-সামগ্রী আচার্য ও ভাটের মত নিম্নশ্রেণীর ব্রাহ্মণকে দেওয়া তাঁর মনঃপূত নয়, —যদি কোন সৎ ব্রাহ্মণ এই সমস্ত দানসামগ্রী গ্রহণে সম্মত থাকেন তাহলে তিনি অনেকটা মানসিক প্রশান্তি লাভ করেন। ন্যায়রত্ন কিছুক্ষণ চিন্তা করে বলেন যে তুমি যদি ইচ্ছা কর তাহলে আমি দান গ্রহণে সম্মত আছি। প্যারীমোহন আনন্দ সহকারে ঐ শ্রাদ্ধীয় দান সামগ্রী ন্যায়রত্ন মহাশয়ের হস্তে অর্পণ করেন।

ন্যায়রত্ন মহাশয় ঐ সমস্ত দানসামগ্রী নিলামে ঐ স্থানেই বিক্রয় করে সংগৃহীত অর্থ গামছায় বেঁধে ঘোড়ার গাড়ী করে গ্রামে ফিরে এলেন।

ইতিমধ্যে গ্রামে রটনা হয়ে গেছে যে ন্যায়রত্ন মহাশয় শ্রাদ্ধের দান গ্রহণ করেছেন। সমাজপতি হাতীরকুল নিবাসী ভৈরবচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নেতৃত্বে সভা আহূত হল—এবং ন্যায়রত্ন মহাশয়কে ঐ সভায় উপস্থিত হয়ে তাঁর আচরণের কৈফিয়ৎ দিতে বলা হল এবং ঘটনা সত্য প্রমাণিত হলে তাঁকে সমাজচ্যুত করার প্রস্তাব গৃহীত হল। ন্যায়রত্ন মহাশয় বললেন আপনারা আগে আমার বক্তব্য শুনুন—বক্তব্য যদি শাস্ত্রসম্মত না হয় তাহলে আপনারা যা বিধান দেবেন তা আমি মাথা পেতে নেবো। তিনি বললেন শ্রাদ্ধের দান সামগ্রীর কিছুমাত্র আমি সঙ্গে আনিনি। এতেও যদি আমার অপরাধ হয়ে থাকে তাহলে সেই অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত গ্রহণে তিনি সব সময়েই প্রস্তুত

আছেন। তিনি দ্বাদশটি ব্রাহ্মণকে ভূরিভোজে আপ্যায়িত করে প্রত্যেককে এক রতি স্বর্ণদানে প্রস্তুতির কথা জানালেন। যদি তাঁরা শাস্ত্রবিধান মানেন তাহলে তাঁকে কিভাবে সমাজচ্যুত করবেন।

সভায় উপস্থিত কারোর পক্ষেই ন্যায়রত্নের বক্তব্যের প্রতিবাদ করা সম্ভব হল না। সুতরাং ন্যায়রত্ন মহাশয়ের কূটবুদ্ধির কাছে পরাস্ত হয়ে তাঁকে সমাজচ্যুতির প্রস্তাব প্রত্যাহৃত হল।

কোন্নগরের বিভিন্ন ঘাট

কোন্নগরে নিত্য ব্যবহৃত স্নানের ঘাটের সংখ্যা ১০টি। তাছাড়া নদী-তীরবর্তী বাসগৃহ, বাগানবাড়ী ও কলকারখানা সংলগ্ন ঘাটের সংখ্যাও দশটির মত।

ভাগীরথীর জলপ্রবাহের গতি পরিবর্তনের ফলে কোন্নগরের নিকটবর্তী অঞ্চলে নদীর পশ্চিম দিক বরাবর গত ১৫-২০ বছরের মধ্যে চড়া পড়িতে থাকায় পূর্ণিমা অমাবস্যার জলোচ্ছ্বাসের প্রবল আঘাতে কোন্নগরের অধিকাংশ ঘাটই নদীগর্ভে ভেঙে পড়েছে। প্রায় ২ শত বছর পূর্বে নির্মিত কোন্নগরের সবচেয়ে আকর্ষণীয় ও বহু ঐতিহাসিক স্মৃতি জড়িত এবং বৃহত্তম দ্বাদশ-মন্দির ঘাটটিও গঙ্গাগর্ভে বিলুপ্ত হবার উপক্রম হয়েছিল। ঘাটের সত্ত্বাধিকারী হাটখোলার ৺হরসুন্দর দত্তের বংশধরগণ ঘাট সংরক্ষণে উদ্যোগী না হওয়ায় পরলোকগত হরিসাধন বন্দ্যোপাধ্যায় কয়েক বৎসর পূর্বে স্থানীয় নেতৃবৃন্দের সহযোগে ঘাট সংরক্ষণ সমিতি গঠন করেন, এবং ঘাট সংরক্ষণের জন্য তৎপর হন। ইতিমধ্যে তাঁহার মৃত্যু ঘটিলেও ঘাট সংরক্ষণ সমিতির আপ্রাণ চেষ্টার ফলে সত্ত্বাধিকারীগণ সমিতি নিয়োজিত অছিগণের তত্ত্বাবধানে দ্বাদশ-মন্দিরের সম্পত্তি হস্তান্তর করিতে সম্মত হন। অতঃপর সমিতির সভ্যবৃন্দ পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সেচবিভাগের সহিত সংযোগ স্থাপন করিয়া কোন্নগরের অনন্য কীর্তিস্বরূপ এই ঘাটটির সংরক্ষণ ব্যাপারে ২-৩ বছরের চেষ্টায় সেচ-বিভাগীয় কর্তৃপক্ষের সম্মতি আদায় করিতে সক্ষম হন। ঘাট রক্ষার জন্য বাঁধ নির্মাণে সমিতির দেয় ৫০০০ টাকা পৌর কর্তৃপক্ষ ও জনসাধারণের নিকট হইতে সংগৃহীত হয়। ইতিমধ্যে বাঁধ নির্মাণ সম্পূর্ণ হয়েছে। ফলে

কোন্নগরের প্রাণকেন্দ্র স্বরূপ এই ঘাটটি নিশ্চিত ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা পেয়েছে।

পুরাতন বাজার ঘাটটির সর্বাপেক্ষা প্রাচীন। জনশ্রুতি অনুসারে প্রায় ৩০০ বছর ধরিয়া স্নানের ঘাটরূপে ইহা ব্যবহৃত হইতেছে। পূর্বে কাঁচা ঘাট হিসাবে ব্যবহৃত হইলেও রায়পাড়ার রায়বংশীয় জমিদারগণ কর্তৃক চাঁদোয়া সমেত সমস্ত ঘাটটি পাকা করিয়া গাঁথা হয় প্রায় ১২৫ বছর আগে। চাঁদোয়াটি এখনও টিঁকিয়া থাকিলেও ঘাটটি নদীগর্ভে সম্পূর্ণভাবে বিলুপ্ত।

বাজার ঘাটটিও প্রাচীন ঘাটগুলির অন্যতম। দক্ষিণ পার্শ্বে কোন্নগরের বৃহত্তম শ্মশান ঘাট। শ্মশান ঘাটটি ভাঙিয়া যাওয়ার উপক্রম হইলে ডাঃ শরৎ-কুমার দেব প্রমুখের চেষ্টায় ২০ বৎসর পূর্বে পুনঃনির্মিত হয়। বাজার ঘাট হইতে পেনিটির নিমাই তীর্থের উত্তরদিকের ঘাটে খেয়া নৌকা নিয়মিতভাবে যাতায়াত করে। প্রশস্ত উন্মুক্ত চাতালসমেত ঘাট ও ছোট শিবমন্দিরটি প্রায় ১০০ বৎসর পূর্বে ডিংসাই পাড়ার চক্রবর্তী বংশীয়গণের পূর্বপুরুষগণ কর্তৃক নির্মিত। শম্ভু চাটুজ্যে ঘাটও একটি পুরাতন ঘাট। দক্ষিণদিকের শ্মশান ঘাটটি নদীগর্ভে বিলুপ্ত হওয়ায় বর্তমানে উত্তরদিকের জমিটি শ্মশানরূপে ব্যবহৃত হইতেছে। উপরের দুইটি শিবমন্দিরসমেত পাকা ঘাটটি বাংলা ১২৭১ সালে ৺শম্ভুচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক নির্মিত। ঘাটটি কোনও রকমে টিঁকিয়া থাকিলেও চাঁদোয়াটি ভাঙিয়া গিয়াছে। ১৩২৮ বঙ্গাব্দে ঘাটের উপরে দক্ষিণদিকের জমিতে ৺সূর্যনারায়ণ সরস্বতী কর্তৃক আনন্দময়ী কালী মন্দিরটি নির্মিত হয়েছে।

বিশালক্ষ্মী ঘাটটি কাঁচা রূপে বহুকাল ব্যবহৃত হলেও ১৩০৮ বঙ্গাব্দে ৺কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পত্নী কামিনী দেবী পাকাঘাট ও ঘাট সংলগ্ন শিবমন্দিরটি নির্মাণ করেন। বর্তমান ঘাটটি সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত। ঘাটের উপর এক বিরাট বটগাছের মূলে বিশালক্ষ্মীর শিলা ও পঞ্চানন্দের মূর্তি প্রতিষ্ঠিত ছিল। কিছুদিন হইল বটগাছটিও নদীগর্ভে ভাঙিয়া পড়িয়াছে। পঞ্চু দত্ত কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত অন্যতম প্রাচীন ঘাটটিও বর্তমানে নদীগর্ভে বিলুপ্ত।

কোন্নগর দ্বাদশ মন্দির

"শাকে দক্ষি বেদধর ভূগণিতে তপস্যে
গ্রামেহ এ কোন্নগরে শিবমন্দিরাণি।
সংনিৰ্ম্মমে কলিকাতা নগরী নিবাসী
সশ্রীক দত্ত হরসুন্দর ইষ্ঠ নিষ্ঠঃ ॥
শকাব্দ ১৭৪২"

দ্বাদশমন্দিরে চাঁদনীর পূর্বে দেওয়ালের উপরের দিকে খোদাই করা কালো প্রস্তর ফলকে উপরোক্ত লেখনটি উৎকীর্ণ আছে। তখনকার কালের ভাষারও একটি নিদর্শন। ইহার বাংলা অর্থঃ—"১৭৪২ শকাব্দে ফাল্গুন মাসে কলিকাতা নিবাসী যাগযজ্ঞ কর্মাভিলাষী শ্রীহরসুন্দর দত্ত দ্বারা এই মন্দির-গুলি প্রতিষ্ঠিত হইল।"

হাটখোলা নিবাসী হরসুন্দর দত্ত মহাশয় এত জায়গা থাকিতে কোন্নগরে এলেন কেন মন্দির প্রতিষ্ঠা করতে। শুধুই কি "বারাণসী সমতুল গঙ্গার পশ্চিমকুল" এই বিশ্বাসে ? বালী, উত্তরপাড়া, মাহেশ, শ্রীরামপুর কাছাকাছি কত জায়গাই তো ছিল। তাহলে আর একটু গোড়ার কথায় যেতে হয়।

যে গোবিন্দপুর সুতানুটী নিয়ে কলকাতার পত্তন, সেই গোবিন্দপুরের নামকরণ হয় গোবিন্দশরণ দত্তের নামানুসারে। তাঁরই পঞ্চম বংশধর হাটখোলা নিবাসী হরসুন্দর দত্ত মহাশয় তাঁর একমাত্র কন্যা ত্রিপুরাসুন্দরীর বিবাহ দেন কোন্নগরের বিখ্যাত মিত্র বংশের মহেশচন্দ্র মিত্রের সঙ্গে। সেই সূত্রে দত্ত মহাশয় কোন্নগরে প্রায়ই যাওয়া আসা করতেন। কন্যার সঙ্গে সঙ্গে কন্যার শ্বশুরালয় কোন্নগরের প্রতিও তাঁর বেশ একটা ভালবাসা ও মমতা এসে পড়ে। তারই পরিণতিস্বরূপ হরসুন্দর প্রতিষ্ঠা করেন এই দেবালয় ১২২৭ সালে (ইং ১৮২১) রাখীপূর্ণিমায় গঙ্গার পশ্চিমকূলে কোন্নগরে।

মাঝখানে ৩৫ ফুট চওড়া সুপ্রশস্ত সুন্দর সিঁড়ি। ছোট পাতলা ইঁটের খাদাই করা। তার জোড় এত সূক্ষ্ম যে বোঝা যায় না। কোন মশলা (Mortar) দিয়ে তৈরী নয়, মনে হয় যেন আঠা দিয়ে জোড়া। তার ওপর নানা কারুকার্যে সুবিন্যস্ত। আজ ১৬০/৬৫ বৎসর পরে তা এখনও প্রায় অটুট। সিঁড়ির দুধারে সুদৃঢ় রানা। ঘাটের ওপর সুদৃশ্য পাকা চাঁদনি। চাঁদনির পর বিরাট গেট পর্যন্ত প্রশস্ত রাস্তা। দুধারে, উত্তর দক্ষিণে শ্রেণীবদ্ধ-ভাবে প্রসারিত ৬টি করে ১২টি শিবের মন্দির। গঙ্গার তীরে বাঁধানো পোস্তা। মন্দিরের পশ্চিমধারে পুষ্পোদ্যানে সারা বৎসর নানা বর্ণের সুন্দর সুন্দর

ফুল শোভা পেত। দক্ষিণদিকে যেখানে শম্ভু চট্টোপাধ্যায়দিগের চালকল এবং পরে লক্ষ্মীনারায়ণ জুট মিলের জেটী ছিল, (অধুনা কাঠচেরাই কল) —সেখানে ছিল বিরাট অতিথিশালা। পথচারী অতিথি সাধুসন্তরা এখানে আশ্রয় এবং ভোগপ্রসাদ পেতেন। কেউ কখনো অভুক্ত ফেরেনি। মন্দিরের উত্তরদিকে ছিল পাকশালা ও ভাঁড়ার। গ্রামের গৃহলক্ষ্মীরা এসে সমবেত হতেন এখানে মহেশ্বরের সেবার এবং পূজাদির আয়োজন করতে। এ চত্বরটিও এখন শিবের সম্পত্তির বাইরে চলে গেছে।

দত্ত মহাশয়ের জীবদ্দশায় মহাসমারোহে শিবঠাকুরের নিত্যসেবা ও বিশেষ পর্বাদির ব্যবস্থা ছিল। এ সম্বন্ধে নানা পত্রিকাদিতে উল্লেখ আছে। শিবের নামে তিনি কিন্তু কোন সম্পত্তি ব্যবস্থা করে যাননি। তিনি মারা যান ১৭ই বৈশাখ ১২৩৮ এবং তাঁর জামাতা মহেশচন্দ্রের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্রগণের মধ্যে পারিবারিক কলহ শুরু হয়। কোন কোন পুত্র উচ্ছৃঙ্খল ও অপব্যয়ী হয়ে জায়গা জমি বিক্রয় করতে আরম্ভ করেন। এইরকম অবস্থায় অন্য পুত্রেরা শিবের নামে বাকি জমি সকল দেবোত্তর করে দেন।

দুর্ভাগ্যক্রমে এই মিত্র বংশেরও পুত্র না থাকায় সম্পত্তি সকল ক্রমশঃ কন্যাদেরই অর্শায়। আসল সম্পর্ক ক্রমশঃ দূরে সরে যাওয়ায় এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে শরিকানী বিভক্ত হওয়ায় শরিকদের মধ্যে কোন্নগরের দ্বাদশমন্দিরে প্রতি তাদের উৎসাহ বা কর্তব্য ক্রমশঃই কমে আসতে থাকে। অনেকেই কোন খোঁজই রাখতেন না। তাঁদের অবহেলা এবং অজ্ঞতার সুযোগ নিয়ে তাঁদের নিযুক্ত নায়েব গোমস্তরা শিবের বেশ কিছু জমিজমা নানাভাবে হস্তান্তর করে দেন। আবার অনেকে বেআইনিভাবে জমি বেদখল করে বসেন। অবস্থা এইভাবে শোচনীয় হতে শোচনীয়তর হয়ে পড়ে। বিগ্রহগুলির যথাযথ সেবা পূজা পর্যন্ত হয় না। কৈলাসেশ্বর শিব পথের ভিখারীর মত একমুষ্ঠি তণ্ডুলের প্রত্যাশায় বসে আছেন।

অথচ চল্লিশ পঁয়তাল্লিশ বছর আগেও ভালভাবেই নিত্যসেবা হত। এমনকি পুরোহিত মহাশয় এখানকার পূজা সেরে আলীনগরের শিবপূজাও নিত্য করতে যেতেন। কেননা আলীনগর (এখন বাঙ্গুর ব্রাদার্স কর্তৃক অধিকৃত) এর শিব এবং সম্পত্তি দ্বাদশমন্দিরেরই অন্তর্ভুক্ত ছিল। সন্ধ্যায় জলপানির ব্যবস্থা ছিল। শিবরাত্রির সময় মহাধুমধামের সঙ্গে বারোটি মন্দির, গেট দেবদারুপাতা রঙিন কাগজের শিকলি দিয়ে সাজানো হত। মন্দিরে মন্দিরে ও প্রাঙ্গণে চাঁদনিতে গ্যাস লাইট দিয়ে আলোয় আলোময় করা হত। চার প্রহরে পূজা হত। পরদিন সকালে সমবেত ভক্ত ও পুণ্যার্থীদের ফল প্রসাদ বিতরণ করা হত।

বৈশাখ মাস ভোর প্রত্যহ বৈকালে প্রচুর ফল প্রসাদ বিতরণ করা হত এবং

প্রতি রবিবার বিভিন্ন পাঁচটি ব্রাহ্মণের বাড়ী ফলের সিধে পাঠান হত ও চাঁদনিতে বসিয়ে ফল প্রসাদ খাওয়ান হত। এছাড়া চড়ক উৎসব এবং মাঘী পূর্ণিমায় প্রতিষ্ঠা দিবসে যথারীতি হোম ও বিশেষ পূজো পালন করা হত।

অনাদরে অবহেলায় ক্রমে ক্রমে সব বিলীন হতে বসলো। পুষ্পোদ্যান গোচারণ ভূমি ও ছেলেদের খেলার মাঠে পরিণত হল। অতিথিশালা রূপান্তরিত হল চাউলকলে,—চটকলের জেটিতে। পাকশালা ভাঁড়ারও পর হস্তগত, প্রচুর তৈজসপত্রাদি উধাও। মন্দির, ফটক, পাঁচিল সব জীর্ণ। দুধারের সুদৃঢ় পোস্তা ভাঙতে ভাঙতে গঙ্গাগর্ভে নেমে যাচ্ছে। চাঁদনীর ছাত মাথায় পড় পড়। ঘাটের তলায় মাটি ক্ষয়ে যাচ্ছে—যে কোনদিন ধ্বসে পড়তে পারে।

এরকম বিপর্যয় অবস্থা দেখে গ্রামের লোকেরা শঙ্কিত হয়ে উঠলেন। ধ্বংসের হাত থেকে কেমন করে এই শিবালয় রক্ষা করা যায়,—শিবঠাকুরের পূজার ব্যবস্থা হয়, এই উদ্যোগ নিয়ে গঠিত হল "কোন্নগর দ্বাদশ মন্দির ঘাট উন্নয়ন সমিতি" ১৯৫১ খ্রীষ্টাব্দে। এই সমিতি গঠনের মূলে ছিলেন রাজ-রাজেশ্বরীতলা নিবাসী উৎসাহী ধর্মপ্রাণ ৺হরিসাধন বন্দ্যোপাধ্যায় (চাচা) স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে তিনি আগে থাকতেই দ্বাদশমন্দির কিছু কিছু দেখাশুনা করতেন। কোন্নগরের উত্তর সীমান্তে বাঙ্গুর ব্রাদার্স কর্তৃক বেআইনীভাবে অধিকৃত আলীনগর এই শিবেরই সম্পত্তি। হরিসাধন বাবু সেখান হতে শিব বিগ্রহটি উদ্ধার করে এনে এই মন্দিরে রক্ষা করেন এবং বাঙ্গুর ব্রাদার্সের দ্বারা সমগ্র দেবালয়টির কিছু সংস্কারও করিয়েছিলেন।

এই সমিতির প্রথম সভাপতি এবং সম্পাদকই যথাক্রমে জ্যোতির্ময় মুখোপাধ্যায় এবং অনিলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। তাঁরাও অকুল পাথারে পড়লেন। এই ভগ্ন জীর্ণ দেউল কিভাবে রক্ষা করা যায়। এই বিরাট কাজ এবং অর্থ সংস্থানের জন্য তাঁরা সরকারের দ্বারস্থ হলেন। শিবের সকল সম্পত্তিই কিন্তু ব্যক্তিগত মালিকানায়। কাজেই সরকারের পক্ষে কোন হস্তক্ষেপ বা সাহায্য সম্ভব নয়। তখন উন্নয়ন সমিতি শরিকদের সন্ধানে ছুটলেন এবং এ বিষয় তাঁদের অবহিত করলেন। মজার কথা তাঁদের কেউ কিছুই জানেন না এবং খবরও রাখেন না। সুখের বিষয় তাঁদের মধ্যে সিংহভাগ অংশীদার ছবিরাণী ঘোষ সানন্দে এগিয়ে এলেন সমিতির হাতে ভার তুলে দেওয়ার জন্যে। কিন্তু কি যে আছে আর কি যে নেই সে বিষয়ে সকলেই অজ্ঞ। কাজেই সমস্ত খোঁজ-খবর করে উপযুক্ত ব্যবস্থা নিতে দেরী হল অনেক। এদিকে সরকারের সঙ্গেও যোগাযোগ অব্যাহত থাকে। গোড়া থেকেই সমিতির সকল কাজে সর্ববিষয়ে শিশিরকুমার ঘোষ (ছোট)র অবদান অপরিসীম। পরে আরও একজন

অংশীদারদের সহযোগে ছবিরাণী ঘোষ উন্নয়ন সমিতির কর্তৃক নিযুক্ত তিন সদস্যের নামে ১৯৬০ সালে জুলাই মাসে অর্পণনামা আঁছপত্র (Trust Deed) রেজেষ্ট্রী করে দেন। প্রথম তিনজন ট্রাষ্টী ছিলেন—শিশিরকুমার ঘোষ (ছোট), নগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এবং অনিলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

ট্রাস্ট ত হলো। কিছু সংরক্ষণের কোন ব্যবস্থা করা গেল না। উপরন্তু কাজের দায়িত্ব এসে চাপলো অনেক। এতদিন যারা নানা রূপে ব্যক্তিগত ভাবে কিছু কিছু স্বার্থ কায়েম করেছিল তারা বাধার সৃষ্টি করলেন। সম্পদের মধ্যে সমিতির হাতে বাজারের সামান্য আয়। সীমিত আয়ের মধ্যে শিব-ঠাকুরের পূজাও সীমিত করে নিতে হয়েছে। এদিকে বাজারের অবস্থাও জীর্ণ। মেরামত না করালে চলে না। বাজারের বিক্রেতারা নানা অসুবিধার কথা তুলে এখন দাবী জানাতে লাগলেন। ঘাটের চাঁদনীর ছাত ভেঙে মাথায় পড় পড়। মিউনিসিপ্যালিটি থেকে কিছু পুরানো টিউবওয়েলের পাইপ এনে চাড়া দিয়ে কোনওরকমে সাময়িকভাবে খাড়া রাখা হল। স্নানার্থীদের সাবধান করে দেওয়ার জন্য, বিঘ্ন সঙ্কুল অংশগুলি দড়ি দিয়ে ঘিরে রাখা হল।

সমিতির সদস্যেরা কি করে কোনদিকে সামাল দেবেন ঠিক করতে না পেরে দিশেহারা হয়ে যখন ছোটাছুটি করছেন তখন যেন শিবঠাকুর নিজেই নিজের ব্যবস্থা করে নিলেন এবং জানিয়ে দিলেন আমরা কত অসহায় ও আমাদের দৌড় কতটুকু! কোথা থেকে কি হয়ে গেল। শিবালয়ের এই জরাজীর্ণ অবস্থা দেখে হঠাৎ যেন ভগবৎ প্রেরিত হয়ে বিড়লা জনকল্যাণ ট্রাষ্ট স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে এগিয়ে এলেন এর সংস্কারে। বিড়লা জনকল্যাণ ট্রাষ্টের সহিত যোগাযোগ করায় এবং সংস্কার কার্যে রতনলাল প্যাচেসিয়া (রতন প্লাসটিক কোং) বিশেষ সহায়তা করেন।

তাহাদের বদান্যতার প্রায় ৫০ হাজার টাকা ব্যয়ে অতি সুন্দররূপে সুচারুভাবে সম্পূর্ণ দেবালয়টির আমূল সংস্কার কার্য সম্পন্ন হয় ১৯৬৬ খৃষ্টাব্দে। এদিকে মা গঙ্গার রোষ কিন্তু কমেনি। তিনি শনৈ অগ্রসর হতে লাগলেন মন্দির গ্রাস করতে এবং সুপ্রশস্ত ঘাটটি সমূলে কবলিত করতে। জনকল্যাণ ট্রাষ্ট ঘাট বা পোস্তা সংস্কারের কার্য করেন না। পোস্তা রক্ষার জন্য উন্নয়ন সমিতি গঠনের শুরু হতেই, পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে অনুরোধ জানিয়েছিলেন। এখন মন্দির এবং চাঁদনী সংস্কার হয়েছে বটে কিন্তু অচিরেই গঙ্গাগর্ভে বিলীন হবার আশঙ্কায় গ্রামবাসী বিচলিত হয়ে পড়লেন। কিন্তু একসময় গঙ্গার প্রচণ্ড বেগ মহাদেব নিজ জটায় ধারণ করে তাকে প্রশমিত করে শান্তমূর্তিতে মর্ত্যে প্রবাহিত করেছিলেন, বাণেশ্বরের ইচ্ছা হলে সামান্য বাণ রোধ করা কিছুই নয়। বোধ করি শিবঠাকুর ইচ্ছা করলেন হরসুন্দর দত্তের প্রতিষ্ঠিত কোন্নগরের এই পুণ্যভূমিতে তিনি অধিষ্ঠিত থাকবেনই।

তাই এতদিনে দীর্ঘ সাত বছরের চেষ্টার পর পশ্চিমবঙ্গ সরকার পোস্তা সংস্কারে সম্মত হলেন। তবে উন্নয়ন সমিতির পক্ষ হতে অবিলম্বে পাঁচ হাজার টাকা দিতে হবে। মিউনিসিপ্যালিটির প্রশাসককে ধরে দু হাজার টাকা অনুদান সংগ্রহ করা হয় এবং ট্রাষ্টী তিনজন তাদের মাত্র দু তিনজন আত্মীয় ও বন্ধু মিলে বাকি তিন হাজার টাকা সরকারের তহবিলে জমা দেওয়ার পর সরকার কর্তৃক প্রায় ৬৪ হাজার টাকা ব্যয়ে সুদৃঢ়ভাবে পোস্তা ও ঘাট সংরক্ষিত হয় ১৯৬৮ সালে।

নবরূপ পরিগ্রহ করে এই দেবদেউল এখন কোন্নগরের একটি আকর্ষণীয় রম্যস্থানে রূপান্তরিত হয়েছে। যথারীতি নিত্যপূজা ছাড়া শিবরাত্রি এবং চড়ক সংক্রান্তিতে বিশেষ পূজা অনুষ্ঠান হয় এবং মেলা বসে। কিন্তু অতিশয় দুঃখের বিষয় কতিপয় উচ্ছৃংখল যুবক এবং চপলমতি বালকের দৌরাত্ম্যে দেবস্থান কলুষিত হয়।

পূজা অনুষ্ঠানাদির জন্য কিছু আয়ের ব্যবস্থা আছে। প্রায় ফোর্ট উইলিয়াম থেকে ডি ওয়াইল্ডি পর্যন্ত গঙ্গার উপকূলবর্তী জি. টি. রোডের উভয় পার্শ্বের বাসিন্দারা এই দ্বাদশমন্দিরেরই প্রজা। কোন্নগর বাজারটি তো তাহারই অন্তর্গত এবং একমাত্র তাহারই আয় হতে সকল ব্যয় নির্বাহিত হইয়া থাকে। বাকি প্রজাদের গড় বার্ষিক খাজনা মাত্র দু'চার টাকা করে। কিন্তু নানা ছুতায় তার প্রায় কিছুই আদায় হয় না। অথচ ঠিকমত পূজাদি, সংস্কার এবং অন্যান্য খরচের জন্য অর্থের প্রয়োজন।

কোন্নগরের এই অমূল্য সম্পদটির স্থায়িত্ব, সৌন্দর্য এবং পবিত্রতা রক্ষা করা গ্রামবাসী মাত্রেরই কর্তব্য ও দায়িত্ব।

কোন্নগর অঞ্চলে সার্বজনীন দুর্গাপূজা

ভারতবর্ষের পূর্বাঞ্চলে দুর্গাপূজার প্রচলন কোন্ সময়ে আরম্ভ হয়েছিল তার সঠিক সংবাদ দেওয়া না গেলেও আলোচনার মাধ্যমে যতটুকু জানতে পারা যায় তাতে মনে হয় একাদশ শতকের রাজা হরিবর্মদেবের মন্ত্রী ও কুলপুরোহিত ভবদেব ভট্ট রচিত স্মৃতি নিবন্ধই দুর্গাপূজা পদ্ধতি বিষয়ে সর্বাপেক্ষা প্রাচীন গ্রন্থ। পরবর্তীকালে জীমূতবাহন, শূলপাণি, শ্রীনাথ

তর্কচূড়ামণি, ভট্ট রঘুনন্দন প্রভৃতি বাঙালী স্মৃতিকার এবং মৈথিল স্মার্ত পণ্ডিত বাচস্পতি মিশ্র রচিত স্মৃতি নিবন্ধে দুর্গাপূজা পদ্ধতির বিবরণ পাওয়া যায়। মৈথিল কবি বিদ্যাপতি তাঁর দুর্গাভক্তিতরঙ্গিনী গ্রন্থে এবং জীমূতবাহন তাঁর দুর্গোৎসব নির্ণয় গ্রন্থে মৃন্ময়ী দেবীপূজার উল্লেখ করেছেন। এই সমস্ত তথ্যের ভিত্তিতে এইরূপ ধারণা করা অসঙ্গত নয় যে এদেশে দ্বাদশ অথবা ত্রয়োদশ শতক থেকে দুর্গাপূজার প্রচলন হয়েছে।

তবে বর্তমানে বাঙলাদেশে যেভাবে দুর্গোৎসব অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে —তার সূচনা ষোড়শ শতকেই বলে মনে হয়। লৌকিক ধারণা অনুযায়ী মনুসংহিতার টীকাকার বাঙালী পণ্ডিত কুল্লুক ভট্টের পুত্র রাজা কংস-নারায়ণই সর্বপ্রথম কয়েক লক্ষ টাকা ব্যয়ে লক্ষ্মী সরস্বতী কার্তিক গণেশ সমন্বিত দশভূজা মহিষমর্দিনী দুর্গামূর্তির পূজা করেন। তিনদিনব্যাপী এই উৎসব উপকরণ বাহুল্য এবং ক্রিয়াধিক্যের জন্য অত্যন্ত ব্যয়সাপেক্ষ। সেই কারণে রাজা মহারাজা অথবা ধনী জমিদার ভিন্ন সাধারণ গৃহস্থ পরিবারের পক্ষে এই ব্যয়বহুল পূজার ব্যবস্থা করা সম্ভব ছিল না। অথচ এই দুর্গোৎসবকে ঘিরে বাঙালী সমাজে যেভাবে বন্যার উচ্ছ্বাস ঘটে থাকে তা অতুলনীয়। তাই উত্তরকালে অপেক্ষাকৃত অল্পসঙ্গতিসম্পন্ন জমিদারগণও নিজেদের আভিজাত্য স্থাপনে এইরূপ পূজানুষ্ঠানে উদ্যোগী হন। সেই অনুষ্ঠানে ভূরিভোজের ব্যবস্থা না থাকলেও আড়ম্বরের কোন অভাব ছিল না। এদেশে বৃটিশ শাসন প্রবর্তনের পর ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ও ধনীর মর্যাদা লাভ করেন। তাঁদের অনেকেই জমি ক্রয় করে জমিদার গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত হয়ে পূর্ববর্তী জমিদারী চালচলন বজায় রাখেন। বংশবিস্তারের ফলে এইসব জমিদারের উত্তরাধিকারীগণ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জমিদারে পরিণত হন,—তাঁরা এই সমস্ত ক্রিয়াকর্ম বজায় রাখলেও ব্যয় সংকোচের ফলে জনসাধারণের কাছে তার আকর্ষণ যথেষ্ট হ্রাস পায় এবং অবশেষে অবস্থা বিপর্যয়ের ফলে বহুক্ষেত্রে এইসব পূজানুষ্ঠান বজায় রাখা সম্ভব হয় না।

বর্তমান শতাব্দীর তৃতীয় দশকে বাঙালী হিন্দু সমাজ দুর্গাপূজো অনুষ্ঠান ব্যাপারে এক সংকটের সম্মুখীন হয়। অথচ এই বাৎসরিক পূজানুষ্ঠানকে ঘিরে বাঙালীর কত না আনন্দ কত না উদ্দীপনা। কথায় বলে ইচ্ছা থাকলেই উপায়ের অভাব হয় না। ইতিপূর্বে রক্ষাকালী, মনসা, শীতলা প্রভৃতি পূজা জনসাধারণের নিকট থেকে সংগৃহীত অর্থে অনুষ্ঠিত হত। অবশ্য এইসব পূজা একবেলার পূজা—কোনটি বা রাত্রে অনুষ্ঠিত হয়।

সুতরাং বাঙালী সমাজ থাকবে অথচ বাঙালীর জাতীয় উৎসব অনুষ্ঠিত হবে না—এ চিন্তা সমাজের নেতৃস্থানীয়েরা কোন মতেই বরদাস্ত করতে

পারবেন না। কলকাতার বাগবাজারের মানুষেরা সম্ভবতঃ এ ব্যাপারে পথ-প্রদর্শক। তাদের দেখাদেখি বাঙলাদেশে অন্যান্য স্থানেও এই ধরনের অর্থাৎ জনসাধারণের নিকট হতে সংগৃহীত অর্থের সাহায্যে পূজানুষ্ঠান শুরু হয়ে গেল।

কোন্নগরের উত্তরাঞ্চলের বিশালক্ষ্মী সড়ক, হাতীরকুল প্রভৃতি স্থানে সে সময়ে মাত্র একটি বাড়ীতে দুর্গাপূজার ব্যবস্থা ছিল---বাড়ীর মালিক ৺কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বা ডিউক কেদার মহাশয় বড় জমিদার না হলেও ছিলেন অবস্থাপন্ন গৃহস্থ। পাড়ার লোকেরা বিশেষতঃ মেয়েরা ঐ বাড়ীতে গিয়েই প্রতিমা দর্শন এবং অষ্টমীর দিন অঞ্জলি দিয়ে আসত। কেদারবাবুর পরলোকগমনে সে পূজো বন্ধ হওয়ার ফলে পাড়ার লোকেরা বিশেষতঃ মেয়েরা অঞ্জলি দেওয়ার ব্যাপারে বিশেষ অসুবিধার সম্মুখীন হল। কেদারবাবুর বাড়ীর পূজানুষ্ঠানে আড়ম্বরের বাহুল্য না থাকলেও আদর-আপ্যায়নের অভাব ছিল না। সুতরাং পাড়ার মেয়েরা নিঃশঙ্কচিত্তে সেই পূজায় অংশগ্রহণ করতেন। অন্য পাড়ায় গিয়ে পূজায় যোগদান—ঐ বাড়ীর কর্তৃপক্ষগণ ঠিক কিভাবে গ্রহণ করবেন—তার কোন নিশ্চয়তা না থাকায়—অনাহূতভাবে এইসব পূজায় অংশগ্রহণ কারো পক্ষেই প্রসন্ন মনে গ্রহণ করা সম্ভব হল না।

সেই সময়ে কোন্নগরের বিশালক্ষ্মী সড়কে শান্তিরাম গাঙ্গুলী মহাশয়ের বাড়ীতে স্যাটারডে ক্লাবের খেলার আসর বসত। সভ্যদের মধ্যে কোন্নগরের বিভিন্ন অঞ্চলের লোক থাকলেও বিশালক্ষ্মী সড়ক—হাতীরকুল অঞ্চলের সভ্যদের ছিল প্রচুর সংখ্যাধিক্য। আলোচনা করে তাঁরা স্থির করলেন—জনসাধারণের কাছ থেকে অর্থ সংগ্রহ করে পাড়ার পূজার ব্যবস্থা অবশ্যই করা হবে। এ বিষয়ে যাঁরা অগ্রণী ছিলেন—তাঁদের মধ্যে কেশববিজয় বন্দ্যোপাধ্যায়, ক্ষেত্রবিজয় বন্দ্যোপাধ্যায়, যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সুবোধ-চন্দ্র মুখোপাধ্যায়, জ্যোতির্ময় মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। গ্রামের মধ্যাঞ্চলের বিপিনচন্দ্র, অমূল্যকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও বীরেন্দ্রকৃষ্ণ মিত্রও এঁদের সঙ্গে ছিলেন। পাড়ার অন্যান্যদের মধ্যে শ্রীবিনয়কৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নামও উল্লেখনীয়। চাঁদার খাতা নিয়ে ক্লাবের সভ্যরা পাড়ার ছেলেদের সঙ্গে বাড়ী বাড়ী ঘুরে অর্থ সংগ্রহ করতে লাগলেন। সকলেই নিজেদের বন্ধুবান্ধব আত্মীয়স্বজনদের কাছ থেকে মায়ের নামে চাঁদা আদায় করতে লাগলেন। সাড়া যা পাওয়া গেল তা যথেষ্ট উৎসাহব্যঞ্জক। বিশালক্ষ্মী সড়কের টোলবাড়ীর মাঠে বাংলা ১৩৩৫ সালের আশ্বিন ১০ তারিখে ষষ্ঠীর দিন দেবীর উদ্বোধন অনুষ্ঠান হল অভূতপূর্ব উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্যে।

চার বছর একাদিক্রমে টোল বাড়ির মাঠে পূজানুষ্ঠানের পর পাড়ায়

বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষের দাবি অনুযায়ী উৎসব কমিটি ৪ বছর অন্তর অন্যান্য উপযুক্ত স্থানেও এই পূজানুষ্ঠানের ব্যবস্থা করলেন।

পঞ্চম বর্ষে মন্দির বাড়ীর সামনের মাঠে পূজার ব্যবস্থা হল। এখানেও ৪ বছর চলার পর নবম বর্ষে পূর্বদিকে আরও এগিয়ে শিরিষতলার মাঠে পূজার ব্যবস্থা হল। বেশ কয়েক বছর ধরে এইখানেই পূজা হয়। ১৩৫০ সালের আশ্বিনের ঝড়ে পূজামণ্ডপ ভেঙে গিয়ে বৃষ্টির জলে প্রতিমা ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার পর ১৩৫১ সালে পুনরায় মন্দিরবাড়ীর মাঠে পূজার ব্যবস্থা করা হয়। এইখানে কয়েক বছব পূজা চলার পর বাংলা ১৩৫৫ সাল থেকে বিশালক্ষ্মী সড়কের কালীতলার মাঠে পূজা স্থানান্তরিত করা হয়। তদ্বধি এতাবৎকাল পর্যন্ত এই কালীতলার মাঠেই স্থায়ীভাবে পূজা অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে।

বিশালক্ষ্মী সড়কের এই পূজাই যে হুগলী জেলার মধ্যে প্রথম সার্বজনীন দুর্গোৎসব এ দাবী উৎসব কমিটির সভ্যদের। যতদিন পর্যন্ত নূতন কোন তথ্যের সাহায্যে এই দাবী অস্বীকৃত হচ্ছে—ততদিন সভ্যদের এ দাবী অগ্রাহ্য করা যায় না—সে কথা মানা ছাড়া গত্যন্তর নেই।

অবশ্য ইতিপূর্বে কোন্নগরের শম্ভু চাটুজ্যের শ্মশানঘাটের আনন্দ আশ্রম সূর্য্যিবাবার চেষ্টায় বাংলা ১৩২৯ সালে অষ্টাদশভুজা মহালক্ষ্মীরূপিণী দেবী মূর্তির পূজা শুরু হয়। সকলেরই এই পূজায় যোগদানের অবশ্য অবাধ অধিকার ছিল—বিশেষতঃ ঐ অঞ্চলের অধিবাসীরা গঙ্গাস্নান উপলক্ষ্যে দুর্গা প্রতিমা দেখার অনায়াস সুযোগ লাভ করতেন। যদিও এ পূজার জনসাধারণের কাছ থেকে অর্থ সংগ্রহ করা হত—এবং সূর্য্যিবাবা প্রতিমা দর্শনের জন্য সকলকেই সাদর আহবান জ্ঞাপন করতেন—তবু এ পূজা মূলতঃ আশ্রমেরই পূজা—এবং এ মূর্তিও প্রচলিত দশভূজা মূর্তির ব্যতিক্রম। সুতরাং বিশালক্ষ্মী সড়কে অনুষ্ঠিত পূজার সার্বজনীনতার দাবীই সম্পূর্ণ সঙ্গত বলেই স্বীকৃত হওয়া উচিত।

এ বছর বিশালক্ষ্মী সড়ক কালীতলা মাঠের দুর্গোৎসবের সুবর্ণ জয়ন্তী। এই পূজানুষ্ঠানে যাঁরা অগ্রণীর ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন তাঁদের নাম ইতিপূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে।

পরবর্তীকালে এই পূজানুষ্ঠানে যাঁদের অবদান বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য তাঁরা হলেন—৺অজয়কুমার মজুমদার, সর্বশ্রী পঞ্চানন দত্ত, মাখনলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, ফণীন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, চণ্ডীচরণ ভট্টাচার্য, ভোলানাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিমলাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায়, গৌরীকান্ত গঙ্গোপাধ্যায়, পঞ্চানন গঙ্গোপাধ্যায়, বিশ্বেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়, কাশীশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়, ব্রজদুলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীপতি ভট্টাচার্য, বাসুদেব ভট্টাচার্য,

মুরারীমোহন ভট্টাচার্য, পরেশচন্দ্র দত্ত, নির্মল মজুমদার, শশাংকশেখর চট্টোপাধ্যায়, পশুপতি ভট্টাচার্য, গৌরমোহন মুখোপাধ্যায়, ক্ষিতীশচন্দ্র বিশ্বাস, গৌরকান্ত মুখোপাধ্যায়, সতীশচন্দ্র দত্ত, কৃষ্ণচন্দ্র মান্না, শিবচন্দ্র মাইতি, তপন বন্দ্যোপাধ্যায়, সমীর বন্দ্যোপাধ্যায়, তপনকুমার বসু, দুলাল-চন্দ্র বিশ্বাস, অনুপ মুখোপাধ্যায় (বড়), অচিনদেব ভট্টাচার্য, কল্যাণ ভট্টাচার্য, পরেশনাথ মান্না। এঁদের কেউ কেউ সম্পাদক, সহঃ সম্পাদক, সহঃ সভাপতি, কোষাধ্যক্ষ, হিসাব পরীক্ষক অথবা কার্যকরী সমিতির সদস্যরূপে অথবা অন্যান্যভাবে এই উৎসবানুষ্ঠানের সহিত যুক্ত। ডাঃ নীলমণি বন্দ্যোপাধ্যায় ৩০ বৎসরকাল এই পূজা কমিটির সভাপতির পদে অধিষ্ঠিত।

কোন্নগর আনন্দ আশ্রমের অষ্টাদশভুজা দুর্গামূর্তি প্রসঙ্গে

কোন্নগর শম্ভুচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের ঘাটে শারদীয়া পূজা উপলক্ষ্যে যে দুর্গামূর্তির অর্চনা করা হয়ে থাকে—অষ্টাদশভুজ সমন্বিতা সেই মূর্তি সম্বন্ধে অনেকের মনে যথেষ্ট কৌতূহল রয়েছে। কারণ বাংলাদেশে সর্বত্রই দশভুজা মূর্তির পূজাই প্রচলিত।

গত বছর ৩০শে নভেম্বর কোন্নগর সাধারণ গ্রন্থাগারে কোন্নগরের ধর্ম-প্রতিষ্ঠান সম্বন্ধে আলোচনার সময় অনেকেই মূর্তির এই বৈশিষ্টের কারণ জানতে চেয়েছিলেন। সেই প্রসঙ্গে ৭ই ডিসেম্বরের বক্তৃতায় যে কথা সংক্ষেপে বলেছিলাম আশ্রমের তরফ থেকে অনুরোধ আসায় সেই বিষয়ে কিছুটা বিস্তারিত বিবরণ রাখার চেষ্টা করছি।

দশভুজা ও অষ্টাদশভুজা প্রতিমার পূজার নির্দিষ্ট কাল ও প্রকরণ সম্বন্ধে কোনও পার্থক্য না থাকায় একথা বুঝতে অসুবিধা হয় না যে মূলতঃ উভয় মূর্তিই এক মহাদেবীরই বিভিন্ন বিভাব। বস্তুতঃ দেবীমূর্তির ইতিহাস আলোচনা করলে দেখা যাবে এক মহিষমর্দিনী মূর্তিই ভারতবর্ষের বিভিন্ন

অঞ্চলে দ্বিভুজা, চতুর্ভুজা, ষড়ভুজা, অষ্টভুজা, দশভুজা, দ্বাদশভুজা, অষ্টাদশভুজা রূপে আরাধিত হয়েছেন। ব্যবহারিক দৃষ্টিতে এই বিভিন্নতা অর্থহীন, কারণ মূলতঃ মহাদেবী এক ও অভিন্ন।

বস্তুতঃ ভারতীয় হিন্দুর আধ্যাত্ম চিন্তায় অদ্বৈতবাদ এক মৌল অখণ্ডনীয় নিত্য ও দেশকালাতীত অবিসম্বাদী তত্ত্ব। এ বিষয়ে বৈষ্ণব, শাক্ত অথবা শৈব সম্প্রদায়ের মধ্যে যেমন কোন মতানৈক্য দেখা যায় না, তেমনি বেদান্ত ও তান্ত্রিক সিদ্ধান্তেও কোন মৌলিক ভেদ নেই। বেদান্ত ও তন্ত্র উভয় মতেই ব্রহ্মই জগৎরূপে প্রতিভাসিত হয়েছেন—মায়াশক্তি প্রভাবে। কিন্তু বেদান্তে মায়ার ব্যবহারিক অস্তিত্ব স্বীকৃত হলেও তার পারমার্থিক সত্তা অবর্তমান। উপরন্তু তন্ত্রের মহামায়া ত্রিকালাবাধিত সত্তারূপিণী ব্রহ্মময়ী। তবুও সাধকের দৃষ্টিতে বেদান্ত ও তন্ত্রে কোন বিরোধ নেই, কারণ বেদান্ত হ'ল বিচারমূলক সিদ্ধান্ত শাস্ত্র আর তন্ত্র হ'ল উপলব্ধিমূলক সাধন শাস্ত্র। শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীরামপ্রসাদ উভয়ের মতেই যিনি কালী তিনিই ব্রহ্ম। ব্রহ্ম ও মহামায়া অভেদ।

তাছাড়া বেদান্ত মতে ব্রহ্মধর্ম বলে কোনও স্বতন্ত্র সত্তার অস্তিত্ব অস্বীকৃত। ব্যবহারিক জগতে ব্রহ্মধর্ম বলে যে প্রতীতি জন্মায় তা অবিদ্যা প্রসূত মায়ার প্রভাবে ঘটে থাকে—রজ্জুতে সর্পভ্রমের মত। বিদ্যালাভে অবিদ্যার নিরসন হলে ব্রহ্মই একমাত্র সত্য বলে প্রতিভাত হয়। কিন্তু তন্ত্র-মতে ব্রহ্মধর্মের স্বীকৃতি রয়েছে—যদিও সে ধর্ম স্বরূপতঃ ধর্মী থেকে অভিন্ন। অগ্নিকে তার উত্তাপ থেকে যেমন পৃথক করা যায় না—তেমনি শক্তি ও শক্তিমানের অবিনাভাবিতা তান্ত্রিক সিদ্ধান্তের বৈশিষ্ট্য। শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছেন জল আর তার তরলতা, দুধ আর তার সাদা রঙ, মণি আর তার জ্যোতিঃ, সমুদ্র আর তার তরঙ্গ যেমন অভিন্ন—ব্রহ্ম আর তার শক্তিও তেমনি অভেদ। শাক্ত সিদ্ধান্তের সার তত্ত্বই হল এই যে মহামায়া অথবা মহাশক্তিই ব্রহ্মস্বরূপা—এবং এই জগৎ ব্রহ্মশক্তির পরিণাম।

ব্রহ্ম ও ব্রহ্মশক্তি মহামায়ার মধ্যে যে কোন ভেদ নেই দেবী ভাগবতের বচন থেকেই সে কথা আরও পরিস্ফুট হয়েছে।

সদৈকত্বংনভেদোঽস্তি সর্বদৈব মমাস্য চ
যো সৌ সাহং অহং বাসৌ ভেদোঽস্তি মতিবিভ্রমাৎ।

আমি ও ব্রহ্ম এক, উভয়ের মধ্যে ভেদ নেই; যিনি ব্রহ্ম তিনিই আমি। আমিও যা তিনিও তাই। বস্তুতঃ এই ভেদ ভ্রমকল্পিত, বাস্তব নয়। ব্রহ্ম এবং তার শক্তিতেও যেমন কোন ভেদ নেই ঠিক তেমনি ব্রহ্মশক্তির প্রকাশ বিভিন্ন হলেও তা মূলতঃ অভিন্ন।

এই মহামায়া দেবীই মহালক্ষ্মী, মহাকালী ও মহাসরস্বতী রূপে

প্রকাশিতা। মহাকালী তামসী ও ঋগ্বেদরূপা, মহালক্ষ্মী রাজসী ও যজুর্বেদরূপা এবং মহাসরস্বতী সাত্ত্বিকী ও সামবেদরূপা। কোন্নগর শম্ভু চট্টোপাধ্যায় ঘাটের আনন্দ আশ্রমে শারদীয় উৎসব উপলক্ষ্যে এই মহালক্ষ্মী মূর্তিরই পূজা করা হয়ে থাকে।

এখন প্রশ্ন হল এই অষ্টাদশভুজা দুর্গামূর্তি উপাসনার পিছনে শাস্ত্রীয় সমর্থন কোথায়? এ প্রশ্ন অত্যন্ত সঙ্গত এবং সেই কথা আলোচনা করেই এ প্রসঙ্গের উপসংহার করছি।

দশভুজা মূর্তি সম্বন্ধে বলা হয়ে থাকে যে ত্রেতা যুগে রামচন্দ্র রাবণের সঙ্গে যুদ্ধে জয়লাভের উদ্দেশ্যে দেবীর মহিষমর্দিনী দশভুজা মূর্তির আরাধনা করে দেবীর বরে জয়লাভে সমর্থ হন। বাংলা কৃত্তিবাসী রামায়ণে এ কাহিনীর উল্লেখ আছে। পরবর্তীকালে রচিত দেবীভাগবত প্রভৃতি একাধিক উপপুরাণেও এই কাহিনী সন্নিবিষ্ট রয়েছে। তাছাড়া ইতিহাসের সমর্থন পাওয়া যাবে—আকবরের রাজত্বকালে ১৫৮০ খ্রীষ্টাব্দে বগুড়া জেলার তাহের-পুরের রাজা মনুসংহিতার টীকাকার কুল্লুক ভট্টের পুত্র কংসনারায়ণ কর্তৃক কুলগুরু রমেশ শাস্ত্রী কর্তৃক পরিকল্পিত লক্ষ্মী সরস্বতী পরিবৃত দশভুজা মহিষমর্দিনী পূজার ঘটনা থেকে। সুতরাং দশভুজা মহিষমর্দিনী মূর্তি যে শাস্ত্রসম্মত ও ইতিহাস সমর্থিত সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই।

অষ্টাদশভুজা মহিষমর্দিনী দুর্গামূর্তিরই অপর নাম মহালক্ষ্মী। অসুর-বিনাশের জন্য রাজসিক মূর্তির প্রয়োজনের কথাও অস্বীকার করা যায় না। মহালক্ষ্মীমূর্তি পূজার পেছনে কোন ঐতিহাসিক তথ্যের সমর্থন না থাকলেও এর শাস্ত্রীয় ভিত্তি সুদৃঢ়। মার্কেণ্ডেয় পুরাণ চণ্ডী কর্তৃক মহিষাসুর বধের উপাখ্যান—দেবতাগণের দ্বারা আরাধনার সময় যে মূর্তির আবির্ভাব হয়েছিল তাঁদের পুঞ্জীভূত তেজের সমন্বয়ে।

যে অমিতপ্রভা দেবী আবির্ভূতা হয়েছিলেন তিনিই ত্রিগুণাময়ী মহিষমর্দিনী সাক্ষাৎ মহালক্ষ্মী ॥ ৭ (চণ্ডী মাহাত্ম্যের ২য় অধ্যায়ের ১০ম হইতে ১৩শ শ্লোকসমূহে এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়) তিনি শ্বেতাননা ও নীলভুজা। স্তনমণ্ডল অতিশ্বেতবর্ণা এবং শরীরের মধ্যভাগ রক্তবর্ণা। তিনি রক্তচরণা। তাঁহার জঙ্ঘা ও উরু নীলবর্ণা ও তিনি ব্রহ্মানন্দে উন্মাদিনী ॥ (দেবীর বিভিন্ন অঙ্গের বর্ণ যে যে দেবতার অংশ হইতে ঐ অঙ্গের উৎপত্তি সেই সেই দেবতার বর্ণের অনুরূপ) তিনি সুচিত্রজঘনা বিচিত্রমাল্য ও বস্ত্র বিভূষিতা, বিবিধ অনুলেপন (গন্ধ) যুক্তা এবং কান্তিরূপা ও সৌভাগ্যমণ্ডিতা ॥ ৯ তিনি সহস্রভুজা হইলেও অষ্টাদশভুজারূপে পূজনীয়া। দক্ষিণদিকের নিম্নহস্ত ক্রমে তাঁহার হস্তস্থিত অস্ত্রসমূহ এখানে বলা হইতেছে ॥ ১০ (সহস্র শব্দ এখানে অনন্তবাচী। দেবী সহস্রভুজা অর্থাৎ অনন্তভুজা)

উপরিউক্ত দেবীর শরীরের বর্ণনার সঙ্গে আনন্দ আশ্রমের দুর্গামূর্তির আকৃতি যে সম্পূর্ণ একরূপ সে কথা উল্লেখ করা বাহুল্য মাত্র। যতদূর মনে হয় আনন্দ আশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা শ্রীমৎ সূর্যনারায়ণ সরস্বতী ধ্যানযোগে এই দেবীমূর্তির দর্শন পান এবং তিনি নিজের আশ্রমে ঐ মূর্তির পূজার প্রবর্তন করেন।

রাজরাজেশ্বরী মাতার সার্বজনীন পূজা

ইহা কোন্নগরের অন্যতম প্রাচীন পূজা। পূজা শুরুর দিনক্ষণ সম্বন্ধে কিংবদন্তী হলো রাজরাজেশ্বরীতলাতে এক সন্ন্যাসী এসে বলেন তিনি স্বপ্নে দেখেছেন দেবী ওপার থেকে ভেসে এসে এখানে উঠেছেন। এই মাঠে তাঁর পূজা করুন। সেই অনুসারে তৎকালীন ঘোষাল বংশের জমিদার কর্তা ১৭০৭ সালে এই পূজার প্রবর্তন করেন। সেই হিসাবে ডাঃ বঙ্কিম মুখোপাধ্যায়ের উদ্যোগে ও সভাপতিত্বে ১৯৫৭ সালে ২৫০ বছরের পূর্তি উৎসব মহাসমারোহের সহিত অনুষ্ঠিত হয়।

প্রতি বছর মাঘী পূর্ণিমার দিন এই পূজার শুরু। সরস্বতী পূজার দিন দেবীর কাঠামো পূজো হয়। দেবী রাজরাজেশ্বরীর তান্ত্রিক নাম 'ত্রিপুরাসুন্দরী'। দেবীর পাদপীঠে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর ও ইন্দ্রাদিদেবগণ ধ্যানরত। স্বয়ং দেবী বরযাত্রীরূপে কামেশ্বর শিবের নাভিকমল হ'তে উদ্ভূতা পদ্মাসনে বিরাজমানা-তন্ত্রোক্ত ত্রিপুরাসুন্দরী পূজাপদ্ধতি অনুসারে মায়ের পূজা নিষ্ঠার সঙ্গে সম্পন্ন হয়।

তিনদিনের পূজা হলেও আগে জাঁকজমক বলতে কিছুই ছিল না। শুধু ভক্তগণের আন্তরিকতা ও নিষ্ঠার সাহায্যে পূজা সুষ্ঠুভাবে সমাপন করা হ'ত। জনগণের সহায়তায় আজ জাঁকজমক শতগুণে বৃদ্ধি পেয়েছে। ঐ কদিন লোকসমাগম হয় প্রচুর।

উল্লেখ্য কার্যনির্বাহক সমিতি প্রতি মাসের প্রথম সোমবার সন্ধ্যায় নগেন্দ্র মেমোরিয়াল হলে নিয়মিত ধর্মসভার আয়োজন করেন। শ্রীমৎ দেবানন্দ ব্রহ্মচারী মহাশয় ঐ সভায় গীতাপাঠ ও ব্যাখ্যা করে থাকেন।

গোপীনাথ জীউ মন্দির

রামদাস মিত্র স্বপ্নাদেশ পেয়ে বৃন্দাবনে যান। অনেক চেষ্টার পর তিনি সেখানে তাঁর স্বপ্নে দেখা ৺রাধাগোবিন্দজীর মূর্তির সন্ধান পান। তিনি ১০৫৫ বঙ্গাব্দে মন্দির তৈরী করে সেই দেবমূর্তি প্রতিষ্ঠা করেন কোন্নগরের এ-এল. ব্যানার্জী ষ্ট্রীটে। তাঁর জমিতে একটি তিনতলা ও দুইটি একতলা বাসগৃহ ও পাকা রাসমঞ্চঘর ও দোলমঞ্চ ঘর নির্মাণ করেন। যুগল মূর্তি প্রতিষ্ঠার পর নাম দিয়াছিলেন ৺গোপীনাথ জীও। মন্দির প্রতিষ্ঠা করে রাস্তার দুধারে সাতটি বকুল গাছ রোপণ করে পরিবেশটিকে সুদৃশ্য করে তোলেন। নিজেকে সেবাইত নিযুক্ত করে ঐ জমি ও বাড়ী দেবোত্তর করে দিয়েছিলেন। মিত্র বংশের পরিজনবর্গ ৺গোপীনাথ জীওর সেবা করে নিজেদের ধন্য জ্ঞান করে আসছেন। তাঁর তৃতীয় নিম্নতম পুরুষ নবচৈতন্য মিত্র অল্প বয়সেই কুলদেবতার প্রতি আকৃষ্ট হন। ১৮৭৮।৭৯ সালে তিনি দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণের সাক্ষাৎ লাভ করেন। শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁকে নবাই বলে ডাকতেন। নবচৈতন্যের ভক্তি ও অনুরাগ দেখে প্রীত শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর বাড়ীতে কয়েকবার পদার্পণ করেন। তাঁর প্রথম শুভ পদার্পণ ঘটেছিল ৩রা ডিসেম্বর ১৮৮২ সাল। নবচৈতন্যের আমন্ত্রণে ১৮৮৫ সালে ৫ই জুলাই শ্রীরামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বর থেকে নৌকা করে কোন্নগরের পুরাতন বাজার ঘাটে (সিংহী ঘাট) উপস্থিত হন। সেখান থেকে তাঁকে ঘোড়ার গাড়ী করে নিয়ে যাওয়া হয়। শ্রীরামকৃষ্ণ ৺গোপীনাথ জীওর মন্দিরে গিয়ে বিগ্রহ দর্শন করেন মোহন বাঁশরী হাতে ৺গোপীনাথ। পাশে হ্লাদিনী শক্তির মূর্তিমতী প্রকাশ শ্রীরাধিকা। নবচৈতন্যের বিশেষ অনুরোধে ঠাকুর ১৮৮৫ সালে জুলাই মাসে আর একবার কোন্নগরে আসেন এবং তাঁর জন্য তৈরী নানাবিধ আহার্য ও ভাতের মণ্ড গ্রহণ করেন। সেইদিন তাঁর আহারের পরিমাপ দেখে সকলেই বিস্মিত হয়।

৩রা ডিসেম্বর ১৮৮২র স্মৃতি

আঠেরো বিরাশি ডিসেম্বরের তেসরার শুভক্ষণ
নব চেতনের গৃহে ঠাকুরের হইবে পদার্পণ।
সাত বকুলের তলায় যেথায় মনোমোহনের গৃহ,
রামকৃষ্ণের অন্তরঙ্গ, লভেছেন যাঁর স্নেহ।
কোন্নগরের দখিন পাড়ায় মিত্র কুলের বাস
গোপীনাথজীর মন্দিরে যেথা পূজা হয় বারোমাস,
মিত্রকুলের সে গৃহদেবতা মন্দির ও বিগ্রহ
দেখিতে হয়েছে ঠাকুরের সাধ, একান্ত আগ্রহ
নদী পার হয়ে এলেন ঠাকুর পূর্ণ করিতে সাধ
ইচ্ছা যখন জাগিয়াছে মনে কেন বা থাকিবে বাধ।
কোন্নগরের ভক্তজনেরা পেয়েছেন সংবাদ
দর্শন আশে সমবেত হল, লইতে আশীর্বাদ।
খোল করতালে মুখরিত হল, মন্দির প্রাঙ্গণ
ভাবেতে বিভোর আছেন ঠাকুর আকুল ভক্তগণ।
সমাধি ভঙ্গ হল কিছু পরে ভক্তের হরিবোল,
শুনিয়া ঠাকুর আঁখি মেলিলেন স্তব্ধ সে কলরোল।
উত্তরে আছে হরিসভাগৃহ শ্যামসুন্দর ধাম
ভক্তেরা যেথা সমবেত, হয় কীর্তন হরিনাম।
শুনিয়া ঠাকুরে কীর্তনে মাতি চলিলেন সেইখানে
ভক্তেরা চলে সাথে সাথ তাঁর ঠাকুর মধ্যিখানে
পবিত্র হল হরিসভাগৃহ ঠাকুরের আগমনে
স্মৃতিটুকু তার ধরিরা রাখিতে চাই এই শুভক্ষণে।
স্মৃতি সমিতির কর্মীরা সবে করেছেন আহ্বান
তাদের প্রয়াস সার্থক হোক, ঠাকুরের সম্মান।
যথাযথ ভাবে পালন করিতে মেলাও সকলে হাত,
রামকৃষ্ণের শরণ লইয়া কর তাঁরে প্রণিপাত।

কোন্নগর রাজরাজেশ্বরী মঠ ও প্রাসঙ্গিক আলোচনা

গত ১৯৮৪ সালে কোন্নগর দ্বাদশ মন্দিরের নিকটস্থ গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোডের পশ্চিমদিকে ভগৎ পরিবার কর্তৃক প্রদত্ত ভূখণ্ডে জ্যোতিষ্পীঠ ও সারদা পীঠের অধীশ্বর স্বামী শ্রীস্বরূপানন্দ সরস্বতীজী মহারাজ কর্তৃক রাজ-রাজেশ্বরী মঠের প্রতিষ্ঠা হয়েছে।

অদ্বৈতবাদের শ্রেষ্ঠতম প্রবক্তা আদি শঙ্করাচার্য ভারতের চারপ্রান্তে যে চারটি মঠের প্রতিষ্ঠা করেন তা যথাক্রমে উত্তরে বদরিকাশ্রমে জ্যোতির্মঠ, দক্ষিণে কন্যাকুমারিকায় শৃঙ্গেরী মঠ, পূর্বে পুরীধামে গোবর্ধন মঠ এবং পশ্চিমে দ্বারকায় সারদা মঠ নামে পরিচিত।

শঙ্করাচার্য প্রথম জীবনেই গোবিন্দ পাদাচার্যের নিকট সন্ন্যাসের দীক্ষা গ্রহণ করেন। গোবিন্দ পাদাচার্যও আবার গৌড় পাদাচার্যের দীক্ষিত শিষ্য ছিলেন। সুতরাং গুরু পরম্পরায় গৌড় পাদাচার্য ছিলেন শঙ্করাচার্যের পরম গুরু। গৌড় পাদাচার্যের নামের সঙ্গে গৌড় শব্দটি যুক্ত থাকায় ঐতিহাসিকগণের ধারণা তিনি গৌড় দেশের অধিবাসী ছিলেন। এই অনুমান সত্য হলে আদি শঙ্করাচার্যের সঙ্গে বাংলা দেশের এক যোগসূত্র আবিষ্কার অসঙ্গত নয়। এবং আদি শঙ্করাচার্যের পরমগুরুর দেশের অধিবাসী হিসাবে আমরা কিছুটা শ্লাঘা বোধ করতে পারি।

এখানে স্বাভাবিকভাবেই এই প্রশ্ন উঠতে পারে যে বৌদ্ধ ও মীমাংসা মতবাদকে নস্যাৎ করে যিনি অদ্বৈত মতবাদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করেন—তাঁর অনুগামীরা কিভাবে রাজরাজেশ্বরী মাতার পূজাকে অনুমোদন করেন?

উত্তরে বলা যেতে পারে যে, শঙ্করাচার্য সাধনার ক্ষেত্রে অদ্বৈতবাদের উপযোগিতা স্বীকার করলেও ব্যবহারিক জীবনে সগুণ ঈশ্বরের প্রয়োজনীয়-তাকে যে স্বীকার করে নিয়েছিলেন সে বিষয়েও সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। শঙ্করাচার্য রচিত 'আনন্দ লহরী' ও 'সৌন্দর্য' নামধেয় দুটি গ্রন্থ এবং ভক্তিমূলক বহু দেবদেবীর স্তোত্র এ বিষয়ে প্রামাণ্য সাক্ষ্য বহন করে।

কোন্নগরে রাজরাজেশ্বরী মূর্তি পূজার ঐতিহ্য প্রায় তিনশত বৎসরের মত প্রাচীন। দশ মহাবিদ্যা রূপধারিণী দেবী দুর্গার তৃতীয় বিদ্যা ষোড়শী রূপ ধারিণী ত্রিপুরসুন্দরী।

এখানে প্রশ্ন উঠতে পারে যে অদ্বৈতবাদী সম্প্রদায়ের মানুষেরা কিভাবে

মূর্তি পূজার উপাসনাকে সমর্থন জানায়? এই প্রচেষ্টার মধ্যে কি স্ববিরোধিতার নিদর্শন পাওয়া যায় না?

এই প্রশ্নের উত্তর মেলে দক্ষিণেশ্বরের কালী মন্দিরের পূজারী শ্রীরামকৃষ্ণের উক্তি ও ব্যবহারের মধ্যে। তিনিও মৃন্ময়ী কালী মূর্তির পূজা করতেন।

বিবেকানন্দকে তিনি বলেছিলেন, "ওরে নরেন তুই মাকে মৃন্ময়ী বলিস কিরে? মা তো সাক্ষাৎ চিন্ময়ী মূর্তিধারিণী ব্রহ্মময়ী জগন্মাতা। দিব্যদৃষ্টি দিয়ে দেখলে বুঝতে পারবি মা মৃন্ময়ী নয় চিন্ময়ী। আমি তো দেখছি শুধু মা কেন এই কোশাকুশি, ঘট, আসন, চৌকাঠ, পাথরের মেজেও চিন্ময়।" জড়পদার্থে চিন্ময়ত্বের ধারণা সাধকের পক্ষে সম্ভব হলেও সাধারণ মানুষের পক্ষে তা সম্ভব নয়। কিন্তু "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" এ তো উপনিষদের বাণী। এ কখনও মিথ্যা হতে পারে না। সেই চিন্ময় ব্রহ্মাই মায়া উপাধি অবলম্বন করে বিশ্বজগৎ রূপে প্রতিভাত হয়েছেন।

নির্গুণ নিরাকার নিরূপাধিক ব্রহ্মত সাধারণ মানুষের বুদ্ধিগম্য নয়। ভক্তগণ যাতে ঈশ্বর সান্নিধ্য লাভে সক্ষম হয় তাই "ভক্তনাম আরাধনার্থং দেবানাম রূপকল্পনা।"

উত্তর জীবনে আচার্য শঙ্করের এই উপলব্ধি হয়েছিল বলেই তিনি ভারতের চার প্রান্তে চারটি মঠ স্থাপন করে চার দেব মূর্তির প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। 'আনন্দ লহরী' ও 'সৌন্দর্য লহরী' নামক দুটি গ্রন্থ রচনা এবং বহু স্তোত্র রচনা করে সাধারণ মানুষকে সগুণ দেব প্রতিমার পূজার প্রতি আকৃষ্ট করেছিলেন। সুতরাং স্বরূপানন্দজী মহারাজ যে এখানে রাজ-রাজেশ্বরী মঠ প্রতিষ্ঠা করে সাধারণ মানুষের দেবারাধনার পথ প্রশস্ত করে দিয়েছেন তা কোন ক্রমেই অসঙ্গত নয়। যাঁরা সংসার ত্যাগী সন্ন্যাসী তাঁরা নির্জনে নিরাকার ব্রহ্মের সহিত একাত্মতা অনুভব করে নির্বিকল্প সমাধি লাভ করুন আর যাঁরা গৃহী ভক্ত তাঁরা জগন্মাতা ত্রিপুরসুন্দরীর পূজার্চনা করে ঐহিক শক্তি লাভ করুন—এ বিষয়ে তো মতদ্বৈধের কোন অবকাশ থাকতে পারে না।

শকুন্তলা শ্রীশ্রী৺রক্ষাকালীমাতা বারোয়ারী

জাগ্রত দেবী শ্রীশ্রী৺রক্ষাকালীমাতার মহাপূজাকে কেন্দ্র করেই এই বারোয়ারীর প্রতিষ্ঠা। ১২৯৭ বঙ্গাব্দে বৈশাখ মাসে কৃষ্ণপক্ষে শনিবার দিন বর্তমান স্থানে মায়ের প্রথম পূজা অনুষ্ঠিত হয়। জনশ্রুতি মাতৃ নির্দেশেই উক্ত স্থান নির্বাচিত হয়। স্থানীয় বাসিন্দারা মিলিত হয়ে এই মাতৃ পূজায় ব্রতী হন এবং বারোয়ারী প্রতিষ্ঠা করেন। অদ্যাবধি উক্ত বারোয়ারীই পূজা অনুষ্ঠান পরিচালনা করে আসছেন। 'শকুন্তলা শ্রীশ্রী৺রক্ষাকালীমাতা বারোয়ারী' নামে প্রতিষ্ঠান ১৩৯৫ বঙ্গাব্দে রেজিস্ট্রিকৃত হয়। সংবিধান অনুযায়ী প্রতিষ্ঠানের কাজকর্ম পরিচালিত হয়। এর ট্রাস্টি বোর্ডও আছে।

একশ' বছর আগে মন্দির সংলগ্ন এলাকাতে লোকবসতি বিশেষ ছিল না। অশ্বত্থ, বট, পাকুড় প্রভৃতি বড় বড় গাছ ছিল। উত্তরদিকে বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে বাগান, পশ্চিমদিকে ভাগাড়, দক্ষিণে পায়ে-চলা পথ। এইসব গাছে বাসা বেঁধে থাকত শকুন পাখী—তা থেকেই হল 'শকুন্তলা'।

প্রথমদিকে উদ্যোক্তাগণ বাঁশ, নারকেল পাতা ইত্যাদি দিয়ে নিজেরাই তৈরী করতেন অস্থায়ী পূজামণ্ডপ। বরাভয়দাত্রী মায়ের যেখানে অধিষ্ঠান সেখানে ভক্তদেরও সমাগম। কয়েক বছরের মধ্যেই মায়ের অশেষ কৃপাধন্য ভক্তদের সমাগমে অঞ্চল ভরে উঠল। ১৩৩৫ বঙ্গাব্দে মাতৃমন্দির প্রথম নির্মিত হয়। পরে নাটমন্দির এবং চূড়াসহ বর্তমান মন্দিরটি পুনঃনির্মিত হয়।

বৈশাখ মাসে মায়ের মহাপূজার দিন দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে লক্ষাধিক ভক্তের সমাগম হয়। ভক্তপ্রাণ নরনারী মায়ের বেদীতে পবিত্র গঙ্গাজল, ফুল ইত্যাদি অর্পণ করেন। চিনি, সন্দেশ, ডাব, ফল, বস্ত্র, অলংকার এবং নগদ অর্থেও ভক্তরা মাকে পূজা দেন। মানসিক ছাগ বলিদানও হয়। সন্ধ্যায় মৃৎশিল্পীর নিকট থেকে শোভাযাত্রা সহকারে সালংকারা প্রতিমাকে মন্দিরে আনা হয়। এরপর সারারাত ধরে অনুষ্ঠিত হয় মাতৃপূজা। সূর্য উঠার পূর্বেই নিরঞ্জন। এই কয়েকদিন মহামন্দির সংলগ্ন এলাকা জনসমুদ্রে পরিণত হয়। কোন্নগর মহাতীর্থের রূপ নেয়। প্রতি শনি ও মঙ্গলবার (বিশেষ কয়েকটি দিন ব্যতীত) সমস্ত বৎসর ঘট স্থাপনা করে দিনের বেলায় মায়ের পূজা এবং সন্ধ্যায় সন্ধ্যারতি হয়। এছাড়া হরিনাম মহা উৎসব, শ্রীশ্রী৺দুর্গা, লক্ষ্মী, শ্যামাকালী, সরস্বতী দেবীর পূজাও বারোয়ারী কর্তৃক অনুষ্ঠিত হয়।

মূলতঃ ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান হলেও এই প্রতিষ্ঠানের সমাজকল্যাণমূলক কাজে

বিশেষ অবদান আছে। পূজার উদ্বৃত্ত অর্থ, ভক্তদের দেয় প্রণামী, এককালীন দান ইত্যাদি থেকে এই সমস্ত জনকল্যাণমূলক কাজগুলি করা হয়। নিম্নলিখিত বিভাগগুলি বারোয়ারী কর্তৃক পরিচালিত হয়। (১) প্রাথমিক বিদ্যালয় (২) হোমিওপ্যাথিক বিভাগ (৩) চক্ষু চিকিৎসা বিভাগ (৪) হৃদ্-রোগ চিকিৎসা বিভাগ (৫) এ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসা বিভাগ (৬) দন্ত চিকিৎসা বিভাগ (৭) আইন সহায়ক বিভাগ। এই সমস্ত বিভাগগুলিতে জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের লোক চিকিৎসার ও অন্যান্য বিভাগের সুযোগ গ্রহণ করেন।

দরিদ্র মানুষদের আর্থিক সাহায্য দান, পূজার সময় দুঃস্থ বালক-বালিকা এবং বড়দের জামা-কাপড় বিতরণও এদের অন্যতম কর্মসূচী।

নিয়ম শৃঙ্খলা রক্ষা, উন্নতমানের প্রসাদ বিতরণ, ভক্তদের সুযোগ-সুবিধার প্রতি সতর্ক দৃষ্টি প্রভৃতি বিষয়ে বারোয়ারী আজও তার সুনাম রক্ষা করে চলেছে, সেই সঙ্গে জনকল্যাণ বিভাগগুলি প্রতিষ্ঠানের কৃতিত্ব বহন করে।

মাতৃদর্শনে ভক্তদের অধিকতর সুযোগ দেওয়া, মন্দিরের প্রবেশ পথে অত্যধিক চাপ নিয়ন্ত্রণের বিকল্প ব্যবস্থা, মন্দিরের সম্মুখস্থ রাস্তায় যাত্রী নিয়ন্ত্রণের সুব্যবস্থা, পূজা দেওয়ার সুব্যবস্থা প্রভৃতি বিষয়ে গুরুত্ব দিয়ে মন্দির এবং নাট মন্দিরের সংস্কার, অলংকরণ, দুর্গামণ্ডপ নির্মাণ, মন্দিরের পূর্ব, উত্তরদিকে এবং সমগ্র অঞ্চলটি এক সুন্দর পরিবেশ গড়ে তোলার জন্য একটি পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। এছাড়া বারোয়ারী প্রস্তাবিত সেবাভবন নির্মাণ, চিকিৎসার নতুন বিভাগ খোলা, ইনডোর চক্ষু চিকিৎসা বিভাগ প্রবর্তন প্রভৃতিও এই কর্মসূচীর অঙ্গ। আনুমানিক ১৬ লক্ষ টাকা এই কাজে ব্যয় হবে। এর জন্য একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। সভ্যগণ আশা করছেন পরম করুণাময়ী মায়ের আশীর্বাদে এবং জনসাধারণের সহযোগিতায় নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যেই এই কাজ সমাধান করা যাবে।

সেবাও যখন পূজা—…আজ থেকে ১০১ বছর আগে বৈশাখ মাসে শুরু করেছিলেন শ্রীশ্রী৺রক্ষাকালীমাতার পূজা—সে পূজা আজও অব্যাহত… কিন্তু এক রাতের পূজাকে বারোয়ারী কর্তৃপক্ষ এখন প্রতিদিনের পূজায় পরিণত করেছেন। অশিক্ষার অন্ধকার দূর করা থেকে অগাধ ব্যাধির চিকিৎসার সঙ্গে সাধারণ মানুষকে শোষণের হাত থেকে রক্ষা করার জন্যও তৎপর হয়েছেন তাঁরা। তাই প্রতি বছর সূচিত হচ্ছে এক একটি নতুন কেন্দ্রের। তারই মধ্য দিয়ে চলেছে নিত্যদিনের পূজা—সে পূজার মন্ত্র শুধু সেবা—পীড়িত, আর্ত, শোষিত মানুষের সেবা!

যুগান্তর—১৬ই মে, ১৯৯০-এ প্রকাশিত।

ইহা ছাড়াও কোন্নগরে বহু ধর্মস্থান ও দেবদেউলের সংক্ষিপ্ত বিবরণ

১। **গোবিন্দের শিবমন্দির** (এ. এল. ব্যানার্জী ষ্ট্রীট)

বর্তমান সেবাইত শ্রীশিবনারায়ণ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের পূর্বপুরুষ অতিবৃদ্ধ প্রপিতামহ ৺গোপাল নারায়ণ চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক প্রায় দেড়শত বৎসর পূর্বে প্রতিষ্ঠিত।

বিগ্রহ—কৃষ্ণপ্রস্তর নির্মিত শিবলিঙ্গ। নিত্যপূজার ব্যবস্থা আছে। শিবরাত্রি উপলক্ষে বিশেষ পূজা হয়—স্থানীয় জনসাধারণও পূজা দিয়া থাকেন। বৈশাখ মাসে অথবা মানত থাকিলে পাড়ার লোকেরা পূজা দেন। ইষ্টক-নির্মিত চারিচালা মন্দিরের উপরে চূড়ায় ত্রিশূল।

২। **পঞ্চানন মন্দির** (বকুলতলা লেন)

বর্তমান সেবাইত শ্রীপ্রসাদ দাস চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রপিতামহ ৺গোকুল চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত প্রায় ১৩০ বৎসর পূর্বে। ছোট চারিচালার মন্দিরের উচ্চতা ৩½', প্রস্থ ২'। বিগ্রহ নাই—ঘটে পূজা হয়। মন্দিরটি এক বিরাট বকুলবৃক্ষের নিম্নে উচ্চ বেদীর উপর স্থাপিত। ৺চট্টোপাধ্যায় স্বপ্নাদেশ পাইয়া একটি ক্ষুদ্র বকুলগাছের তলায় মন্দিরটি নির্মাণ করেন। বৃক্ষটির কাণ্ড সম্পূর্ণ ফাঁপা—গাছে সারা বছর ফুল ফোটে এবং ফলের সংখ্যা নগণ্য। নিত্যপূজার ব্যবস্থা আছে—শিবরাত্রিতে বিশেষ পূজার ব্যবস্থা করা হয়। পাড়ার লোকের মানত থাকিলে খোরা উপহার দিয়া পূজা দেন। শিশুদের রোগ বিশেষতঃ Ricket, Tetanus ও Polio রোগের আরোগ্যের ব্যাপারে বাবা পঞ্চাননের বিশেষ ক্ষমতা সুবিদিত। বন্ধ্যা ও মৃতবৎসা রমণীগণ অথবা যেসব স্ত্রীলোকের অকালে গর্ভ নষ্ট হয় অথবা জন্মের অল্পকালের মধ্যে শিশুর মৃত্যু ঘটে, তাঁহারা সুস্থ সন্তান কামনায় অথবা সন্তানের আরোগ্য কামনায় বিশেষ পূজা মানত করেন এবং মন্ত্রপূত কবচ ধারণ করেন। মানতের পূজা সাধারণতঃ শনি মঙ্গলবারে হইয়া থাকে।

৩। **কৈলাসেশ্বর শিবমন্দির**—শ্রীঅরবিন্দ রোড ও ঋষি বঙ্কিম ষ্ট্রীটের সংযোগস্থলের উত্তরে উচ্চভিটায় এক চতুষ্কোণ মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত।

বিগ্রহ—কষ্টিপাথরের শিবলিঙ্গ। বিগ্রহের নাম—কৈলাসেশ্বর। বর্তমান সেবাইত শ্রীআদর কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

স্থাপনা—২০শে মাঘ, ১৩১৮। প্রতিষ্ঠাতা—শ্রীমতী রাজরাজেশ্বরী

দেবী। পুরোহিত কর্তৃক নিত্যপূজা ও অন্যান্য অনুষ্ঠানাদি যথারীতি সম্পন্ন হইয়া থাকে। বর্তমান সেবাইত পূজার ব্যয়ভার নির্বাহ করেন।

৪। কালীমন্দির ও তৎসহ দুই পার্শ্বে দুইটি শিবমন্দির

অবস্থান—এস. সি. দেব ষ্ট্রীট। স্থাপনা—১৭১২ শকাব্দ

প্রতিষ্ঠাতা—৺কৃষ্ণমোহন দাস ঘোষ ও শ্রীমতী রাসমণি দাসী

সেবাইত—প্রসন্ন পালিত, প্রকাশ পালিত ও প্রভাত পালিত। ২০বি নলিন সরকার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

মন্দির তিনটি উচ্চ পাটাতনের উপর নির্মিত এবং ছাদ প্রাচীন বাংলার চালা পদ্ধতির অনুকরণে। উপরে চতুষ্কোণ, চূড়ায় ত্রিশূল প্রোথিত। মাঝখানের কালীমন্দিরটি আয়তনে বড় এবং উচ্চতায় দুই পার্শ্বের শিবমন্দির অপেক্ষা ৪/৫ ফুট বেশী। দক্ষিণদিকে মন্দিরের প্রবেশদ্বার।

বিগ্রহ (১) কালীমূর্তি—দক্ষিণাকালী—শায়িত শিবমূর্তির উপর দণ্ডায়মানা দেবীমূর্তি। চারিহস্তের মধ্যে উপরের দুই হস্তে যথাক্রমে খড়্গ ও অসুরমুণ্ড। নিম্নের দুই হস্তে বর ও অভয় মুদ্রা। রক্তবর্ণ জিহ্বা মুখ হইতে বহির্গত। গলে মুণ্ডমালা, কটিদেশে মালাকার কর্তৃক হস্তের মেখলা। অতি সুসমঞ্জস চিক্কণমূর্তি—ভাস্করের শিল্পনৈপুণ্যের পরিচায়ক। মসীকৃষ্ণ কষ্টিপাথর মূর্তিটির উপাদান।

(২) দুই পার্শ্বের শিবমূর্তি দুইটি কষ্টিপাথরে নির্মিত। উচ্চতা ৩½″ হইতে ৪″ (মূর্তি দুইটির স্থানে স্থানে পাথরে ক্ষতচিহ্ন বর্তমান)।

পুরোহিত কর্তৃক নিত্যপূজার ব্যবস্থা আছে। কার্তিকী অমাবস্যায় বিশেষ পূজা হয়। পূজার ব্যয়ভার সেবাইতগণ বহন করেন।

৫। জয়কালী মন্দির (দক্ষিণাকালী)—রায়পাড়া

স্থাপনা—১৭১১ অথবা ১৭১৬ শকাব্দ

প্রতিষ্ঠাতা—হরগৌরী মিত্র (রাণী ভবানীর নায়েব)।

৬। পঞ্চুদত্ত ঘাট ও গলির শিবমন্দির

স্থাপনা—১৭৭৯ শকাব্দ

প্রতিষ্ঠাতা—রায়মিত্র বংশ বর্তমানে পরিত্যক্ত।

৭। কোন্নগর মসজিদ—মুখার্জীবাগান লেন

স্থাপনা—১৯৪৪-৪৫ খৃষ্টাব্দ

পুনঃ সংস্কার—১৯৫৫

প্রতিষ্ঠাতা—স্থানীয় পশ্চিমী মুসলমান সমাজ।

৮। নতুন শিবমন্দির—নৃসিংহদাস বসু লেন

স্থাপনা—১৯৪৮-৪৯ খৃষ্টাব্দ

প্রতিষ্ঠাতা—স্থানীয় পশ্চিমী হিন্দুস্থানী সমাজ।

৯। ধর্মডাঙা শিবমন্দির—রাইল্যান্ড রোড ও ধর্মডাঙা লেনের সংযোগস্থল।

স্থাপনা—১৯৬৫ খৃষ্টাব্দ

জটাধর দালাল সরকার কোম্পানীর আনুকূল্যে ও অর্থসাহায্যে পরিচালিত।

১০। ধর্মপূজা ও মনসাতলা—

উপরিউক্ত শিবমন্দির থেকে প্রায় ২৫০ গজ পূর্বে যেখানে ধর্মডাঙা লেন উত্তরদিকে বাঁক নিয়েছে, সেখানে এক উঁচু ঢিবির উপর বর্তমানে এক মনসা গাছ আছে। ইতিপূর্বে ধর্মপূজার ব্যবস্থা ছিল, জ্যৈষ্ঠ মাসে দশহরার দিন। শেষ সেবাইত হেম বাগদী। ১৯৩৫-৩৬ খৃষ্টাব্দে কোন মূর্তি ছিল না, পাথরের নুড়ি ছিল।

১১। মাতৃআশ্রম ও ধনকালী মন্দির—জি. টি. রোড

স্থাপনা ১৩৩২-৩৩

প্রতিষ্ঠাতা—ভীমানন্দা ব্রহ্মচারিণী সহচরী শ্যামানন্দা।

বর্তমান তত্ত্বাবধায়িকা—শিবানন্দা সহকারী রাজবালা হরিবালা

ব্রাহ্মণকন্যা বালবিধবা পিতৃপরিবার কর্তৃক নির্যাতিতা ও সম্পত্তিবঞ্চিতারা এখানে আশ্রয় নিত।

১২। শীতলা মন্দির—বিশালাক্ষী সড়ক

স্থাপনা—প্রায় ১০০ বছর পূর্বে। ছোট আকারের শিববিগ্রহ, শীতলার ঘট ও মনসা গাছ।

সেবায়েত—হারাধন বন্দ্যোপাধ্যায়।

১৩। বিশ্বরূপা শীতলা মন্দির—জাষ্টিস মহেন্দ্র বসু ষ্ট্রীট

স্থাপনা—১৩৭৩

শীতলা ও মনসার ঘটের নারিকেলের উপর ত্রিনয়ণা সিঁদুর লিপ্তা শীতলা ও মনসা পঞ্চচূড় রৌপ্যনির্মিত সর্পের উপর যুগল রাধাকৃষ্ণের মূর্তি। শীতলার রৌপ্যমূর্তিও আছে। বর্তমান সেবায়েত—কালীমোহন চট্টোপাধ্যায় (বয়স ৭৫-৮০ বৎসর)। তাঁর স্ত্রী রামঠাকুরের শিষ্যা সাধিকা গিরিবালা দেবী ৮ বৎসর পূর্বে দেহত্যাগ করেন। প্রমথনাথ রায়ের স্মৃতি রক্ষার্থে হারাধন রায় কর্তৃক নির্মিত।

১৪। কালীবুড়ী আশ্রম—জাষ্টিস মহেন্দ্র বসু ষ্ট্রীট

দক্ষিণা কালীমূর্তি—মৃত্তিকা নির্মিত। বৎসরান্তে কার্তিকী অমবস্যায় দেহান্তর।

সেবায়েত—নিতাই দাস, আদিবাস বাঁকুড়া জেলা। বয়স ৪৫। কালীবুড়ীর বয়স ৮০। পূর্বনাম খোদনবালা দাসী। ইতিপূর্বে স্বামী নিরুদ্দেশ।

১৯৪২ সালে কোতরং থেকে কোন্নগরে আগমন ও কালীমূর্তি স্থাপন। রায়পাড়ার রবীন মিত্র সাহায্য করেন। প্রায় ১০ বছর আগে পঞ্চবটী প্রতিষ্ঠা —বট, অশ্বত্থ, গাব, আমলকী, বকুল। কালীবুড়ীর গণনায় কৃতিত্বের প্রচার— মায়ের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি। কেষ্ট পাল কর্তৃক স্বতঃপ্রবৃত্তভাবে কালীপ্রতিমা দানের প্রতিশ্রুতি। পাকামন্দির নির্মাণ প্রচেষ্টা—স্বপ্নাদেশের ফলে নিবৃত্তি।

১৫। **প্রাচীনতম রক্ষাকালী পূজা**—বিশালাক্ষী সড়ক

স্থাপনা—আনুমানিক ১৮৫ বৎসর পূর্বে

প্রধান উদ্যোক্তা—৺যদুনাথ মুখোপাধ্যায়।

চৈত্রমাসে কৃষ্ণপক্ষে শনিবার পূজা হয়। বর্তমানে এই জমিতে সার্বজনীন দুর্গোৎসব হয়।

১৬। **মনসাতলা** (ক্লাইপার রোড) **রক্ষাকালী পূজা**

স্থাপনা—১২৬০ সাল। এই অঞ্চলের আদিপূজা। বৈশাখমাসে কৃষ্ণপক্ষের শনিবারে পূজা হয়।

১৭। **শকুনতলা রক্ষাকালীমাতা**

স্থাপনা—১২৯৭ বঙ্গাব্দ

প্রতিষ্ঠাতা—৺দেবেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী প্রমুখ দশজন। ডালমিয়া জৈন কর্তৃক নাটমন্দির নির্মাণ—১৯৪৫ খৃষ্টাব্দ।

১৮। **বুড়ো শিবমন্দির**—এস. সি. চ্যাটার্জী ষ্ট্রীট

স্থাপনা—আনুমানিক ৩৫০ বৎসর পূর্বে। পূর্বে অশ্বত্থ গাছতলায় চৌবাচ্চার মধ্যে লিঙ্গটি অবস্থিত ছিল। বেলেপাথরে তৈরী। গৌরীপীঠ নাই। আচ্ছাদনও ছিল না। পরে ছোট চালা তোলা হয়। আরও পরে পাকামন্দির হয়। ৫০ বছর পূর্বে মনু ময়রার আর্থিক সাহায্যে।

পুনঃ সংস্কার ও বর্তমান গৃহ ২৫ বছর পূর্বে ডাঃ চণ্ডীচরণ ঘোষালের স্ত্রীর আনুকূল্যে। শিবরাত্রি ও নীলষষ্ঠী উপলক্ষে বিশেষ পূজা হয়।

১৯। **বুড়া শিবমন্দির**—ষষ্ঠীতলা (চড়কতলা) শ্রীঅরবিন্দ রোড।

২০। **ওঙ্কার মঠ**—বিন্দুবাসিনী কালীমন্দির ও দীননাথ শিবমন্দির।

প্রতিষ্ঠাতা—স্বামী নির্মলানন্দ

মঠ—১৩৪৫ বঙ্গাব্দ

মন্দির—১৩৫৮, ২৫শে মাঘ শুক্লাত্রয়োদশী

সেবায়েত—অক্ষয়কুমার ভট্টাচার্য কাব্যতীর্থ বেদান্তশাস্ত্রী

পরিচালনা—একটি কমিটির হাতে।

২১। **পূর্ণ বৈরাগী আশ্রম**—ক্লাইপার রোড

প্রতিষ্ঠা—১৩২০। পাকামন্দির—১৩৩০

শনিমূর্তি প্রতিষ্ঠা—কয়েক বছর আগে।

২২। **অন্নপূর্ণা মন্দির**—বাজারঘাট লেন

স্থাপনা—১৩০৫-০৬। প্রতিষ্ঠাতা—মহেশচন্দ্র দে।

২৩। **মন্দিরবাটী শিবমন্দির**

(১) বড় শিবমূর্তি—প্রতিষ্ঠাত্রী যাদুমণি দেবী—১১৭২

(২) রামজীবনেশ্বর } প্রতিষ্ঠাতা রামজীবন দে—১২৫৭
(৩) আদর বাদলেশ্বর

(৪) উত্তর পূর্বদিকের মন্দির—প্রতিষ্ঠাত্রী নৃত্যমণি দাসী—১৩০৩

মন্দিরবাটীর আদিপুরুষ রামানন্দ মিত্র।

২৪। **শিবমন্দির**—১২০ জি. টি. রোড

প্রতিষ্ঠাতা—৺সুরেন্দ্রনাথ রায়মিত্র—১২৭৬ ২৯শে চৈত্র কাশী হইতে আনীত। নাম—সাধনেশ্বর কামনেশ্বর। বর্তমান সেবায়েত—দেবরঞ্জন রায় মিত্র প্রমুখ। শিবচতুর্দশী, রাসলীলার গান, ভজন গান প্রভৃতি। নিত্যপূজো—পূজারী কর্তৃক। পারিবারিক সম্পত্তি।

২৫। **শিবমন্দির**—ইউ. এন. চ্যাটার্জী লেন

প্রতিষ্ঠা—১৭০ বৎসর পূর্বে। শেওড়াফুলী মহারাজার কাছ থেকে পত্তনী লইয়া স্থাপিত।

সংস্কার—১৯১৬-১৭ জ্ঞানেন্দ্র ও পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক

সেবায়েত—অরুণ চট্টোপাধ্যায় ও মতিলাল চট্টোপাধ্যায়। নিত্যপূজার ব্যবস্থা—ব্যয়ভার সেবায়েতগণের।

২৬। **শিবমন্দির**—এস. সি. চ্যাটার্জী ষ্ট্রীট

স্থাপনা—বদন চাটুজ্জে। আন্দাজ—১৬০ বৎসর

বর্তমান সেবায়েত—পঞ্চানন চট্টোপাধ্যায়।

২৭। **শিবমন্দির**—এন. সি. চ্যাটার্জী লেন

প্রতিষ্ঠাতা—খুল্লনা দেবী, রায়মোহন মুখার্জী। স্থাপনা—১২৬১।

২৮। **মাধবানন্দ আশ্রম**—জি. টি. রোড

মাধবানন্দের পূর্বনাম ও পরিচয় অজ্ঞাত।

জীবিত ব্রহ্মচারীদের মধ্যে জ্যেষ্ঠতম বালানন্দ, লোক ব্রহ্মচারী প্রভৃতির সমসাময়িক।

উজ্জয়িনীতে গুরু আশ্রম। শিষ্য সংখ্যক ২০০০—৩০০০

বিশিষ্ট শিষ্য—৺ডাঃ শচীন সর্বাধিকারী। ডাঃ প্রণব চ্যাটার্জী, রিষড়া

আশ্রম পরিচালনা—ভক্ত ও শিষ্যগণের দানে।

২৯। **কালীকীর্তন সমিতি**—ক্লাইপার রোড

স্থাপনা—১৯৩৩

প্রত্যহ পঞ্চানন মজুমদারের বাড়ীতে কীর্তন হয়। বৈশাখে নগরকীর্তন,

পূজার অষ্টমীর দিনে চণ্ডীবাড়ীতে ও কালীপূজার দিন কালীদালানে কীর্তন হয়। বৈশাখ মাসে সংক্রান্তির পর একদিন ভক্তগণ মিলিত হয়ে উৎসব করেন। ভক্তসংখ্যা প্রায় ৫০ জন।

৩০। **রাধাগোবিন্দ মন্দির**—জি. টি. রোড

প্রতিষ্ঠাতা—৺শিবচন্দ্র সাধু খাঁ। স্থাপনা—১৩৩৪ সাল। কষ্টিপাথরের শ্রীকৃষ্ণ ও অষ্টধাতুর রাধিকামূর্তি। পূজারীর বৃত্তি—মাসিক ১০০ টাকা।

৩১। **শিবমন্দির**—শম্ভূচন্দ্র ঘাট (শম্ভুনাথ, ত্রিলোচন)

স্থাপনা—১২৭১। প্রতিষ্ঠাতা—৺শম্ভূচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

৩২। **শীতলা মন্দির**—রামচন্দ্র ঘোষাল লেন

৺গোপালচন্দ্র চক্রবর্তী ১৩০৭ সালে পেয়ারাবাগানে ৺হেরম্ব চক্রবর্তীর বাড়ী আসেন এবং ঐখানে শীতলা মূর্তি প্রতিষ্ঠা করেন। ১৩১০ সালে চোরের ভয়ে ঐ স্থান ত্যাগ করে দমদম সিঁথির ৩নং হরেকৃষ্ট শেঠ লেনে উঠে যান। ঐখানে তাঁর বংশধরেরা এখনও আছেন। ১৩১০ সালে রামচন্দ্র ঘোষাল ৺রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় থেকে জমি ক্রয় করে ৺তরণীকান্ত সামুই-এর সহযোগিতায় বর্তমান ৺শীতলা মন্দির স্থাপন করেন মাঘী পূর্ণিমার দিন। তাঁর দেহান্তে তাঁর শ্যালক ৺অন্নদা চক্রবর্তী পূজার ভার নেন। বর্তমান সেবাইত—করুণাসিন্ধু চক্রবর্তী।

মন্দিরের নিজস্ব কোন সম্পত্তি বা আয়ের ব্যবস্থা নেই। নিত্যপূজা—সেবাইত কর্তৃক হয়ে থাকে।

৩৩। **ধ্যানানন্দ আশ্রম**—ডাঃ বঙ্কিম মুখার্জী ষ্ট্রীট

স্থাপনা—১০৫৪। সেবাইত—গুরুমা (বিমলা চট্টোপাধ্যায়)

উৎসব—স্বামিজীর জন্মতিথি, গুরুপূর্ণিমা, জন্মাষ্টমী।

৩৪। **ষষ্ঠীতলা**—হাতীরকুল

জি. টি. রোড থেকে হাতীরকুলে প্রবেশ পথে রাস্তার ডানদিকে অবস্থিত প্রস্তরশিলা—বেদীর উপর স্থাপিত।

স্থাপনা—৭০ বৎসর পূর্বে। প্রতিষ্ঠাতা—৺প্রসন্নকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় নৈমিত্তিক পূজা।

৩৫। **বাবাঠাকুর ও মনসাতলা**—হাতীরকুল

স্থাপনা—১০ বৎসর পূর্বে। প্রতিষ্ঠাতা—৺জয়গোপাল চট্টোপাধ্যায় (৺দীননাথ গাঙ্গুলীর পিসেমশাই)

মূর্তি—প্রস্তরখণ্ড। পূজা—নৈমিত্তিক। পার্শ্বে একটি মনসাগাছ আছে। উহাতে মনসাপূজা হয়।

৩৬। **মনসাতলা**—এ. কে. ব্যানার্জী লেন (জেলেপাড়া)

একটি বিরাট মনসাগাছ

স্থাপনা—৭৫ বছর আগে। প্রতিষ্ঠাতা—৺শ্রীধর পাত্র ও প্রতিবেশীগণ
বিশেষ পূজা—ভাদ্র সংক্রান্তি। বাঁধানো সিমেণ্টের বেদী নূতন নির্মিত।

৩৭। দক্ষিণপাড়া শীতলা মন্দির

স্থাপনা—প্রায় ২৫০ বছর আগে

৺বনমালী চক্রবর্তী বসন্তরোগে আক্রান্ত হ'লে স্বপ্নাদিষ্ট হয়ে শীতলা মূর্তি প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর মৃত্যুর পর পূজার ভার গ্রহণ করেন তাঁর জামাতা গোপালচন্দ্র রায়। তাঁর দেহান্তে পূজার ভার পড়ে তাঁর জামাতা ৺উত্তানপাদ চক্রবর্তী মহাশয়ের উপর। জনসাধারণের সাহায্যে পূজার ব্যবস্থা হয়ে আসে। ৫৫ বৎসর পূর্বে মূর্তি পুনঃ সংস্কার করা হয়। স্থানীয় জনসাধারণ ও ভক্তবৃন্দের সাহায্যে পূজা করা হচ্ছে। বর্তমান সেবায়েতগণ—দেবেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, জয়দেব ও ফণীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য মহোদয়গণ।

চৈত্রমাসে শীতলাষ্টমীতে বিশেষ পূজা হয়—এ বিষয়ে জনসাধারণের নিকট বিশেষ বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হয়। পূজা উপলক্ষে সাতদিন অবধি নামগান ও কীর্তনাদি হয়ে থাকে।

৩৮। ঘোষপাড়া শিবমন্দির

৺উমেশচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের প্রপিতামহী ৺ভুবনেশ্বরী দেবী কর্তৃক প্রায় ২০০ বৎসর পূর্বে ভুবনেশ্বর শিব প্রতিষ্ঠিত হয়। কোনও দেবোত্তর সম্পত্তি না থাকলেও বংশধরগণ কর্তৃক নিত্যপূজা অর্চনাদির ব্যবস্হা হয়ে থাকে। ৺উমেশচন্দ্র শ্রীঅনিলকুমার ঘোষ দিগরগণের পিতামহ।

এই বংশের রঘুনাথ নাম শালগ্রাম শিলাও অতি প্রাচীন। সম্ভবতঃ ১৬০০ খৃষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত।

৩৯। শম্ভু চ্যাটার্জী ঘাট আনন্দ আশ্রম

স্থাপনা—১৩২৮। প্রতিষ্ঠাতা—৺সূর্যনারায়ণ সরস্বতী
বর্তমান মন্দিরে কালীমূর্তি—রাজেনকুমার কর্তৃক তৈরী
বর্তমান সেবাইত—বাসুদেব স্বরূপ ব্রহ্মচারী (বাদল)

১। কৃষ্ণ প্রস্তর মূর্তি—কোশীধাম থেকে আনা হয়েছে
২। বিগ্রহ শিব (শ্মশানেশ্বর)—নিকটবর্তী ভগ্ন শিবমন্দির থেকে সংগৃহীত
৩। বিগ্রহ রাধাকৃষ্ণ—৺বিহারীলাল ভট্টাচার্য মহাশয়ের পারিবারিক দেবতা। তাঁর পুত্র কালোবাবু কর্তৃক প্রদত্ত
৪। একাধিক শালগ্রাম শিলা।

বিশেষ উৎসব—অষ্টাদশভুজা পূজা। অন্যান্য প্রচলিত পূজাও করা হয়।

জমি—৺গজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিকট খাজনা করা। মোহান্তের পর্যায়—১। সূর্যনারায়ণ সরস্বতী ২। গঙ্গানারায়ণ কাশীপুরী ৩। কালী-

নাথ গিরি ৪। ভিক্ষু ভূতাধ্যক্ষ পশুপতিবাবা ৫। নীলমণি চট্টোপাধ্যায় ৬। বাসুদেব স্বরূপ ব্রহ্মচারী।

পরিচালনা ব্যয়—ব্যক্তিগত দান ও জনসাধারণের নিকট প্রাপ্ত প্রণামী থেকে।

৪০। **৺গোপীনাথ মন্দির**—সাতবকুলতলা

স্থাপনা—১০৫৫ সাল, ইংরাজী ১৬৪৯

প্রতিষ্ঠাতা—৺বামদাস মিত্র

সেবায়েত—নির্মলকুমার মিত্র, শৈলেন্দ্র কৃষ্ণ মিত্র, ফণীন্দ্রনাথ মিত্রদিগের।

বংশের দ্বাবিংশতিতম পুরুষ ৺নবাই চৈতন্য মিত্রের জীবদ্দশায় যুগপুরুষ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের একাধিকবার এই মন্দিরে আগমন একটা গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক ঘটনা। মিত্র মহাশয় পরমহংসদেবের শিষ্য ছিলেন।

এখানে পূর্বে প্রতিটি বৈষ্ণব উৎসব পালন করা হইত। মধ্যবর্তীকালে সম্ভবতঃ অর্থাভাবে তথা উৎসাহের অভাবে তাহা সম্ভব হয় নাই। গত বিশ বৎসর যাবৎ সেগুলির পুনরুষ্ঠান করা হইতেছে। একাধিক আংশিক সংস্কার সত্ত্বেও মন্দির জীর্ণদশা প্রাপ্ত হয়। সুতরাং আমূল সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হওয়ায় বর্তমান সেবায়েতগণের অন্যতম ৺শৈলেন্দ্রকৃষ্ণ মিত্র মহাশয় নিজ ব্যয়ে মন্দিরটি নূতন পরিকল্পনায় দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরের সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া পুনর্নির্মাণ করেন।

এই মিত্রবংশের একই চৈতন্যের জ্ঞাতিভ্রাতা ৺মনোমোহনের (রামকৃষ্ণের পরম ভক্ত) ভগিনীর সহিত রাখাল মহারাজের (ব্রহ্মানন্দ) বিবাহের ফলে এই বংশ বিশেষ মযর্দা লাভ করেছে।

৪১। **মণিপাড়া শিবমন্দির—শ্রী**অরবিন্দ রোড

স্থাপনা—প্রায় দেড়শ বছর আগে ঊর্ধ্বতন পঞ্চম পুরুষ ফকিরচন্দ্র মিত্র কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত।

বিশেষ অনুষ্ঠান—শিবরাত্রি, বৈশাখী ও দোল উৎসব।

৪২। **ভগবতী আশ্রম**—শ্রীঅরবিন্দ রোড

ভগবতী ঘটক মহাশয় প্রতি বৎসর জগদ্ধাত্রী প্রতিমা এনে পূজা করতেন। মৃন্ময়ীমূর্তি পূজার পর গঙ্গায় বিসর্জন দেওয়া হত। তাঁর দেহান্তে তাঁর ছোট ছেলে রাসবিহারীও এইভাবে পূজা করতেন।

১৩৩৬ সালের ২৩শে কার্তিক রাসবিহারী স্বপ্ন দেখেন যে মা যেন বলছেন আজ থেকে তোর গৃহে আমি স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠিত হলুম—আমার বিসর্জন দিসনি।

১৩৩৭ সালে মন্দিরের ভিত্তি স্থাপন করে ঘটে পূজা করা হয়। ১৩৩৮ সালে মৃৎশিল্পীর সাহায্যে মূর্তি নির্মাণ করে দুর্গানবমী তিথিতে পূজা করা

হয়। তদবধি প্রতি বৎসর ঐ মূর্তি পূজা হয়ে থাকে জগদ্ধাত্রী পূজার দিন। তাছাড়া নিত্যপূজা করা হয়ে থাকে। আষাঢ় মাসে বিপত্তারিণী মাতার পূজা ও উৎসব হয়।

সেবাইত—দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়

পুরোহিত—শ্রীকমলকৃষ্ণ চক্রবর্তী

বিশেষ পূজারী—শ্রীকালীকৃষ্ণ চক্রবর্তী।

৪৩। করাতিপাড়া মসজিদ

স্থাপনা—প্রায় ১৫০ বছর আগে

পরিচালনা—জনসাধারণের প্রদত্ত চাঁদায়। বিশেষ সাহায্য বিবাহাদি উপলক্ষে।

পরিচালক সমিতি—পঞ্চায়েত কর্তৃক ৭-৮ সভ্যদ্বারা গঠিত।

রোজার সময়—সন্ধ্যাকালে ১ ঘণ্টা ব্যাপী তারাবী প্রার্থনা।

উৎসব—ঈদ, বকরিদ, সবেবরাত, মহরম প্রভৃতির জন্য বিশেষ চাঁদা আদায় হয়।

মৌলবী আছেন—মাসের মধ্যে প্রতিদিন বিভিন্ন গৃহে তাঁর আহারের ব্যবস্থা। মাসিক বেতন—৩০০ টাকা।

৪৪। ডি ওয়াল্ডি সংলগ্ন মসজিদ

প্রতিষ্ঠা—আনুমানিক ১০০ বছর

প্রতিষ্ঠাতা—হাকিম আসাদুর রহমান

কারখানা হবার আগে কারখানার সীমানার মধ্যেই নমাজের জায়গা ছিল। সেখানে দিনে ২ বার নমাজ পড়া হ'ত। এটার নাম ছিল ইদগা। কারখানা হবার পর ঐ দরগা সরিয়ে আনা হয় বর্তমান স্থানে। কোম্পানীর মুসলমান শ্রমিকরা এখানে প্রার্থনা করেন। কোম্পানী মসজিদের আলো ও জল সরবরাহ করে থাকেন। মৌলবীর মাহিনা চাঁদা তুলে তার থেকে দেওয়া হয়। কাজী ফজলে ইলাহীদের দুখানা ঘর ভাড়া দিয়ে যে টাকা পাওয়া যায় তার থেকে মসজিদের অন্যান্য খরচ চলে।

৪৫। সন্তান সঙ্ঘ—রাজেন্দ্র নিবাস, এস. সি. চ্যাটার্জী স্ট্রীট।

'কালিকা বঙ্গদেশে চ' এই সূত্র ধরে এই সঙ্ঘ তাহাদের গুরু হৃষীকেশ অভেদাশ্রম নিবাসী অভেদানন্দ তীর্থ মহামান্যের নির্দেশ অনুযায়ী 'জয়মা কালী, জয়মা তারা' এই নামকীর্তন করেন। যেহেতু বাংলাদেশই শক্তি-আরাধনার কেন্দ্র। সেইহেতু বিশ্বশান্তি ও মানবকল্যাণ কামনায় একমাত্র এইভাবে অখণ্ড নামকীর্তনই আজকের দুর্নীতিগ্রস্ত ও চরম দুর্দশাপ্রাপ্ত মানব সমাজের সকলপ্রকার বিঘ্ন বিপদ হইতে পরিত্রাণ লাভের একমাত্র উপায়। মহাশক্তির সন্তান আমরা মাকে ভুলে থাকাতেই আমাদের এই দুর্গতি। তাই

সমস্ত শক্তিপীঠে কালীঘাট, দক্ষিণেশ্বর, তারাপীঠ, আদ্যাপীঠ, হালিসহরে রামপ্রসাদের ভিটায়, কমলাকান্তের তপস্যাস্থানে মায়ের অখণ্ড নামকীর্তনে তার মাহাত্ম্য প্রচার করাই আমাদের একমাত্র কর্তব্য। জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই আমরা প্রথমেই মা শব্দ উচ্চারণ করি। এই মা-ই শ্রীশ্রীপরমেশ্বরী।

১২৬৮ সালের ১৩ই জানুয়ারী শনিবার সন্ধ্যা ৫টা থেকে পরদিন রবিবার ১৪ই জানুয়ারী ৫টা পর্যন্ত অষ্টম প্রহর ধরে সন্তান সঙ্ঘ কোন্নগর বাজারের সিদ্ধেশ্বরী কালীমন্দিরে জয়মা কালী নামকীর্তন করেন। ১৯৬৮ সালে কোন্নগরেই ব্যাপকভাবে ঐ নামকীর্তন শুরু হয়। কুম্ভমেলায় এই সম্প্রদায়ের নামকীর্তন টেপরেকর্ড করে অল ইণ্ডিয়া রেডিও মারফৎ শোনানো হয়েছে।

৪৬। হরিভক্তি প্রদায়িনী সভা

সুপ্রাচীন ধর্মপ্রতিষ্ঠান—প্রাচীনত্বে হরিসভাগুলির মধ্যে তৃতীয় স্থান অধিকার করে।

প্রতিষ্ঠা—অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমভাগ (আনুমানিক)

প্রতিষ্ঠাতা—৺রামজীবন ঘোষাল।

কিছু দেবোত্তর সম্পত্তি বিগ্রহের জন্য ব্যবস্থা করেন। তাহা দ্বারা নিত্য-পূজার ব্যয় নির্বাহ করা হ'ত।

১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে রামচন্দ্র ও উমাচরণ ঘোষাল কর্তৃক হরিসংকীর্তন দল গঠন করে জনসাধারণের মধ্যে হরিনাম প্রচারের উদ্দেশে মন্দিরের সম্মুখের প্রাঙ্গণে শনি, রবি ও ছুটির দিন সমবেত হতেন। এইভাবে ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে হরিভক্তি প্রদায়িনী সভা গঠিত হয়। প্রথম থেকে বহুদিন পর্যন্ত ঘোষাল বংশের সন্তানগণ এর সম্পাদকত্ব করেন—রামচন্দ্র, উমাচরণ, অম্বিকাচরণ।

বর্তমান হরিসভাগৃহ ও মণ্ডপ জনসাধারণের নিকট থেকে সংগৃহীত অর্থে নির্মিত। পূর্বে চালাঘরে বিগহ স্থাপিত ছিল। পরে ঐ স্থলে তিনখানা পাকাঘর নির্মাণ করে বিগ্রহ, পূজার ঘর ও রান্নাঘরের ব্যবস্থা করা হয়।

উৎসবাদির মধ্যে দোল, জন্মাষ্টমী ও রাসপূর্ণিমা অনুষ্ঠিত হয়। প্রতি বৎসর গুডফ্রাইডের ছুটিতে বিশিষ্ট বক্তা এবং গায়কগায়িকা দ্বারা ধর্মালোচনা, ভাগবৎ পাঠ, ধর্মসঙ্গীত ও কীর্তনাদি অনুষ্ঠিত হয়। কখনও কখনও কৃষ্ণলীলা পালা অথবা যাত্রাগান হয়ে থাকে। বৎসরের অন্যান্য সময়ে কীর্তন, কৃষ্ণযাত্রা, কথকতা ও ভাগবত পাঠাদিও হয়ে থাকে।

৺অম্বিকা ঘোষালের সম্পাদকতার সময় রন্ধনগৃহের অধিকার নিয়ে বিবাদের ফলে ঘোষাল বংশের সহিত হরিসভার সম্পর্ক বর্তমানে বিচ্ছিন্ন। মাত্র দুর্গাপূজার কয়েকদিন বিগ্রহ ঘোষাল বাড়ীতে স্থানান্তরিত করে সেখানে পূজা ও ভোগের ব্যবস্থা করা হয়। এই হরিসভাগৃহ ৺পরমহংস রামকৃষ্ণদেব

ও রামদাস বাবাজীর পুণ্য পদধূলি স্পর্শে ধন্য হয়েছে। অন্যান্য বহু ধর্মানুরাগী ও শাস্ত্রব্যাখ্যাকার এখানে শুভাগমন করেছেন।

৪৭। **শীতলা মন্দির**—রাজরাজেশ্বরীতলা ও শম্ভু চ্যাটার্জী ষ্ট্রীটের সংযোগস্থল।

প্রতিষ্ঠিত—১৩২১ সাল। ৺সদানন্দ দাস ও ভূনি ঘোষাল মহাশয়ের উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত। বহুদিন ধরে খোলা জায়গাতে ৺শীতলা পূজা অনুষ্ঠিত হত। চার পাঁচ বছর আগে জনসাধারণের দানে নূতন মন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়। পূজার ব্যবস্থার জন্য একটা কমিটি আছে।

কোন্নগর উচ্চ বিদ্যালয়—তার অতীত ও বর্তমান

আধুনিক কোন্নগরের শিক্ষাজীবন ও শিক্ষাব্যবস্থা কলেজীয় স্তরে পৌঁছতে পারে নি। এটা খুবই আক্ষেপের বিষয়। কোন্নগরের উত্তর দক্ষিণের পৌর এলাকাগুলির মধ্যে শ্রীরামপুর, রিষড়া এবং উত্তরপাড়ায় একটি করে কলেজ থাকলেও কোন্নগরে সে রকম শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান না থাকাটা হয়ত কোন্নগরের একটা অগৌরবের দিক। কিন্তু কোন্নগরের শিক্ষা বিস্তারের ইতিহাসটা কিন্তু ততটা অগৌরবের নয়।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে এখানে ঠিক কি পদ্ধতিতে শিক্ষা দেওয়া হত, বা কি ধরনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছিল তার সুনির্দিষ্ট তথ্য পাওয়া সম্ভব নয়। অনুমান করা যেতে পারে তখন সারা দেশে যে রকম শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও শিক্ষা-পদ্ধতি প্রচলিত ছিল কোন্নগরেও ঠিক সে রকমটিই ছিল। শিক্ষা সকলের জন্য ছিল না। ছিল মুষ্টিমেয় কিছু পরিবারে আবদ্ধ। সেই পরিবারগুলিও আবার বর্ণগত বিন্যাসে উচ্চ বর্ণভুক্ত ছিল—অর্থাৎ, ব্রাহ্মণ, কায়স্থ ও বৈদ্য শ্রেণীভুক্ত। ব্রাহ্মণ পরিবারের ছেলেদের জন্য টোল। ব্রাহ্মণ-অব্রাহ্মণ (উচ্চবর্ণ) উভয় পরিবারের জন্য পাঠশালার। মুসলমানদের জন্য মক্তব মাদ্রাসা।

ইংরাজ ব্যবসায়ী সম্প্রদায়কে গঙ্গাতীরবর্তী কোন্নগর সেই সপ্তদশ শতাব্দী থেকেই দেখছে। তারা যে শাসক হয়ে উঠল এবং নবাবের ক্ষমতাটা তাদের হাতে চলে গেল এ বোধটা এল অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে। সমাজের উচ্চ-বর্ণের মানুষেরা ১৭৬৫-র পর থেকে ধীরে ধীরে এটা অনুধাবন করতে লাগল।

ইংলণ্ডীয় শিক্ষাব্যবস্থা গ্রহণ করা বা বিশেষ করে ইংরেজী ভাষা শেখার আগ্রহটা প্রধানতঃ দু'টো কারণে বাড়ল। এক, ইংরেজী ভাষা শিখলে শাসক সম্প্রদায়ের কাছাকাছি যাওয়া যাবে। দুই, মুসলমান নবাবী শাসনাধীন থাকার জন্য যে হীনমন্যতা হিন্দু সমাজ প্রধানদের গ্রাস করেছিল তার থেকে মুক্ত হওয়ার একটা সুযোগ লাভ করা গেছে।

ইতিমধ্যে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী পরিচালিত সরকার এদেশের শিক্ষার অবস্থা পর্যালোচনা করেন। ডাক্তার ফ্রান্সিস বুকানান হ্যামিল্টন তথ্য সংগ্রহের জন্য নিযুক্ত হয়ে এদেশীয় শিক্ষা সম্পর্কে যে রিপোর্ট দেন তার ভিত্তিতে এবং অন্যান্য নানাবিধ চিন্তার ভিত্তিতে এদেশে প্রথমে দেশীয় এবং পরে ইংরাজী শিক্ষা বিস্তারের পরিকল্পনা নেওয়া হয়। ভারত-হিতৈষী জোনাথান ডাঙ্কান ১৭৯২ সালে কাশীতে প্রতিষ্ঠা করেন একটি সংস্কৃত কলেজ। লর্ড ওয়েলেসলির প্রচেষ্টায় ১৮০০ সালে কলকাতায় প্রতিষ্ঠিত হয় ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ। শাসনকার্যের জন্যে এদেশে আগত ইংরাজদের এ দেশীয় ভাষা ও রীতিনীতির সঙ্গে পরিচিত করার জন্য মূলতঃ এই কলেজ প্রতিষ্ঠিত হলেও একে অবলম্বন করে মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার, উইলিয়ম কেরী, রামরাম বসু, হরপ্রসাদ রায় প্রমুখের লেখা বাংলা বইগুলির মধ্যে দিয়ে বাংলা ভাষা চর্চার পরিধি বিস্তৃত হয়। ফলে বাংলা পাঠশালা স্থাপিত হতে থাকে। সম্ভ্রান্ত পরিবারের ছেলেরা সেই সঙ্গে ইংরাজী পড়ায় আগ্রহী হলে কলকাতায় শারবার্ণ (sherburne), মার্টিন বাওল, আরাটুন পিট্রাস প্রমুখ কিছু সাহেব ইংরাজী শিক্ষার স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। এর পর রাজা রামমোহন, ডেভিড হেয়ার, বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায় প্রমুখ মনীষীগণের আগ্রহে এবং স্যার হাইড ইষ্ট-এর চেষ্টায় ১৮১৭ সালে যথোচিত ইংরাজী শিক্ষা প্রসার কল্পে প্রতিষ্ঠিত হল হিন্দু কলেজ। শুধু কলকাতাতে নয়, এই একই সময়ে চুঁচুড়া, শ্রীরামপুর প্রভৃতি মফঃস্বল এলাকাতেও ইংরাজী স্কুল স্থাপিত হল। রবার্ট মে চুঁচুড়াতে ইংরাজী স্কুল খুললেন ১৮১৪ সালে। কেরী ও মার্শম্যান শ্রীরামপুরে কলেজ খুললেন ১৮১৫ সালে।

কোন্নগরের ছেলে শিবচন্দ্র দেব এই ইংরাজী শিক্ষার আকর্ষণ থেকে দূরে থাকতে পারলেন না। কলকাতায় গিয়ে এই হিন্দু কলেজে ভর্তি হলেন। সেখান থেকে সসম্মানে উত্তীর্ণ হয়ে কোম্পানী সরকারে চাকরি পেলেন। হিন্দু কলেজে শিক্ষালাভের ফলে তাঁর মধ্যে তৈরী হয়েছিল একটা যুক্তিবাদী মন, গড়ে উঠেছিল একটা পরোপকারী জনহিতকরী চিত্তবৃত্তি, শিক্ষাপ্রয়াসী একটা অন্তঃকরণ।

১৮৫০ সালে শিবচন্দ্র কর্মজীবনসূত্রে মেদিনীপুর থেকে কলকাতায় বদলি হয়ে আসেন। বাস করতে থাকেন খিদিরপুরে। সপ্তাহান্তে একদিন

করে কোন্নগরে এসে থাকতেন। স্বগ্রামে যে বাংলা বিদ্যালয়টি ছিল তার পাশাপাশি একটা ইংরাজী স্কুল স্থাপন করার ও কোন্নগরে আরও বহুবিধ জনহিতকর কাজ করার মানসে "কোন্নগর হিতৈষিণী সভা" নামক যে সভাটি স্থাপন করা হয়েছিল তারই একটি অধিবেশনে (১৮৫২) এই বিদ্যালয় স্থাপনের প্রস্তাব নেওয়া হয়। স্থির হয় জমি দেবেন শিবচন্দ্র দেব নিজে। বাড়ী তৈরীর জন্যে চাঁদা তোলা হবে। গঙ্গার ধারে জি. টি রোডের পাশে ১ বিঘা ৫ কাঠার মত তাঁর জমি তিনি দিয়ে দেন এই উদ্দেশ্যে। ১৮৫৪ সালের মধ্যে সংগৃহীত ৪০০০ টাকায় (যার বেশীর ভাগ অংশটা শিবচন্দ্রের নিজের দেওয়া) ঐ জমিতে একটা হলঘর ও দুটো ছোটঘর তৈরী করে ১৮৫৪ সালের ১লা মে থেকে ওখানে পঠন-পাঠন শুরু করা হয়। স্কুলটির নাম হয় কোন্নগর সেমিনারী। বিদ্যালয়টি সরকারী স্বীকৃতিলাভ করে ১৮৫৫ সালের নভেম্বর মাসে। পরবর্তীকালে পার্শ্ববর্তী বিদ্যালয় সন্নিহিত কিছু জমি কেনার ফলে মোট জমির পরিমাণ দাঁড়ায় ৫ বিঘা ৬ কাঠা। আরও পরবর্তীকালে ১৯৩৮ সালে জি. টি রোডের পূর্বদিকে স্কুলের সামনে আরও ১ বিঘা ৩ কাঠা জমি কেনার ফলে বিদ্যালয়ের মোট জমির পরিমাণ দাঁড়ায় ৬ বিঘা ৯ ছটাক।

গত শতাব্দীতে বিদ্যালয় ভবন যতটা তৈরী হয়েছিল তার অনেকটাই ১৮৯৭ এর ভূমিকম্পে ভেঙে যায় বা ব্যাপক ক্ষতিগ্রস্ত হয়। দক্ষিণ-পশ্চিমের দুটো ঘর বাদে বাকী সব অংশটুকু পরে পর্যায়ক্রমে তৈরী হয়। প্রথম পর্যায়ে হয় পশ্চিমের উত্তর দক্ষিণে প্রলম্বিত অংশ। পরের পর্যায়ে বাকী অংশটুকু। এই নির্মাণে সহায়তা দান করেন বর্ধমানের ব্যবহারজীবি স্বর্গীয় তারাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়। সর্বদক্ষিণ পূর্বাংশের প্রশাসনিক ভবনটি সংযোজিত হয় ১৯৩৮-৩৯ সালে। ১৯২৮ সালে নির্মিত হয় প্রাথমিক বিদ্যালয় ভবন। উচ্চ মাধ্যমিক ভবনটি নির্মিত হয় ১৯৫৬ সালে আর বিনোদ ভবনটি নির্মিত হয় ১৯৬১-৬২ সালে। পুরাতন ওয়ার্কশপ সংলগ্ন দ্বিতল কক্ষদ্বয় নির্মিত হয় যথাক্রমে ১৯৮২ ও ১৯৯১ সালে। সব মিলিয়ে বিদ্যালয়ের কক্ষপরিসরের মাপ হল ১৫,২০৮ বর্গফুট।

১৮৫৪ সালে বিদ্যালয়টি যখন প্রতিষ্ঠিত হয় তখন কলকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের জন্ম হয়নি। ১৮৪০ সালে জেনারেল কমিটি অব্ পাবলিক ইন্সট্রাকশান প্রবর্তিত জুনিয়ার স্কলারশিপ পরীক্ষাই ছিল তখন বিদ্যালয়ের চূড়ান্ত পরীক্ষা। ১৮৫৭ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হলে সমস্ত ইংরাজী বিদ্যালয়গুলির মত এটিও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্ভুক্ত হয় এবং ১৮৫৮-র এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় পরীক্ষার্থী পাঠায় যাঁদের সফল চারজনের মধ্য একজন হলেন দেশবরেণ্য শ্রীঅরবিন্দ-র পিতা স্বর্গতঃ কৃষ্ণধন ঘোষ। এই সময় থেকে বিদ্যালয়ের নামটিও পরিবর্তিত হয়ে কোন্নগর

উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ে পরিণত হয়। ১৮৫৮-র জুন থেকে এইখানেই পাশাপাশি আরও একটি বিদ্যালয় চালু থাকে। তার নাম ছিল বঙ্গ বিদ্যালয় বা ভার্নাকুলার স্কুল। সেখানে ছ'টা শ্রেণী পড়ান হত, আর তার চূড়ান্ত পরীক্ষার নাম ছিল ভার্ণাকুলার স্কলারশিপ এগজামিনেশন। তারপরে যারা পড়তে চাইত তারা উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ে আর চার ক্লাস পড়ে এণ্ট্রান্স পরীক্ষা দিতে পারত। ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে এটা উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের সঙ্গে মিশে যায়। ১৯২৩ সালে সরকারী নির্দেশে আবার এর থেকে নীচের দুটো শ্রেণী আলাদা হয়ে যায়। প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণী নিয়ে হয় প্রাথমিক বিদ্যালয়। এরপর ১৯৫৪ সালের ১লা জানুয়ারী থেকে সরকারী নির্দেশে উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় থেকে ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণীকে সরিয়ে ওই প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সঙ্গে জুড়ে দিয়ে সেটিকে একটি স্বতন্ত্র বিদ্যালয়ে পরিণত করা হয়। নাম হয় শিবচন্দ্র দেব প্রাথমিক বিদ্যালয়। এই সময় থেকে উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের নাম পরিবর্তিত হয়ে কোন্নগর উচ্চ বিদ্যালয় হয়।

ইতিমধ্যে পশ্চিমবঙ্গে বিদ্যালয় শিক্ষাব্যবস্থায় কতকগুলো পরিবর্তন ঘটে। ১৯৫২ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের হাত থেকে মধ্যশিক্ষা পর্ষদের হাতে বিদ্যালয়ের চূড়ান্ত পরীক্ষা নিয়ন্ত্রণের অধিকার স্থানান্তরিত হল। ম্যাট্রিকুলেশনের বদলে পরীক্ষার নাম হল স্কুল ফাইনাল। ব্যবস্থাটা চলল ১৯৫৮ পর্যন্ত। বিদ্যালয় শিক্ষাক্রমকে দশ বছর থেকে বাড়িয়ে এগার পর্যন্ত করা হল। ১৯৫৯ সালে আর নিয়মিত কোন স্কুল ফাইনাল পরীক্ষা হল না। ১৯৬০-এ এই বিদ্যালয় থেকে প্রথম একাদশ শ্রেণীর উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীরা বিদ্যালয় জীবনের চূড়ান্ত পরীক্ষায় অবতীর্ণ হল। কোন্নগর উচ্চ বিদ্যালয় এই সময় থেকে কোন্নগর সর্বার্থসাধক উচ্চ বিদ্যালয়ে পরিণত হল। ১৯৭৪-এর পর ঐ একাদশ শ্রেণীর শিক্ষাক্রম আবার পরিবর্তিত হয়ে হল দশ শ্রেণীর মাধ্যমিক ও একাদশ দ্বাদশ মিলিয়ে দুই শ্রেণীর উচ্চ মাধ্যমিক। সেই ব্যবস্থা আজও চলছে।

আমরা আগে দেখেছি এই বিদ্যালয় সরকারী স্বীকৃতি লাভ করেছিল ১৮৫৫ সালে। ঐ সময় থেকেই বিদ্যালয় সরকারী অনুদান পেয়ে আসছিল। ছাত্রদের বেতন ও সরকারের অনুদানের ওপর নির্ভর করে বিদ্যালয়টি পরিচালিত হত। এই অনুদানের চরিত্র পরবর্তীকালে পরিবর্তিত হয়ে যায়। নির্দিষ্ট অনুদানের পরিবর্তে হয় 'ঘাটতি পূরণ' অনুদান। পরে তারও পরিবর্তন ঘটে। শিক্ষক, শিক্ষাকর্মী বেতন-এর সবটাই এখন সরকারী অনুদান হিসেবে পাওয়া যায়।

সরকারী নীতি অনুযায়ী যে শিক্ষাক্রম বা শিক্ষাবর্ষ বা অনুদান ব্যবস্থা প্রচলিত আছে তা তো পশ্চিমবঙ্গের সব মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের

মত কোন্নগর উচ্চ বিদ্যালয়েও আছে। তার থেকে ব্যতিক্রমী বা বৈশিষ্ট্যপূর্ণ কিছু আছে কিনা সেইটেই আলোচ্য।

প্রথম যে বৈশিষ্ট্য দেখা যায় তা হল এর অবস্থান ও আকার। প্রশস্ত নদীর ধারে, বড় রাস্তার গায়ে খেলার মাঠ সহ এইরকম মনোরম নক্সার একটি ভবন বাংলাদেশে খুব কম জায়গাতেই আছে। উন্মুক্ত গঙ্গাতীরের এই দৃষ্টিনন্দন অবস্থিতি আবার পাছে বিঘ্নিত হয় তাই বিদ্যালয়ের সামনে, জি টি রোডের পূর্বদিকের ভূখণ্ডও পূর্ববর্তী কালের বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ কিনে রেখেছিলেন যা বর্তমানে 'শিবচন্দ্র উদ্যান' হিসাবে পুরসভা নিয়ন্ত্রিত বিদ্যালয় অধীনস্থ একটি পার্কে রূপান্তরিত করা হচ্ছে।

দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য হল এর ঐতিহ্য। এই বিদ্যালয়ের পরিচালকমণ্ডলী ও শিক্ষকমণ্ডলীতে এমন এমন মানুষ বিভিন্ন সময়ে সংযুক্ত থেকেছেন যাঁদের জন্য দেশবাসী গর্ববোধ করতে পারে। শিবচন্দ্র দেব ছাড়া অন্য যে সব মানুষ পরিচালকমণ্ডলীতে যুক্ত থেকেছেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন রাজা জয়কৃষ্ণ মুখার্জী, রাজা দিগম্বর মিত্র, গিরিশচন্দ্র দেব, ত্রৈলোক্যনাথ মিত্র, যদুগোপাল চ্যাটার্জী, পূর্ণচন্দ্র মুখার্জী, দয়ালচন্দ্র শিরোমণি, ডাঃ চণ্ডীচরণ ঘোষাল, উমাচরণ ঘোষাল, রাধিকানাথ বসু, গোপালচন্দ্র বসু, পীতাম্বর চ্যাটার্জী, রায়বাহাদুর মহেন্দ্রনাথ বস, রামদুলাল দেব, রামধন দেব, শৈলেন্দ্র-নাথ মিত্র, নৃসিংহদাস বসু, শরৎকুমার দেব, দেবপ্রসন্ন মুখার্জী, শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী, রায়সাহেব জ্যোতিষচন্দ্র গাঙ্গুলী, ননীগোপাল বসু, কিশোরীমোহন ঘোষাল, ডঃ হরিসত্য ভট্টাচার্য, নটশ্রী বিপিন মুখার্জী, ডাঃ নীলমণি ব্যানার্জী, অধ্যক্ষ অধীরকুমার মুখার্জী প্রমুখ বিশিষ্ট নাগরিকবৃন্দ।

আবার শিক্ষকমণ্ডলীতে ছিলেন স্বর্গতঃ গঙ্গাধর আচার্য, উমেশচন্দ্র দত্ত, মহাত্মা শিশিরকুমার ঘোষ, নিত্যকৃষ্ণ বসু, রজনীকান্ত সেন, যতীন্দ্রনাথ রায়, ননীগোপাল চৌধুরী, রজনীকান্ত চক্রবর্তী, মণীন্দ্রনাথ মুখার্জী প্রমুখ বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ্‌গণ।

এই বিদ্যালয়ের তৃতীয় অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল অসংখ্য বৃত্তি ও পারিতোষিক যা বিভিন্ন মানুষের বিভিন্ন সময়ের দানের তহবিল থেকে গড়ে উঠেছে। প্রতিটি পারিতোষিক বিতরণ উৎসবে যে রিপোর্ট দেওয়া হয় সেখানে এই তহবিলের একটা তালিকা দেওয়া হয়।

বিদ্যালয়ের অন্যান্য বৈশিষ্ট্যগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল এর প্রাচীন নথি সংরক্ষণ ব্যবস্থা, গ্রন্হাগার ও গবেষণাগার। খেলাধূলার চর্চাও বিদ্যালয়টির অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

সব মিলে কোন্নগর উচ্চ বিদ্যালয় তার উচ্চ মাধ্যমিক বিভাগ সহ এখনও জেলার অন্যতম অগ্রগণ্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। শিক্ষক নিয়োগ সংক্রান্ত সরকারী

নীতির সুফলদায়ী কিছু দিক থাকা সত্ত্বেও জটিলতার আবদ্ধে পড়ে এখন বিদ্যালয়কে যে শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী ঘাটতিতে ভুগতে হচ্ছে তা যদি দীর্ঘস্থায়ী হয় তবে তার বিরূপ প্রতিফলন হয়ত আগামী দিনে বিদ্যালয়ের সুনাম হানি করবে। কিন্তু বিশ্বাস রাখি উত্থান পতনের প্রাকৃতিক নিয়মে একসময়ের সুদিনের পর যেমন দুর্দিন আসে তেমনি দুর্দিনের পর আবার সুদিনও আসে। সেই ভাবেই এ বিদ্যালয়ও তার কালজয়ী জয়যাত্রার পথে এগিয়ে চলবে। এই-ই হোক আমাদের আজকের আত্মপ্রত্যয়।

কোন্‌নগর হিন্দু বালিকা বিদ্যালয়ের কথা

যে কোন একটি প্রতিষ্ঠানের শতোত্তর রজত জয়ন্তী বর্ষে পদার্পণ একটি স্মরণীয় ঘটনা। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান—বিশেষত শিক্ষা প্রসারে নিয়োজিত প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে এই ঘটনা স্মরণীয়ই নয় শ্লাঘার বিষয়ও বটে।

আজ যে বিদ্যালয় কোন্‌নগর হিন্দু বালিকা উচ্চবিদ্যালয় নামে পরিচিত হয়ে তার অস্তিত্বের একশ পঁচিশ বছরে পদার্পণ করল তার জন্ম হয়েছিল ঊনবিংশ শতাব্দীর কোন্‌নগরের বুকে এক মহামনীষীর চিন্তাজগতে।

কোন্‌নগর নিবাসী ব্রজকিশোর দেবের পুত্র শিবচন্দ্র দেব ছিলেন হিন্দু কলেজের ছাত্র এবং ডিরোজিও-র শিষ্য। তাঁর কাছ থেকে পাওয়া জ্ঞানের আলোয় তিনি চিনে নিয়েছিলেন যুক্তিবাদ আর হিতবাদকে। যুক্তিবাদী মন জেনেছিল—শিক্ষা এবং বিশেষ করে পাশ্চাত্য শিক্ষার বিস্তার না ঘটালে এদেশের বুকে জমে থাকা দীর্ঘকালের অন্ধকার দূর হবে না। হিতবাদী চিন্তা তাঁকে স্বগ্রামের সেবায় নিযুক্ত হবার প্রেরণা দিয়েছিল।

১৮৫৪ সালে তাঁরই প্রচেষ্টায়, তাঁরই দানে তাঁরই জমিতে প্রতিষ্ঠিত হয় ছেলেদের উচ্চ শিক্ষার জন্য কোন্‌নগর সেমিনারি, যা পরে উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয় নামে পরিচিত হয়। আর তার ক'বছর পরে ১৮৬০ সালে তাঁর নিজের বসতবাটী--বর্তমানে যার নাম গৌরধাম—সেখানে তিনি প্রতিষ্ঠা করেন বালিকা বিদ্যালয়। ছেলেদের জন্য উচ্চ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হলেও মেয়েদের জন্য তখন উচ্চ তো দূরের কথা প্রাথমিক বিদ্যালয় করাও ছিল অত্যন্ত দুরূহ। স্ত্রী শিক্ষার কোনো আবহাওয়া তো তখন ছিলই না।

বরং ছিল চরম সামাজিক প্রতিকূলতা ও বিধি নিষেধ। হিন্দু সমাজের সমাজপতিরা ও তাঁদের অনুগামী লেখকরা নানা প্রবন্ধ, উপন্যাস প্রভৃতির মধ্যে দিয়ে বারবার দেখিয়েছেন মেয়েরা লেখাপড়া শিখলে সমাজ রসাতলে যাবে, সমাজে অনাচার প্রবেশ করবে, মেয়েদের বৈধব্য ঘটার সমূহ সম্ভাবনা। এমন কি শিক্ষিতা মহিলাদের সন্তানাদি ও বংশধররাও সমাজের পক্ষে ক্ষতিকারক হবে।

ডিরোজিও-র যুক্তিবাদে বিশ্বাসী ব্রাহ্ম শিবচন্দ্র এইসব কিছু জেনেও এই প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে একক সংগ্রামে নেমে পড়লেন। সরকার সমীপে অনেক আবেদন নিবেদন করে ব্যর্থ হয়ে তিনি নিজ গৃহে নিজ ব্যয়ে ১৮৬০ সালের ১২ এপ্রিল ৩২ জন ছাত্রী নিয়ে কোন্‌নগরের উপর প্রথম বালিকা বিদ্যালয়ের ভিত্তিভূমি রচনা করেন। কথিত আছে এই সময়ে ছাত্রীদের আবরু রক্ষার জন্য এবং তাদের পিতামাতাদের মনের ভীতি ও আশঙ্কা দূর করার জন্য নিজের ঘোড়ার গাড়িতে তিনি তাদের বিদ্যালয়ে আনা নেওয়ার ব্যবস্থা করে দেন।

শিবচন্দ্র ইতিপূর্বেই সরকারের কাছে মাসিক ৪৫ টাকা সাহায্যের আবেদন করেছিলেন। প্রথমে তা অগ্রাহ্য হয়েছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় সরকারি সিদ্ধান্তের পরিবর্তন ঘটে। কিছুদিন পরেই সরকার মাসিক পঁচিশ টাকা সবকারি অনুদান হিসাবে মঞ্জুর করেন।

শিবচন্দ্র দেব তখন বিদ্যালয়ের একটি নিজস্ব ভবনের উদ্যোগ গ্রহণ করেন। বর্তমানে কোন্‌নগর হাইস্কুল যেখানে সেখান থেকে ব্রাহ্মসমাজ ভবন পর্যন্ত সমস্ত এলাকাটাই ছিল তখন শিবচন্দ্রের ব্যক্তিগত দখলে। শিবচন্দ্র তারই একাংশে নিজ ব্যয়ে একটি বাড়ি নির্মাণ করেন এবং বিদ্যালয়টিকে তাঁর বাসগৃহ (বর্তমান গৌরধাম ভবন) থেকে স্থানান্তরিত করেন।

এই সময়ে (১৮৬০-৬৫) বিদ্যালয়ের শ্রেণী সংখ্যা ছিল মাত্র চারটি। শিবচন্দ্র যতকাল জীবিত ছিলেন (১৮৯০) ততদিন বা তার অব্যবহিত পরবর্তীকাল পর্যন্ত এই শ্রেণী সংখ্যাক্রমেই বৃদ্ধি পায়। ১৮৬৬-৬৮-র মধ্যে হয় ৫টি। ১৮৬৯-৮৯-এর মধ্যে ছিল ৬টি, ১৮৯০ থেকে ৯৬-এ সাতটি। কিন্তু এর পরই আবার শ্রেণী সংখ্যা হ্রাস পায়। ১৮৯৭-৯৮-এ হয় আবার ৬টি এবং ১৮৯৯-১৯০০ সালে হয় ৪টি। কিছুকাল পরে শ্রেণী সংখ্যা আবার ৬ হয়, এবং দীর্ঘকাল তাই থাকে।

বিদ্যালয়ের ব্যয় নির্বাহের জন্য এই সময়ে জনসাধারণের কাছ থেকে যেমন চাঁদা সংগ্রহের একটা ব্যাপার ছিল, তেমনি ছিল সরকারি অনুদানের ব্যবস্থা। চাঁদার ব্যাপারে লক্ষ্য করা গিয়েছে যে শিবচন্দ্রের জীবিতকালে ভাল চাঁদাই সংগৃহীত হয়েছিল। কিন্তু শিবচন্দ্রের মৃত্যুর পরই এই চাঁদা

হ্রাস পেতে থাকে। আর সরকারী অনুদানও প্রতি বছর সমহারে প্রদত্ত হয় নি। ১৮৬০-৬৯-এর মধ্যে ছিল মাসিক ২৫ টাকা। ১৮৭০-৭৫-এর মধ্যে ২৩ টাকা, ১৮৭৫-৮০তে ২৫ টাকা এবং ১৮৮০ থেকে ১৯২২ সাল পর্যন্ত মাসিক ২০ টাকা। এ ছাড়া পৌর প্রতিষ্ঠান থেকেও কিছু কিছু মাসিক সাহায্য পাওয়া যেত। ১৮৭৫ সালে প্রথম সাহায্য পাওয়া যায়। মাসিক সাহায্য ছিল ছয় টাকা। পরে এটি পাঁচ হয় এবং তারপর ১৯০০ সাল পর্যন্ত আট টাকা হারে সাহায্য প্রদত্ত হয়।

ছাত্রীদের কাছ থেকেও বেতন নেওয়া হত। ১৮৬০ থেকে ৬৯ পর্যন্ত মাসিক দশ ও পাঁচ পয়সা হারে এবং ১৮৭০-এর পর মাসিক এক আনা হারে। পরে এই হারের নানারকম পরিবর্তন হয়। কিন্তু ১৯২২ সাল পর্যন্ত কোন অবস্থাতেই সর্বনিম্ন শ্রেণীতে মাসিক বেতন চার আনার বেশি হয় নি।

১৮৬০ সালে মাত্র ৩২ জন ছাত্রী নিয়ে বিদ্যালয়টির সূচনা হয়। সেই পর্দানশীনতার যুগে কোন্নগরের মত ক্ষুদ্র গ্রামের বুকে এটা নিঃসন্দেহে একটা বৈপ্লবিক ঘটনা। মহামহোপাধ্যায় দীনবন্ধু ন্যায়রত্নের টোলবাড়ি ছিল যে গ্রামের গৌরব, যে গ্রামে 'কোন্নগর স্ত্রী শিক্ষা সভা' নামে সভা প্রতিষ্ঠিত হয় সে গ্রাম যে অশিক্ষার অন্ধকারে ঢাকা ছিল তা নয়। কিন্তু মেয়েরা রাস্তা দিয়ে যাতায়াত করে স্কুলে পড়াশোনা করবে এ ছিল এক অচিন্তনীয় ব্যাপার। তবু ১৯০০ সাল পর্যন্ত প্রাপ্ত হিসেবে দেখা যায় ঊনবিংশ শতাব্দীতে ছাত্রীসংখ্যা ছিল মোটামুটি ক্রমবর্ধমান। যদিও শিবচন্দ্র দেবের জীবৎকাল পর্যন্ত এই বৃদ্ধির যে হার ছিল তাঁর মৃত্যুর (১৮৯১) পর সেই হার হ্রাস প্রাপ্ত হয়।

শিক্ষায় সাফল্য—উত্তরপাড়ার 'হিতকরী সভা' স্ত্রী শিক্ষার প্রসারের জন্য যে ৮টি বৃত্তির ব্যবস্থা করেন প্রাথমিক পরীক্ষায় কৃতিত্ব প্রদর্শন করে এই বিদ্যালয়ের ছাত্রী কুমারী বিরাজমোহিনী দাসী ১৮৬৫ সালে প্রথম এই বৃত্তি অর্জন করেন (মাসিক ২ টাকা হারে এক বছর)। ১৮৭৬ সালে এই পরীক্ষার ফলাফল আরও ভালো হয়। এগার জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে দু'জন পায় সিনিয়র স্কলারশিপ আর সাতজন পায় জুনিয়র স্কলারশিপ। এই কৃতিত্বে খুশি হয়ে উত্তরপাড়ার হিতকরী সভা তৎকালীন প্রধান শিক্ষক শ্রীউমাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে একটি স্বর্ণমোহর উপহার দিতে প্রতিশ্রুত হন।

পরবর্তী পর্যায়ে, বিশেষ করে ১৯৫১ সালে বিদ্যালয়টি মাধ্যমিকের অনুমোদন পাওয়ার পর, শেষ পরীক্ষার বিস্তৃত ফলাফল অন্যত্র দেওয়া হয়েছে।

পরিচালন ব্যবস্থা—বিদ্যালয়ের আদিযুগ থেকে শুরু করে ১৯৩৬ পর্যন্ত

হিন্দু বালিকা বিদ্যালয়ের কোন স্বতন্ত্র পরিচালন সমিতি ছিল না। "ম্যানেজিং কমিটি, কোন্নগর এডেড স্কুলস" নামে একটি কমিটি ছিল যার কর্তৃত্বাধীনে ছেলেদের হাইস্কুল, ছেলেদের প্রাইমারি স্কুল আর মেয়েদের এই এম. ই. স্কুলটি পরিচালিত হত। শিবচন্দ্র দেবের জীবিতকালে তিনি **Manager, Konnagar Aided Schools** হিসেবে এই তিনটি বিদ্যালয়েরই প্রধান পরিচালকরূপে কাজ করতেন। যদিও কমিটিতে সম্পাদক হিসেবে অন্য কোনো সদস্য থাকতেন।

সরকারী নির্দেশে ১৯৩৪ সাল থেকে এই ব্যবস্থার পরিবর্তন ঘটে। ১৯৩৬ সালে হিন্দু বালিকা বিদ্যালয়ের জন্য স্বতন্ত্র পরিচালন সমিতি গঠিত হয়। সে সময় বিদ্যালয় উন্নয়নে অগ্রণী ভূমিকা নেন সর্বশ্রী মলয়কুমার দেব, অনিলকুমার ঘোষ ও নরেন্দ্রনাথ বসু। এই পরিচালন সমিতির সভাপতি, সম্পাদক ও কোষাধ্যক্ষ ছিলেন যথাক্রমে রায়সাহেব ধনকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, শ্রীমলয়কুমার দেব ও শ্রীঅনাথনাথ মুখোপাধ্যায়।

১৯৪৭ সালে একটি উচ্চশিক্ষা উপসমিতি গঠিত হয় এবং ১৯৬০ সালে যথোচিত মর্যাদায় বিদ্যালয়ের শতবার্ষিকী অনুষ্ঠিত হয়।

বিদ্যালয় ভবন—বিদ্যালয় প্রসঙ্গে বিদ্যালয় ভবনের ইতিহাস অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। প্রথমে শিবচন্দ্র তাঁর নিজের বাড়িতে বিদ্যালয়টি স্থাপন করেন। তার কিছুকাল পরে জি. টি. রোডের কাছে তাঁরই জমির থেকে ৬ কাঠা ৯০ ছটাক মতো তিনি বিদ্যালয়কে দান করেন এবং সেখানেই নিজ ব্যয়ে তিনি কাঁচা গাঁথুনির এক চারচালা গড়ে তোলেন (প্রায় ২৫০ বর্গফুট)। বর্তমান শ্যামাচরণ দেব লেন-এর ১নং ভূখণ্ডটিতে ছিল সেই চালাঘর। শিবচন্দ্রর মৃত্যুর পর থেকেই বিদ্যালয়টির প্রতি অযত্নের শুরু হয়। ১৯০০ থেকে ১৯২২ পর্যন্ত বিদ্যালয়টির জীবন ছিল বড় দুর্ভাগ্যময়। বিংশ শতাব্দীর এই প্রথম অংশে হিন্দু রক্ষণশীলতা আবার মাথা চাড়া দিয়ে উঠে। স্ত্রী শিক্ষার প্রতি গ্রামবাসীর আগ্রহ বহুলাংশে হ্রাস পায়। ইংরেজ বিরোধী জাতীয়তাবাদী আন্দোলনকে সবল ও শক্তিশালী করতে গিয়ে জাতীয় হিন্দু নেতৃবৃন্দ প্রাচীন ভারত ও সনাতনী ব্যবস্থা সম্পর্কে একটা মোহ সৃষ্টি করেন। ফলে তার অপব্যাখ্যায় রক্ষণশীলতা প্রশ্রয় পায়। বিদ্যালয় ভবনটি এই সময়ে কোনক্রমে টিকে থাকে। ১৯২২ সালে এই ভবনের পরিবর্তে নতুন ভবন নির্মাণে এগিয়ে আসেন গ্রামের এক কৃতী মানুষ স্বর্গীয় বিপিনবিহারী চন্দ্র মহাশয়। তিনি ও তাঁর বড় ভাই বিনোদবিহারী চন্দ্র পিতা ৺মতিলাল চন্দ্রের স্মৃতির প্রতি সম্মান প্রদর্শনার্থে ঐ পুরাতন আটচালার জায়গায় ১৮৭৫৷৷০ ব্যয়ে ৩০০ বর্গফুট মাপের একটি নতুন ঘর জমিটির পশ্চিম প্রান্তে তৈরি করে দেন।

এই ১৯২২ সালের শেষ ভাগে কোন্‌নগরের 'বান্ধব নাট্য সমিতি' গৃহ নির্মাণ কল্পে একটি অভিনয়ের প্রস্তাব রাখেন। প্রস্তাব অনুযায়ী সর্বশ্রী বিপিনবিহারী চন্দ্র, হরিসত্য মিত্র, মন্মথনাথ মিত্র, প্রফুল্লচন্দ্র মুস্তাফী, জ্যোতিষচন্দ্র মিত্র প্রমুখ ব্যক্তিগণের উদ্যোগে 'কোন্‌নগর সম্মিলনী' নামে একটি সমিতি গঠন করা হয়। এই সমিতির প্রচেষ্টায় ১৯২২-এর ৩১ ডিসেম্বর কোন্‌নগর উচ্চ বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে বান্ধব নাট্য সমিতি কর্তৃক 'নবাবী আমল' নাটক মঞ্চস্থ হয়, এবং সাহায্য রজনী হিসেবে চিহ্নিত এই নাট্যানুষ্ঠান মারফৎ সংগৃহীত অর্থ থেকে বিদ্যালয়ের গৃহ নির্মাণ তহবিলে মোট ১২৯৯ টাকা সংগৃহীত হয়। এই সময়ে শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ ঘোষ ও শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসুও বিদ্যালয় তহবিলে ৫০০ টাকা করে মোট হাজার টাকা দান করেন। সংগৃহীত অর্থ থেকে ২২৯৫ টাকা দু' আনা ব্যয়ে বিদ্যালয়ের মূল ভবনের মাঝের ঘর ও তার সামনের দালান নির্মিত হয়। এর দু'বছর পরে শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ বসু দান করেন ২০০০ টাকা। কোন্‌নগর কো-অপারেটিভ স্টোর উঠে যাওয়ায় তার তহবিলের ৫৩৪ টাকা দুই আনা বিদ্যালয় তহবিলে জমা হয়। এইসব দান ও অন্যান্য চাঁদা মারফৎ সংগৃহীত দান হতে ১৭০০ টাকা দু' আনা ব্যয়ে পূর্বদিকের ঘরটি নির্মাণ করা হয়। এইভাবে বিদ্যালয় ভবনের একতলার সম্পূর্ণ অংশটি ১৯৩১ সালের মধ্যেই নির্মিত হয়ে যায়।

এরপর ১৯৩৬ সালে বিদ্যালয়ের স্বতন্ত্র পরিচালন সমিতি গঠিত হলে তাঁদের উদ্যোগে অর্ধেক সরকারি অর্থে এবং অর্ধেক বিদ্যালয় তহবিলের সংগ্রহে ১৯৩৮ ও ১৯৩৯ সালে বিদ্যালয়ের দোতলার অংশ, পায়খানা, ফটক ইত্যাদি ৫৩৬৮ টাকা ব্যয়ে নির্মিত হয়। তৎকালীন সম্পাদক শ্রীযুক্ত মলয়-কুমার দেব মহাশয় দান করেন ৫০০ টাকা। এই সময়ে শ্রীরামপুরের তৎকালীন মহকুমা শাসক শ্রীযুক্ত অবনীভূষণ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের চেষ্টায় একটি সাহায্য রজনী মারফৎ ২৫০ টাকা পাওয়া যায়।

পরবর্তীকালে বিদ্যালয়টি প্রবেশিকা শ্রেণীতে উন্নীত হওয়ার পর বিদ্যালয় ভবনটিকে সম্প্রসারিত করার উদ্যোগ নেওয়া হয়। স্বাধীনতা প্রাপ্তি তথা বঙ্গ বিচ্ছেদের ফলে কোন্‌নগরের জনসংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পায়, উদ্বাস্তু আগমনজনিত চাপের ফলে ছাত্রীভর্তির চাপ বৃদ্ধি পাওয়ায় পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উদ্বাস্তু পুনর্বাসন ও সাহায্য দপ্তরের নিকট আবেদন করা হয়। এবং ১৯৫১-এর মার্চ মাসে ১০,০০০ টাকার অনুদান পাওয়া যায়। এই সময়ে কোন্‌নগরের লুপ্ত 'হলিডে ক্লাব' এর তহবিলের ৭৫৯ টাকা পাঁচ আনা বিদ্যালয় তহবিলে জমা দেওয়া হয়। প্রতিষ্ঠাতা শিবচন্দ্র দেব প্রদত্ত ভূখণ্ডে আর স্থান সংকুলানের সম্ভাবনা না থাকায় বিদ্যালয়ের পূর্বদিকে জি. টি. রোডের ওপর বিদ্যালয়ের লাগোয়া যে দ্বিতল বাড়িটি ছিল তা অধিগ্রহণের

পরিকল্পনা করা হয়। এছাড়া বিদ্যালয়ের পশ্চাদবর্তী ১৭ কাঠা জমির ১৪ কাঠা অধিগ্রহণের প্রচেষ্টা হয়। এই বিষয়ে এক মামলারও সূচনা হয়। শেষ পর্যন্ত মামলাটি স্কুলের অনুকূলে নিষ্পন্ন হলে জমি ও বাড়িটি অধিকারের ব্যবস্থা করা হয়। ১৯৫৫ সালের জুন মাসে বাড়ি ও জমিটি বিদ্যালয়ের দখলে আসে।

এরপর অধিগৃহীত ঐ বাড়িটি কিছুকাল পরে ভেঙে ফেলা হয় এবং সেইখানে বর্তমান ত্রিতল ভবনটি নির্মাণ করা হয়। একাজে শ্রীমলয়কুমার দেব ১০,০০০ টাকা দান করেন এবং তাঁর পিতা রামদুলাল দেবের নামে একটি ব্লকের নামকরণ হয়। এই অধিগ্রহণ ও নতুন ব্লক নির্মাণের কাজে যাঁরা উদ্যোগী হন তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ৺ননীগোপাল বসু, ৺নগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, ডাঃ নীলমণি বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীঅনিলচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রমুখ। পরে দক্ষিণাংশের একতলার ওপর আর একটি কক্ষ নির্মিত হয়। এছাড়া সাম্প্রতিককালে শিক্ষিকাদের জন্য প্রশস্ত ঘরের ব্যবস্থা এবং আরো নানা সংস্কারকার্য করা হয়।

১৯৭৮ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে, বিদ্যালয়ের আগামী দিনের প্রয়োজনীয়তার কথা স্মরণে রেখে, জি. টি. রোডের পূর্বদিকে বিদ্যালয়ের বিপরীতে পরিত্যক্ত ও জরাজীর্ণ একটি বাড়িসমেত ১২১ একর পরিমিত জমি ১২০০০ টাকা মূল্যে ক্রয় করা হয়। সেই জীর্ণ গৃহটিকে সম্প্রতি ভেঙে ফেলা হয়েছে এবং আগামী দিনে সেখানে উচ্চ মাধ্যমিক ভবন নির্মাণের পরিকল্পনা ও নকশা প্রস্তুত করা হয়েছে।

বিদ্যালয়ের বর্তমান পরিচালন সমিতি এই প্রসঙ্গে এই বিদ্যালয় পরিচালনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সমস্ত পূর্বসূরীদের গভীর কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করছে যাঁদের অক্লান্ত কর্ম প্রচেষ্টায় ও দানে বিদ্যালয়ের আয়তন ও কলেবর এই পর্যায়ে উন্নীত হয়েছে।

পরিচালন ব্যবস্থা—কোন্নগর হিন্দু বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের পূর্ব নাম ছিল কোন্নগর হিন্দু বালিকা বিদ্যালয়। মহাত্মা শিবচন্দ্র দেব বিদ্যালয়টি যখন স্থাপন করেন তখন হিন্দু শব্দটি যুক্ত ছিল কিনা এ সম্পর্কে সঠিক তথ্য জানা যায় না। ব্রাহ্ম শিবচন্দ্র কর্তৃক হিন্দু শব্দটি ব্যবহার না করাই ছিল স্বাভাবিক। বিপরীত দিক থেকে বিচার করলে মনে হয় হিন্দু শব্দটি পরবর্তীকালে ব্যবহার করার মধ্য দিয়ে তৎকালীন পরিচালকবর্গ গোঁড়া হিন্দু সমাজপতিদের একথা বোঝানোর চেষ্টা করেছেন যে বালিকা বিদ্যালয়টি ব্রাহ্মদের কোন সম্পত্তি নয় বা এখানে ব্রাহ্ম করার কোন চেষ্টা হবে না। তবে এ সবটাই অনুমান সাপেক্ষ। এখনও কোন সুনির্দিষ্ট তথ্য পাওয়া যায় নি।

বিদ্যালয়টির পরিচালনার ভার প্রথমে ছিল Managing Committee

for Konnagar Aided Schools নামক একটি সমিতির হাতে। ১৮৬০-৯১ পর্যন্ত শিবচন্দ্রের ভাইপো গিরীশচন্দ্র দেব এই কমিটির সম্পাদক ছিলেন এবং শিবচন্দ্র দেব এইসব স্কুলের ম্যানেজার পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। এই নামের কমিটিই ১৯৩৬ পর্যন্ত শিবচন্দ্র প্রতিষ্ঠিত সবকটি বিদ্যালয়ই পরিচালিত করেছিল। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৯৩৪ সালের আইন অনুযায়ী প্রত্যেকটি বিদ্যালয়ের জন্য স্বতন্ত্র কমিটির ব্যবস্থা হলে নতুন নির্বাচনের মধ্য দিয়ে নতুন কমিটি তৈরি করা হয় (১৯৩৬)। এর পর নতুন নিয়ম অনুযায়ী নির্বাচন হয় ১৯৪০-৪১ সালে।

বিদ্যালয়ের বর্তমান পরিচালন ব্যবস্থা মধ্যশিক্ষা পর্ষদ প্রবর্তিত বিধি অনুযায়ী ১২ জন সভ্য নিয়ে গঠিত এবং সর্বশেষ নির্বাচন ১৯৮১ সালে নিষ্পন্ন হয়েছে।

শিক্ষান্তরের ক্রমবিকাশ—আমরা প্রথমেই আলোচনা করেছি যে বিদ্যালয়টির সূচনা হয়েছিল চারটি শ্রেণী নিয়ে। ঊনবিংশ শতাব্দীতে শ্রেণী সংখ্যা সাত পর্যন্ত উঠেছিল। কিন্তু বিংশ শতাব্দীর গোড়ায় আবার চার-এ নেমে আসে। পরবর্তী কোন এক সময় এটি আবার ছ'টি শ্রেণীর বিদ্যালয়ে পরিণত হয়, এবং সেই অবস্থায় অর্থাৎ M. E. বা Middle English স্কুল হিসেবে দীর্ঘদিন চলে। পরবর্তীকালে ১৯৪৩ সালে বিদ্যালয়ে সপ্তম শ্রেণী খোলা হয় এবং অষ্টম শ্রেণীটি খোলা হয় ১৯৪৪ সালে। ১৯৪৪ থেকে ১৯৫০ পর্যন্ত বিদ্যালয়টি থেকে জুনিয়র হাইস্কুল। প্রবেশিকার জন্য নবম শ্রেণীতে (অননুমোদিত অবস্থায়) পঠনপাঠন শুরু হয় ১. ২. ১৯৪৮ থেকে। উচ্চ বিদ্যালয় হিসেবে স্বীকৃতি লাভ ঘটে ১৯৫০ সালের ১ জানুয়ারি থেকে। প্রথম প্রবেশিকা পরীক্ষার্থীরা পরীক্ষায় অবতীর্ণ হয় ১৯৫১ সালে। পরবর্তীকালে নতুন শিক্ষাক্রম অনুযায়ী বিদ্যালয়টি একাদশ শ্রেণীর উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে পরিণত হয় ১৯৬৩ সালে। ১৯৭৪ সালে একাদশ শ্রেণীযুক্ত উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষাক্রম অবলুপ্ত হলে বিদ্যালয়টি আবার দশম শ্রেণীর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে পরিণত হয়। বর্তমানে বৎসরে অর্থাৎ ১৯৮৫-তে বিদ্যালয়টি উচ্চ মাধ্যমিক (দ্বাদশ শ্রেণীর) স্তরে উন্নীত হওয়ার অনুমোদন লাভ করেছে। এই বছরের জুন মাস থেকে নতুন একাদশ শ্রেণীর সূচনা করা সম্ভব হয়।

শিক্ষক শিক্ষিকা প্রসঙ্গে—বিদ্যালয়ের পুরনো ইতিহাস এই প্রসঙ্গে খুব বেশি কিছু জানা যায় না। নথিগুলির যথোপযুক্ত রক্ষণাবেক্ষণ না থাকাই এই বিপর্যয়ের কারণ। গত শতাব্দীর উল্লেখযোগ্য প্রধান শিক্ষক শ্রীউমাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের নাম স্মরণীয়, সেরকম এই কালে শ্রীযুক্তা স্নেহলতা সেনগুপ্তর ভূমিকাও অবিস্মরণীয়। উভয়ের ভূমিকা দ্বারা বিদ্যালয়ের নাম শুধু উজ্জ্বলই হয়নি উভয়ের বিশেষত শেষোক্তের কার্যকালে বিদ্যালয়ের

শ্রীবৃদ্ধিও ঘটেছে। এছাড়া অন্তর্বর্তী সময়ের প্রধান শিক্ষক-শিক্ষিকার ভূমিকা, বা ঠাকুমা (শ্রীমতী ক্ষণপ্রভা ঘোষ), শান্তি দি (শান্তিলতা বসু) প্রমুখ শিক্ষয়িত্রীর অবদানও কোনদিন ভোলবার নয়। এঁদের কথা তাই শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয়।

সবশেষে, স্বাধীনতা পরবর্তী যুগে বিদ্যালয়ের দ্রুত শ্রীবৃদ্ধির জন্য যাঁরা অক্লান্ত প্রচেষ্টা করে গিয়েছেন তাঁদের কথা বিশেষ করে উল্লেখ না করলে ইতিহাসকে উপযুক্ত মর্যাদা দেওয়া হবে না।

প্রথমেই স্মরণ করতে হয় স্বর্গত ননীগোপাল বসু, শ্রীযুক্ত সুবোধকুমার মিত্র ও শ্রীমলয় দেবকে। শ্রীমিত্রের উদ্যোগ নেওয়ার ফলেই বিদ্যালয়টি প্রবেশিকা পরীক্ষা দেওয়ার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদন লাভ করে। বিদ্যালয় গৃহ নির্মাণ ও অন্যান্য উন্নয়ন কর্মে স্বর্গত বসু ও শ্রীদেব অর্থ ও সামর্থ্য দান করেছেন। সদ্য প্রয়াত শ্রীনগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় দীর্ঘকাল এই বিদ্যালয়ের সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেছেন এবং তাঁর সময়ে বহুবিধ বিস্তৃতি ঘটে। নিরলস প্রচেষ্টায় তিনি বিদ্যালয়টির প্রভূত উন্নতি করে গেছেন। জি. টি. রোড ও গঙ্গার মধ্যবর্তী মল্লিকদের জমিটি—যেখানে নতুন বিদ্যালয় ভবন গড়ে তোলা হচ্ছে—বিদ্যালয়ের জন্য কেনার ব্যাপারে তাঁর ভূমিকা বিশেষভাবে স্মরণযোগ্য। ননীগোপাল বসুর সম্পর্কে আর একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় হল যে তিনিই প্রথম বিদ্যালয়ের ইতিহাস সংকলিত করেন।

মহাত্মা শিবচন্দ্র দেব প্রতিষ্ঠিত এবং তাঁর আশীর্বাদপূত এই বালিকা বিদ্যালয়টি শুধু কোন্নগরেই নয় তার আশেপাশের এলাকায় স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারে সুদীর্ঘ ১২৫ বছর ধরে এক গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকা পালন করে চলেছে। একটি ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠান হিসাবে এর জন্ম, কিন্তু প্রয়াসটি ছিল বিরাট। ধীরে ধীরে বিকশিত হয়ে এটি একটি মুখ্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মর্যাদায় অধিষ্ঠিত হতে পেরেছে। জনসাধারণের অকুণ্ঠ সহযোগিতা ও সমর্থনই বিদ্যালয়টির বৃদ্ধি ও ক্রমবিকাশে শক্তি জুগিয়েছে। সেই সহযোগিতা ও সমর্থন আরও দৃঢ় ও বলিষ্ঠ আকারে দেখা দেবে এ আশা নিশ্চয় করা চলে।

আশালতা বালিকা বিদ্যালয়

১৯৩৯ সাল। পাঠচক্র গোষ্ঠীভুক্ত যুবকেরা তখন একের পর এক কোন্নগরের সামাজিক প্রতিষ্ঠান সমূহের কর্তৃত্ব গ্রহণ করেছে। প্রথমে কোন্নগর সাধারণ গ্রন্থাগার তারপর কোন্নগর সমবায় ব্যাঙ্ক। তার পরের ঘটনা হল কোন্নগর হিন্দু বালিকা বিদ্যালয়ে অনুপ্রবেশের চেষ্টা। কিন্তু প্রতিনিধি নির্বাচনে মতভেদ দেখা দিল। আলোচনা করেও তার সমাধানের সূত্র খুঁজে পাওয়া গেল না। সুতরাং প্রতিদ্বন্দ্বিতায় দুই গোষ্ঠীর যুবকেরা পরস্পরের সম্মুখীন হলেন। উল্লেখ করা দরকার যে একদলের নেতৃত্বে ছিলেন সুবোধ-কুমার মিত্র (দিল্লী প্রবাসী)। এই গোষ্ঠীতে কোন্নগরের প্রায় সব অঞ্চলের মানুষের নাম ছিল। অপর গোষ্ঠীতে ছিলেন কোন্নগরের রাজ-রাজেশ্বরীতলা ও শম্ভু চ্যাটার্জী ষ্ট্রীটের যুবকেরা। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন নগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, প্রভাতকুসুম বন্দ্যোপাধ্যায়, দুর্গাপদ ঘোষাল, অনাথনাথ মুখোপাধ্যায়, অহীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ও শিবপ্রসাদ ঘোষ। শেষোক্ত ব্যক্তির বাসস্থান শ্রীঅরবিন্দ রোডে—তখন যা পুরাতন বাজার ষ্ট্রীট নামে পরিচিত ছিল। এই গোষ্ঠীর মধ্যে দুর্গাপদ ঘোষাল ছাড়া আর সকলেই বর্তমানে পরলোকগত।

অপর গোষ্ঠীভুক্ত প্রার্থীগণের মধ্যে বর্তমান লেখক এখনও জীবিত। নির্বাচনে প্রথম গোষ্ঠীর প্রার্থীরা পরাজিত হন। বিক্ষুব্ধ গোষ্ঠীর সমবেত চেষ্টার ফলস্বরূপ প্রতিষ্ঠিত হয় আভাবতী বালিকা বিদ্যালয়। আভাবতী ছিলেন কোন্নগর দ্বাদশ মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা হাটখোলার জমিদার স্বর্গত হরসুন্দর দত্তের দৌহিত্রী কন্যা এবং সুধীরকুমার মিত্রের সহধর্মিনী। পুরাতন বাজার নিবাসী শিবপ্রসাদ ঘোষ মহাশয়ের সঙ্গে তাঁর কিছুটা পরিচয় ছিল এবং তিনি তাঁকে তাঁর পত্নীর নামে আভাবতী বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করার ব্যাপারে সম্মতি ও প্রয়োজনীয় অর্থ সাহায্যের প্রতিশ্রুতি আদায় করতে সমর্থ হন।

ইতিমধ্যে দেবপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়ের সহিত সংযোগ স্থাপন করে তাঁর কোন্নগরের পৈতৃক নিবাস শম্ভু চ্যাটার্জী ষ্ট্রীটের বাড়ির চারটি ঘর বিনা ভাড়ায় ব্যবহারের অনুমতি লাভের চেষ্টাও সম্ভব হল।

সুধীরকুমার মিত্রের প্রদত্ত প্রথম দফায় প্রাপ্ত অর্থের সাহায্যে বিদ্যালয়ের আসবাব সমূহ এবং খাতাপত্রাদি ক্রয় করা হয়। দুঃখের বিষয় কিছুদিন পরেই সুধীর মিত্র মহাশয় ইহলোক ত্যাগ করেন। বিদ্যালয়ের সভ্যগণের চাঁদার

টাকার সাহায্যে বিদ্যালয়ের শিক্ষিকাগণের বেতন—যাহা তৎকালে মাসিক ৩০/৩৫ টাকার অধিক ছিল না—তাহা প্রদান করা হত। অবশ্য কিছু অর্থ ছাত্র বেতনের মাধ্যমে সংগৃহীত হত।

কিন্তু বিদ্যালয়ের পরিচালন সমিতির সভ্যগণ বিদ্যালয়ের নিজস্ব ভবন নির্মাণে আগ্রহান্বিত থাকায় জমি সংগ্রহের প্রয়াস চালাতে থাকেন। তাঁরা বিশ্বস্ত সূত্রে খবর পান পরলোকগত শম্ভুচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের মধ্যম পুত্র ৺পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের বিধবা পুত্রবধূ বসত বাটীর সম্মুখস্থ কিছু জমি বিক্রয় করিতে ইচ্ছুক। কিন্তু জমির যে মূল্য নির্ধারিত হয় তাহা সভ্যগণের নিকট হইতে প্রাপ্ত অর্থে কোনক্রমেই সম্ভব ছিল না। প্রায় ১০০০ (এক হাজার) টাকার ঘাটতি পড়ছিল, তখন অনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় ছিলেন আভাবতী বালিকা বিদ্যালয়ের সম্পাদক। তিনি স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে ঐ টাকা দিতে এগিয়ে এলেন। কথা হল জমিটি কেনা হবে বিদ্যালয়ের সম্পাদকের নামে—অবশ্য ক্রয় সংক্রান্ত দলিলে অনাথ মুখোপাধ্যায় সম্পাদক হিসাবে স্বাক্ষর করবেন। কিন্তু দলিল রেজিষ্টারের পর দেখা গেল জমির ক্রেতা হিসাবে শ্রীঅনাথনাথ মুখোপাধ্যায়ের নাম থাকলেও ব্যক্তি নামের সঙ্গে সম্পাদকের পদের কোন উল্লেখ ছিল না। বলা বাহুল্য ঐ জমি অনাথনাথ মুখোপাধ্যায়ের ব্যক্তিগত সম্পত্তিরূপে পরিগণিত হল। এবং কার্যতঃ তিনি বিভিন্ন ব্যক্তির নিকট ঐ জমি বিক্রয় করেছেন এবং কিছু অংশে বাড়ী তৈরী করে ভাড়াটে বসিয়েছেন। অবশ্য অন্যান্য সভ্যেরা নিজেদের অধিকার সাব্যস্ত করার জন্য আদালতের আশ্রয় গ্রহণ করেননি। ইতিমধ্যে বিদ্যালয়ের জন্য গৃহ সংস্থানের ব্যাপারে তারা উদ্যোগী হলেন। বর্তমানে যে বাড়ীতে বিদ্যালয়টি অবস্থিত ঐ বাড়ীটি খালি থাকার খবর পেলেন। বাড়ীর স্বত্ত্বাধিকারী সুধীর চট্টোপাধ্যায় মহাশয়। বাড়ীটি দয়াল শিরোমণি লেনের দুলাল চক্রবর্তী মহাশয়ের নিকট বন্ধক দেওয়া ছিল।

সভ্যদের নিকট চাঁদা সংগ্রহের চেষ্টা চলতে থাকল। ইতিমধ্যে মাসিক ভাড়ায় বাড়ীটি ব্যবহারের অনুমতি পাওয়া গেলে তারা বিদ্যালয়টি ঐ বাড়ীতে স্থানান্তরিত করলেন।

বিদ্যালয়ের তৎকালীন সম্পাদক ধীরেন্দ্রনাথ বিশবাস মহাশয় তাঁর পরলোকগতা পত্নী আশালতার স্মৃতিতে এক হাজার টাকা বিদ্যালয়কে দান করতে প্রতিশ্রুতি দিলেন। তাঁর শর্ত হল আভাবতী নামের পরিবর্তে বিদ্যালয়টি আশালতা বিদ্যালয়রূপে পরিগণিত করতে হবে। উপায়ান্তর না দেখে সভ্যগণ ধীরেনবাবুর প্রস্তাবে সম্মত হওয়ার ফলে বিদ্যালয়টি বর্তমানে আশালতা বালিকা বিদ্যালয় নামে পরিচিত হল।

১৯৭১ সালে প্রাথমিক বিভাগ সরকার কর্তৃক পরিগৃহীত হওয়ার

ফলে মাধ্যমিক বিভাগের ৪ শ্রেণী (অর্থাৎ পঞ্চম থেকে অষ্টম শ্রেণী) পরিচালন দায়িত্ব—বিদ্যালয়ের কার্য নির্বাহক সমিতির উপর ন্যস্ত থাকে। ছাত্রী বেতন ও অতিরিক্ত বেতন বাবদ যে অর্থ সংগৃহীত হত তা দ্বারা ঐ শ্রেণী কয়টি খুব সুষ্ঠুভাবে না হলেও তার আর্থিক দায়িত্ব কোনও ক্রমে সম্পন্ন হত। পরবর্তীকালে দুলাল চক্রবর্তী মহাশয় ৮০০০ টাকায় বাড়ীটি বিদ্যালয়কে বিক্রয় করতে সম্মত হলে পরিচালক সমিতি গৃহ নির্মাণ তহবিল হতে সংগৃহীত এবং সত্যজিৎ রায়ের 'দেবী' চলচ্চিত্র প্রদর্শনী ও লটারী হতে সংগৃহীত অর্থের সাহায্যে গৃহটি ক্রয় করেন ১৯৭২ সালে।

১৯৭০ সালে বিদ্যালয়ের তৎকালীন সভাপতি প্রভাতকুসুম বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরলোকগমনের পর শ্রীবিজনবিহারী চট্টোপাধ্যায় মহাশয় সভাপতিরূপে নির্বাচিত হলেন। বিদ্যালয়ের সম্পাদক প্রয়াত ধীরেন্দ্রনাথ বিশ্বাস মহাশয়ের পর প্রয়াত নগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় সম্পাদকরূপে নির্বাচিত হয়েছিল। বাস্তব বুদ্ধি ও সংগঠন শক্তি নগেন্দ্রনাথের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। ঐ সময় তিনি আমাকে বিদ্যালয়ের পরিচালন সমিতির সভাপতির পদে নির্বাচিত করেন।

বিদ্যালয়ের ভবনটি বিদ্যালয়ের নির্বাচিত সম্পত্তি হলেও উহার আমূল সংস্কারের প্রয়োজন দেখা দেয়। গৃহ সংস্কার তহবিল প্রবর্তন ও অন্যান্য খাতের অর্থ থেকে ঋণ গ্রহণ করে বিদ্যালয় ভবনটির আমূল সংস্কার, বিদ্যুৎ সরবরাহ এবং নলকূপের ব্যবস্থা করা হয়।

ইতিমধ্যে বিদ্যালয়ে নবম ও দশম শ্রেণী প্রবর্তনের জন্য শিক্ষাবিভাগের নিকট আবেদন করা। বহু চেষ্টা সত্ত্বেও ঐ আবেদনের কোন ইতিবাচক সাড়া না পাওয়ায় স্বাধীনভাবে নবম, দশম শ্রেণী প্রবর্তন করা হয়। অননুমোদিত এই দুই শ্রেণীর ছাত্রীরা কোন অনুমোদিত বিদ্যালয়ের দশম শ্রেণীর বার্ষিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে প্রবেশিকা পরীক্ষায় যোগ দেওয়ার সুযোগ লাভ করার ফলে স্থানীয় ছাত্রীগণের যারা কোন অনুমোদিত বিদ্যালয়ে পড়ার সুযোগ লাভে সমর্থ হচ্ছে না তারা নিশ্চয়ই উপকৃত হন।

পরিশেষে বক্তব্য এই যে মতভেদকে সূত্র করে বিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠিত হলেও বর্তমানে এই প্রতিষ্ঠানের উপযোগিতা বিষয়ে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। ১৯৪০ সালে কোন্নগরের লোকসংখ্যা সাড়ে সাত হাজারের অধিক ছিল না। কিন্তু বর্তমানে ঐ লোকসংখ্যা ৭০,০০০ হাজারে পরিণত হয়েছে, সুতরাং বিদ্যালয়ের বর্তমান পরিচালক মণ্ডলীর পক্ষ থেকে বিদ্যালয়টিকে দশম শ্রেণীর বিদ্যালয়ে উন্নীত করার জন্য আন্তরিক প্রয়াস একান্তভাবে প্রয়োজন। আশা করি তাঁরা এ বিষয়ে অবহিত হবেন।

সংযোজন—আনন্দের কথা গত ১৯৯২ সালে বিদ্যালয়টি মাধ্যমিক স্তরে

উন্নীত হয়েছে। ১৯৯৪ ও ১৯৯৫ সালে বেশ কিছু ছাত্রী উত্তীর্ণ হয়েছে। ঐ দু'বছর দু'একজন করে ছাত্রী লেটারও পেয়েছে। নূতন শিক্ষিকা নিযুক্ত হচ্ছেন। এতদিন স্থানের অভাব পরিলক্ষিত হচ্ছিল। ইতিমধ্যে একটা নূতন গৃহ নির্মিত হয়েছে। শোনা যাচ্ছে সরকার এক লক্ষ টাকা দান করেছেন। ঐ টাকায় আরও নূতন গৃহ শীঘ্রই নির্মিত হবে। সকলের সহযোগিতায় বিদ্যালয়টি ক্রমোন্নতির পথে এগুবে—এই আশা করা যায়।

কোন্নগরের পাবলিক লাইব্রেরী

লাইব্রেরী—বাংলা অনুবাদে আমরা তাকে গ্রন্থাগার বলে থাকি; ব্যুৎপত্তিগত অর্থে যাকে সুরক্ষিত গ্রন্থের সংগ্রহালয় বলা যেতে পারে। বর্তমান যুগে গ্রন্থাগারের এই সংকীর্ণ অভিধা যে সঙ্গত নয়—সে কথা উল্লেখ করা বাহুল্যমাত্র। ব্যাপক অর্থে গ্রন্থাগারকে বিশ্বের জ্ঞানভাণ্ডার বলেও অভিহিত করাই মনে হয় সুসঙ্গত। প্রাচীন বিশ্বের ব্যাবিলন, আসিরিয়, আলেকজান্দ্রিয়া—ভারতের তক্ষশিলা, নালন্দা অথবা বিক্রমশীলার গ্রন্থাগার হিসাবে যতই মর্যাদা থাকুক না কেন—বৃটিশ মিউজিয়াম, লাইব্রেরী বিবলিওথিকা ন্যাশনাল (ফ্রান্স), লাইব্রেরী অফ্ কংগ্রেস (যুক্তরাষ্ট্র), লেনিন লাইব্রেরী (রাশিয়া), ভারতের জাতীয় গ্রন্থাগার প্রভৃতির তুলনায় ঐ সমস্ত গ্রন্থাগারগুলির গুরুত্বকে সমপর্যায়ভুক্ত বলে গণ্য করা যায় না।

দুই তিন শতাব্দী পূর্বে গ্রন্থাগারের আবেদন বয়ঃপ্রাপ্ত শিক্ষিত মানুষ ও গবেষকদের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। বর্তমানে তার পরিধি সমাজের আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা—তথা অক্ষর জ্ঞানসম্পন্ন সকল শ্রেণীর মানুষের মধ্যে প্রসার লাভ করেছে। সাধারণ গ্রন্থাগার তো আছেই—তা ছাড়া পাশাপাশি গড়ে উঠেছে শিশু গ্রন্থাগার—কিঞ্চিদধিক পঞ্চাশ বছর পূর্বে তার অস্তিত্ব ছিল না বললেই চলে; বিদ্যালয় ও মহাবিদ্যালয়ভুক্ত গ্রন্থাগার—এবং বিদ্যালয়ে প্রত্যেক শ্রেণীর সঙ্গে সংযুক্ত স্বতন্ত্র গ্রন্থাগারও এখন দুর্লভ নয়। শহরের বেশীর ভাগ বড় অফিসের সঙ্গে একটি গ্রন্থাগারও যুক্ত আছে যেখানে গ্রন্থের সংগ্রহের পরিমাণ বেশ উল্লেখযোগ্য কারণ মালিকের তরফ থেকে বেশ মোটা টাকাই এইসব গ্রন্থাগার দান হিসাবে পেয়ে থাকে। এই ধরনের গ্রন্থাগারের

সংগ্রহে হালকা ধরনের পুস্তকেরই প্রাধান্য। কারণ এইসব প্রতিষ্ঠানের কর্মচারীরা সারাদিনের কাজকর্মের পর গুরুতর বিষয়ের আলোচনাবহুল গ্রন্থে মনোনিবেশ করতে স্বভাবতই আগ্রহ প্রকাশ করে না। কারণ জ্ঞান আহরণের চেয়ে অবসর বিনোদনের প্রবণতাই তাদের মূল লক্ষ্য। কলকারখানা, হাসপাতাল এবং বিভিন্ন পল্লী সংগঠনের সঙ্গেও বর্তমানে গ্রন্থাগারসমূহ জড়িত আছে।

বিষয় বৈচিত্র্যের কথা বাদ দিলেও দুর্লভ গ্রন্থের সংগ্রহই গ্রন্থাগারের উৎকর্ষের প্রকৃত পরিচয় বহন করে। সেদিক থেকে গ্রন্থাগারের প্রাচীনতার যে বিশেষ গুরুত্ব আছে—সে বিষয়েও সন্দেহের অবকাশ নেই। অবশ্য পুস্তক-সমূহ যত্ন সহকারে রক্ষণ, কীটের আক্রমণের প্রতিষেধক ব্যবস্থা গ্রহণ প্রভৃতির সুবন্দোবস্ত না থাকলে পুস্তকসমূহ বিনষ্ট হওয়ার সমূহ সম্ভাবনা।

দুর্লভ পুস্তক সমূহের সংগ্রহ, গণনীয় সংখ্যক পাঠক কর্তৃক তার ব্যবহার —আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা প্রভৃতি নানা শ্রেণীর পাঠকের রুচি ও প্রকৃতির পরিপোষক গ্রন্থের সমারোহ, গ্রন্থাগার সংলগ্ন প্রশস্ত পাঠকক্ষ প্রভৃতির বিচারে কোন্নগর সাধারণ গ্রন্থাগার ও অবৈতনিক পাঠকক্ষ যে হুগলী জেলা তথা পশ্চিমবঙ্গ এমনকি সমগ্র ভারতবর্ষে এক গুরুত্বপূর্ণ স্থানের দাবী রাখে সে কথা অনস্বীকার্য।

আজ থেকে ১২৫ বছর আগে ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে এই গ্রন্থাগারটির স্থাপনা এবং সংলগ্ন অবৈতনিক পাঠকক্ষের সংযোজন কেবলমাত্র প্রতিষ্ঠাতার দূর-দৃষ্টিকেই সপ্রমাণিত করেনি তার ভবিষ্যৎ সম্ভাবনাকেও কতদূর সমুজ্জ্বল করেছে প্রতিটি সংস্কৃতিবান মানুষের কাছে তা সহজেই বোধগম্য।

১২৫ বছরের এই প্রতিষ্ঠানের অগ্রগতি অব্যাহত নয় এবং পতন অভ্যুদয়ে তা উপলবন্ধুর। এর সভ্যসংখ্যার হ্রাস বৃদ্ধি ঘটেছে মাঝে মাঝে। গ্রন্থের সংগ্রহ বিশেষত বহু মূল্যবান গ্রন্থও যে পুরাতন উচ্চ বিদ্যালয় ভবনের উত্তর-পূর্ব কোণে অবস্থিত এক জীর্ণ কক্ষে অবস্থিত থাকাকালে বর্ষার জলে সিক্ত হয়ে বিনষ্ট ও পরিত্যক্ত হয়েছে—আমাদের কাছে তা এক প্রত্যক্ষ ঘটনা। কালানুক্রমিক গ্রন্থতালিকা রক্ষিত হলে সেই ক্ষতির পরিমাণ নির্ণয় করার সম্ভব হত। কিন্তু যা নেই তা নিয়ে আক্ষেপ করা ছাড়া আর উপায় কি?

কিন্তু বর্তমানে যখন গ্রন্থাগারের গ্রন্থতালিকা সুবিন্যস্ত ও বিজ্ঞান-সম্মত পদ্ধতি সম্বলিত, প্রতি বৎসর না হলেও দু-তিন বৎসর অন্তর পুস্তক সংখ্যা গ্রন্থতালিকার সঙ্গে মিলিয়ে নেওয়ার সুযোগ ঘটে, তখন নিরুদিষ্ট পুস্তক সংখ্যার ঘাটতি যে একেবারে নগণ্য একথা হলফ করে বলা যায় না।

তাই আনন্দবাজার পত্রিকার প্রতিনিধি শ্রীসুজিত সেনগুপ্ত যখন অনুযোগ করেন যে ১২৫ বছর বয়সের তুলনায় ২২০০০ পুস্তকের সংখ্যা যে কিছুটা

অপ্রতুল তখন তাঁর সেই বক্তব্যকে অস্বীকার করা চলে না। তার প্রত্যুত্তরে আগে যে কথা বলেছি তার পুনরুক্তি করে বলি যে যত্নের অভাবে বিশেষতঃ প্রাকৃতিক দুর্যোগজনিত ক্ষয়ক্ষতির বিষয় বিবেচনা করলে আমাদের সংগ্রহের পরিমাণ যথেষ্ট না হলেও একেবারে অনুল্লেখ্য নয়। তাছাড়া বহু প্রাচীন ও দুর্লভ গ্রন্থের সংগ্রহ যে এই গ্রন্থাগারকে যথেষ্ট গৌরবদান করেছে, গ্রন্থাগার পরিদর্শন করে বিভিন্ন গবেষক ও মণীষীবৃন্দের সপ্রশংস মন্তব্য সেই পরিচয় বহন করছে।

গ্রন্থাগারের ভবন নির্মাণের জন্য মহাত্মা শিবচন্দ্র যে জমি দান করেছিলেন জীবিতাবস্থায় সেই ভূখণ্ডে গ্রন্থাগারের নিজস্ব ভবন নির্মাণ ও সেখানে গ্রন্থাগারের স্থানান্তর তাঁর স্বচক্ষে দেখা সম্ভব হয়নি। তাঁর মহাপ্রয়াণের ৩৭ বছর পরে ১৯২৭ সালে একতলায় একটি প্রশস্ত কক্ষ নির্মিত হবার পর গ্রন্থাগারটি ঐ কক্ষে স্থানান্তরিত হয়। অতঃপর ১৯৩২ সালে নির্মিত পূর্বদিকের ক্ষুদ্র হলঘরটি যা ত্রৈলোক্যনাথ মেমোরিয়াল হল নামে পরিচিত ঐ কক্ষটি সাধারণ পাঠাগাররূপে ব্যবহৃত হত। ছোটখাট ঘরোয়া বৈঠক, আলোচনা সভা ও পরিচালক সমিতির সভা অনুষ্ঠানের সময় ঐ কক্ষটি ব্যবহৃত হত।

১৯২৫ সালে গ্রন্থাগারের শিশু বিভাগ প্রতিষ্ঠিত হলে ঐ কক্ষটি শিশু-বিভাগের পুস্তক সংগ্রহ ও আদান-প্রদানের জন্য ব্যবহৃত হত।

শিশু বিভাগটি কোন্নগর সাধারণ পাঠাগারের এক বিশিষ্ট সম্পদ। গ্রন্থাগারের তৎকালীন পরিচালক সমিতি বিশেষতঃ স্বর্গত বিজলীনাথ বসু মহাশয়ের ঐকান্তিক চেষ্টায় গ্রন্থাগারের প্রাক্তন সম্পাদক ৺ললিতকুমার দেব মহাশয়ের স্মৃতিতে শিশু বিভাগটি ১৯৩৫ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। গ্রন্থাগারের অন্যতম প্রাক্তন সহ-সম্পাদক শান্তিনিকেতনের শিক্ষক ৺শিশিরকুমার মিত্রের উদ্যোগে ১৯৩৬ সালে রবীন্দ্রনাথ শিশু বিভাগের উন্নতি কামনা করে এক বাণী প্রেরণ করেন। আজ থেকে ৫৮ বছর আগে গ্রন্থাগারে শিশু বিভাগের ভূমিকা কতদূর গুরুত্বপূর্ণ ছিল সে চিন্তা যখন অনেকের মাথায় প্রবেশ করেনি তখন এই বিভাগটির প্রতিষ্ঠা তৎকালীন গ্রন্থাগারের পরিচালক সমিতির সভ্যগণের দূরদৃষ্টির কৃতিত্বপূর্ণ সাক্ষ্য বহন করে। সুতরাং ১৯৩৫ সালে স্পেনের বিশ্ব লাইব্রেরী সম্মেলনের ভারতীয় প্রতিনিধি মুণীন্দ্র দেবরায় মহাশয় কর্তৃক এই গ্রন্থাগারের শিশু বিভাগের সপ্রশংস উল্লেখ কোন অভাবনীয় ঘটনা নয়।

দোতলায় উঠবার সিঁড়ির উত্তরদিকে পাঠাগারের ছাদের উপর মূলতঃ সরকারী অনুদানে একটি কক্ষ নির্মিত হওয়ায় এখন শিশু বিভাগটি ঐ ঘরে স্থানলাভ করেছে। বর্তমানে শিশু বিভাগে ৫ টাকা জমা দিয়ে নাম নথীভুক্ত

করালে সভ্যদের কাছ থেকে কোন চাঁদা নেওয়া হয় না। স্থানীয় বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা শিশু বিভাগের সভ্য হতে পারে।

এই গ্রন্থাগারের বৈশিষ্ট্যের মধ্যে শ্রীরামপুর রোটারী ক্লাবের আনুকূল্যে ১৯৬৬ সালে প্রতিষ্ঠিত Text Book Bank এবং পরিচালক সমিতির সভ্যগণের উদ্যোগে সংগৃহীত ২৬০০০ টাকা ব্যয়ে ডাঃ বঙ্কিম মুখার্জীর স্মৃতি রক্ষার্থে প্রতিষ্ঠিত বিশ্ববিদ্যালয় ও মহাবিদ্যালয়ের স্তরের ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষা বিষয়ে সাহায্যের উদ্দেশ্যে ১৯৭০ সালে পাঠ্যপুস্তক শাখার প্রতিষ্ঠা বিশেষ উল্লেখের দাবি রাখে।

২৫০-৩০০ লোকের বসার উপযোগী সরকারী অনুদানে ১৯৬৭ সালে নির্মিত নূতন ভবনের দোতলার প্রশস্ত হলঘরটি সংস্কৃতি চর্চার প্রয়োজনে ব্যবহৃত হওয়ার ফলে ঐ ধরনের সভা-সমিতির অনুষ্ঠানের অসুবিধা নিরসনে তা বিশেষ সহায়তা হয়েছে।

সভ্য সংখ্যার আধিক্যের বিচারে—সব বিভাগ মিলিয়ে বর্তমানে যা ১৯০০—হুগলী জেলার মধ্যে প্রথম স্থানের দাবি করতে পারে। অবৈতনিক পাঠাগারে গড়ে দৈনিক ৭০ জন পাঠকের উপস্থিতিও নিঃসন্দেহে উৎসাহজনক।

৫৮ বছর আগে নির্মিত গ্রন্থাগারের পুরাতন ভবনটি জীর্ণ প্রায় এমনকি সংস্কারের দ্বারাও ভবনটি রক্ষা করা সম্ভব নয়। সুতরাং ভবনটি পুনর্নির্মাণের একান্ত প্রয়োজন,—তাছাড়া ঐ ভবনের উপর দোতলার সংযোজন না হলে গ্রন্থাগারের সম্প্রসারণ সম্ভব নয়। দু দফার ৫০০০০ টাকা সরকারী অনুদান পাওয়া গেছে। কিন্তু একতলার কক্ষটির পুনর্নির্মাণের জন্য ৭৫০০০ টাকা প্রয়োজন। দোতলা সহ সমগ্র ভবনটি নির্মাণের আনুমানিক ব্যয় ১,৭৭০০০ টাকা। অতিরিক্ত ১,২৭০০০ টাকা সংগ্রহের জন্য সহৃদয় গ্রামবাসীর দ্বারস্থ হওয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই। এই সংযোজনগুলি পরিসমাপ্ত হলে কোন্নগরের গ্রন্থাগার সমস্যার আশু প্রয়োজন সংসাধিত হওয়ার সম্ভাবনা যথেষ্ট আশাপ্রদ।

জ্ঞান স্পৃহা বিষয়ে আগ্রহ বৃদ্ধি—জনকল্যাণমুখী সমাজ চেতনার প্রসার ও পাঠকের রুচির মানোন্নয়নে গ্রন্থাগারের যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে—সেই মানসিকতা কতদূর এবং কিভাবে কার্যকরী করা সম্ভব সে বিষয়ে আলোচনারও যথেষ্ট অবকাশ আছে। পরিসংখ্যানের হিসাব দিয়ে হয়ত দেখান যেতে পারে প্রৌঢ় বয়স্ক গ্রাহকেরা ধর্মীয় অথবা ভ্রমণ কাহিনীমূলক পুস্তক ব্যবহারে কিছুটা আগ্রহ প্রকাশ করে থাকে। কিন্তু অধিকাংশ পাঠকই যে হালকা ধরনের উপন্যাস অথবা রোমহর্ষক কাহিনী সম্বলিত গল্প গ্রন্থের জন্য লালায়িত সে তথ্য কোন ক্রমেই অস্বীকার করা যায় না।

পরীক্ষায় সাফল্য লাভের উদ্দেশ্য প্রণোদিত হয় ছাত্রেরা জ্ঞান-বিজ্ঞানের গ্রন্থপাঠে উদ্বুদ্ধ হতে পারে—পরলোকে সদ্গতি লাভের সম্ভাবনায় বৃদ্ধেরা ধর্মগ্রন্থ পাঠে সচেষ্ট হতে পারে, কিন্তু অবসরবিনোদন ছাড়া অন্য কোন চিন্তা যাদের মনে স্থান পায় না—তাদের রুচি পরিবর্তন সমাজহিতৈষী মানুষ মাত্রেরই শিরঃপীড়া মাঝে মাঝে বিভিন্ন সাহিত্য, নাটক অথবা জ্ঞান-বিজ্ঞান সংক্রান্ত সভার অনুষ্ঠান যে এই গ্রন্থাগারের মাধ্যমে অনুষ্ঠিত না হয়েছে তা নয়। বক্তার খ্যাতি ও প্রতিপত্তি অনুযায়ী ঐ সব সভার জনসমাগমের তারতম্যও ঘটেছে। কিন্তু জ্ঞানার্জনের আগ্রহের বিচারসভায় জনসমাগম যে যথেষ্ট আশাব্যঞ্জক নয়—সে কথা উল্লেখ করা বাহুল্য মাত্র।

জনসাধারণের শুভবুদ্ধির উপর নির্ভরশীল প্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব সুষ্ঠু-ভাবে পালিত হওয়ার ব্যাপারে একমাত্র পরিচালক সমিতির ভরসায় বসে থাকলেই চলবে না। সভ্যগণের তথা জনসাধারণের দায়িত্ব কিছু কম নয়। ১২৫ বছর এই প্রতিষ্ঠানের যতটুকু উন্নয়ন সম্ভব হয়েছে প্রয়োজনের তুলনায় তা যে যথেষ্ট নয় একথা অবশ্যই স্বীকার করতে হবে। শতোত্তর রজতজয়ন্তী উপলক্ষ্যে যে গঠনমূলক কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়েছে তা হতে পারে সরকার এবং জনসাধারণের সক্রিয় সহযোগিতায়।

হানাফী লাইব্রেরী—১৯৩৩ সালে প্রতিষ্ঠিত। তখন বিভিন্ন বাড়ীতে প্রয়োজন অনুযায়ী স্থানান্তরিত ও বই বণ্টন হ'ত। ১৯৮০ সালে নূতন দ্বিতলগৃহ প্রতিষ্ঠিত হয়। মহম্মদ হানিফ ও লাল মোসেলেমের দেওয়া জায়গায় গৃহটি প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় তাঁদের নামানুসারে গৃহটি লালমোসলেম নামে পরিচিত। বর্তমান বইয়ের সংখ্যা ২৫০০ (আনুমানিক)।

কোন্নগর সমবায় ব্যাঙ্ক লিমিটেড

আমাদের গ্রাম কোন্নগর। কবিকঙ্কণের চণ্ডীমঙ্গলের কোন্নগর, বঙ্কিম-চন্দ্রের সূর্যমুখীর পিত্রালয় কোন্নগর, অনুরূপা দেবীর পোষ্যপুত্রের কোন্নগর, ও দীনবন্ধু মিত্রের সুরধুনীকাব্য প্রভৃতিতে বাংলাদেশের শিক্ষিত সমাজে কোন্নগরের পরিচিতি সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

ছোট গ্রাম, জনসংখ্যা অল্প। কিন্তু গৌরবে ও মর্যাদায় ছোট নয়। ঋষি

অরবিন্দের পৈত্রিক বাসভূমি এই গ্রামে। এই গ্রামেরই অন্যতম সুসন্তান বিশিষ্ট সমাজসেবী ও শিক্ষাব্রতী বর্তমান কোন্নগরের জনক মহাত্মা শিবচন্দ্র দেব, রাজা দিগম্বর মিত্র, মহামহোপাধ্যায় দীনবন্ধু ন্যায়রত্ন, কবি যদুগোপাল চট্টোপাধ্যায়, হিন্দুমেলার প্রবর্তক ও নবজাগরণের নেতা নবগোপাল মিত্র, বহুভাষাবিদ পণ্ডিত রাজেন্দ্রলাল মিত্র, ভৌগোলিক শশীভূষণ চট্টোপাধ্যায়, আইনজ্ঞ ডঃ ত্রৈলোক্যনাথ মিত্র, নাট্যকার অতুলকৃষ্ণ মিত্র, বঙ্গ রঙ্গমঞ্চের প্রখ্যাত অভিনেতা প্রকাশচন্দ্র মুস্তাফি, আইনজ্ঞ নৃসিংহদাস বসু ও প্রখ্যাত দন্ত চিকিৎসক ডাঃ বঙ্কিম মুখোপাধ্যায় বিভিন্ন সময়ে নিজ নিজ ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা লাভ করে কোন্নগরের মুখ উজ্জ্বল করেছেন।

সারা বাংলাদেশ যখন নবজাগরণ ও সংস্কৃতির আলোড়নে উদ্বুদ্ধ কোন্নগর তখন পিছিয়ে থাকেনি। মহাত্মা শিবচন্দ্রের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় ও আনুকূল্যে নাগরিক জীবনের অত্যাবশ্যক প্রতিষ্ঠানগুলি যথা কোন্নগর প্রাথমিক ও উচ্চ বিদ্যালয়, কোন্নগর বালিকা বিদ্যালয়, কোন্নগর সাধারণ পাঠাগার, পোস্ট অফিস, পুলিশ ফাঁড়ি, রেল স্টেশন প্রভৃতি আজ থেকে ১১০/১২০ বছর আগে প্রতিষ্ঠিত হয়। সে সময়ে কলিকাতার আশেপাশে বহু সমৃদ্ধশালী গ্রামেও এইসব সুযোগ সুবিধা ছিল না। এর ফলস্বরূপ কোন্নগর সারা বাংলাদেশে একটি বিশেষ স্থান অধিকার করে।

সুচনা—তারপর বহু বৎসর গত হয়েছে, কিন্তু কোন্নগরে সাধারণের জন্য তেমন কোন প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠেনি। পঞ্চাশ বছর আগে মহাত্মা শিবচন্দ্র দেবের উপযুক্ত উত্তরসুরীরা এই মহৎ প্রতিষ্ঠানটির বীজ বপন করেন। তখন কোন্নগরের পাড়ায়-পাড়ায়, অলিতে-গলিতে, সঙ্ঘ-সমিতি গড়ে ওঠেনি। ছিল না কোন দলাদলি রেষারেষি। শিক্ষিত যুবকেরা স্বদেশী আন্দোলনের আবহাওয়ায় গড়ে উঠে সমাজ সেবায় ব্রতী হচ্ছে। এমনি সময়ে এই গ্রামেরই কতিপয় শিক্ষিত যুবক, পরবর্তীকালে নেতৃস্থানীয়, 'Friends Literary Association' গঠন করেন। অধ্যাপক নৃপেন্দ্রনাথ ঘোষ, বিনয়ভূষণ ঘোষ, ইন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, সত্যচরণ মুখোপাধ্যায়, ননীগোপাল বসু, নলেন্দ্রনাথ ঘোষ প্রভৃতি এই Association-এর কর্মকর্তা ছিলেন। এঁদের বৈঠক বসতো বিনয়বাবুর বাড়ীতে, তাই লোকে একে বলতো "বিনয়ের আড্ডা", কিন্তু এঁরা নিজেরা একে 'Carlton House' নামে অভিহিত করতেন। সেই সময়ে বিলাতের 'Carlton House' ছিল রাজনীতি ও সমাজ সেবার কেন্দ্রবিন্দু।

একদিন নলেন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের বাড়ীতে যথারীতি বৈঠক বসেছে। কথা প্রসঙ্গে সমাজ সেবার অঙ্গ হিসাবে মধ্যবিত্ত সমাজে সমবায় সমিতির প্রয়োজনীয়তার কথা তুললেন ললিতমোহন ঘোষাল তখন তিনি Co-opt. Dept.-এ কাজ করছেন। সমিতি গঠন স্থির হওয়ায় তিনি Co-operative Society,

সংক্রান্ত কাগজপত্র ও আইন পুস্তক এনে দিলেন। উপবিধি (Bye-laws) তৈরী ও প্রাথমিক হিসাবরক্ষার ভার দেওয়া হল যথাক্রমে সত্যচরণ মুখোপাধ্যায় ও উত্থানপদ মুখোপাধ্যায়কে। এইভাবে ১৯২৩ সালে বর্তমানের বিশাল মহীরূহ এই কোন্নগর সমবায় ব্যাঙ্কের জন্ম।

কার্যারম্ভ—১৫ জন সভ্যের মধ্যে ২৩ খানি শেয়ার বিলি করে ও মাত্র ১২৫ টাকার মূলধন সংগ্রহ করে ১৯২৩ সালের ৮ই মার্চ এই সমিতি রেজেস্ট্রীকৃত হয়। ১৯২৩ সালের ২৫শে মার্চের সাধারণ সভায় প্রথম কার্য-নির্বাহক সমিতি গঠিত হয় ও ১লা এপ্রিল ১৯২৩ থেকে ব্যাঙ্কের লেনদেন ও কাজকর্ম শুরু হয়।

প্রথম ১৫ জন সংগঠক সভ্য

১। ৺ননীগোপাল বসু
২। ,, সত্যচরণ মুখোপাধ্যায়
৩। ,, উত্থানপদ মুখোপাধ্যায়
৪। ,, ললিতমোহন ঘোষাল
৫। ,, নলেন্দ্রনাথ ঘোষ
৬। ,, প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
৭। ,, কালীকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়
৮। ,, প্রফুল্লকুমার দেব
৯। ৺লক্ষ্মীনারায়ণ ভট্টাচার্য
১০। ,, সুরেশচন্দ্র বসু
১১। শ্রীবিষ্ণুচরণ মুখোপাধ্যায়
১২। ,, অচ্যুতচরণ মুখোপাধ্যায়
১৩। ৺নগেন্দ্রনাথ সেন
১৪। ,, ভবানীচরণ সেন
১৫। ,, তুলসীচরণ ভট্টাচার্য

প্রথম পরিচালনা ও কর্মপরিষদ

১। ৺ননীগোপাল বসু সভাপতি
২। ,, সত্যচরণ মুখোপাধ্যায় সম্পাদক
৩। ,, উত্থানপদ মুখোপাধ্যায় কোষাধ্যক্ষ
৪। ,, নলেন্দ্রনাথ ঘোষ সদস্য
৫। ৺প্রফুল্লকুমার দেব সদস্য
৬। ,, সুরেশচন্দ্র বসু ,,
ও পরে
৺গোপালকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়

গৃহ নির্মাণ

ব্যাঙ্কের কার্যালয় প্রথমে ৺বিনয়ভূষণ ঘোষ মহাশয় ও পরে শ্রীনলেন্দ্রনাথ ঘোষ মহাশয়ের বাড়ীতে অবস্থিত ছিল। দুই মাস বাদে হাতীরকুলের ৺রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের বাগানবাড়ীতে স্থানান্তরিত হয় এবং সেখানে ১৩ই আগষ্ট ১৯৩৭ সাল পর্যন্ত বিনা ভাড়ায় থাকে। গৃহ নির্মাণের জন্য একটি তহবিল গঠন করা হয়। ঐ তহবিল হতে বর্তমান ব্যাঙ্ক ভবনের জন্য কোন্নগর সাধারণ পাঠাগারের কর্তৃপক্ষের নিকট হতে ১৩৪০ টাকায় ১০ কাঠা ১১ ছটাক জমি ক্রয় করা হয়। ১৭ই অক্টোবর ১৯৩৬ ভিত্তিপ্রস্তর

স্থাপিত হয় ও ২৬শে সেপ্টেম্বর ১৯৩৭ গৃহপ্রবেশ হয়। এই ভবনটি নির্মাণের জন্য ব্যয় হয় ৯৬২০ টাকা। ননীগোপাল বসু ও শৈলেন্দ্রনাথ বসুর তত্ত্বাবধানে এই গৃহ নির্মিত হয়। তাহারই স্বীকৃতি স্বরূপ সাধারণ সভা ননীবাবুকে একটি রৌপ্য ফুটরুল ও শৈলেনবাবুকে একটি পেলিকান পেন উপহার দেন। পরে প্রয়োজনবোধে ব্যাংক ভবনের আরও সম্প্রসারণ ও দ্বিতলে গৃহ নির্মিত হয়। এই সম্পত্তির বর্তমান মূল্য লক্ষাধিক।

কোন্নগরের ইতিহাসে কোন্নগর আইডিয়াল সোসাইটির ভূমিকা

নব জাগরণ আন্দোলনের অন্যতম পথিকৃৎরূপে কোন্নগরের মহাত্মা শিবচন্দ্র দেবের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। শিবচন্দ্র তাঁর কর্মধারাকে মূলতঃ শিক্ষাবিস্তার ও সমাজসেবার উন্নতিকল্পে নিযুক্ত করেন। ফলে এখানে কোন্নগর হিতৈষিণী সভার মাধ্যমে তিনি কোন্নগরে প্রাথমিক বিদ্যালয়, উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়, বালিকা বিদ্যালয়, সাধারণ গ্রন্থাগার প্রভৃতি শিক্ষা ও সংস্কৃতিমূলক প্রতিষ্ঠানসমূহ স্থাপন করেন।

তাঁহার সমাজসেবার নিদর্শন স্বরূপ দাতব্য চিকিৎসালয়, ডাকঘর, রেলষ্টেশন স্থাপন, করদাতা সমিতি ও চৌকীদারী প্রথা প্রবর্তন প্রভৃতিও সশ্রদ্ধ উল্লেখের দাবী রাখে।

চাকুরী জীবনেই তিনি ব্রাহ্ম আন্দোলনের প্রতি আকৃষ্ট হন—এবং সপরিবারে ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করেন। পরবর্তীকালে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের সহায়তায় কোন্নগর ব্রাহ্মসমাজ নামে স্বগ্রামে একটি উপাসনা মন্দির স্থাপন করেন। কোন্নগরে সমাজসেবার ক্ষেত্রে কোন্নগরের স্থানীয় ও প্রবাসী যে সমস্ত শিক্ষিত ও প্রগতি মনোভাবাপন্ন ব্যক্তিবর্গকে যুক্ত করতে পেরেছিলেন তাঁদের মধ্যে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম ডি, এল, আইন বিভাগের প্রথম অধ্যক্ষ, ঠাকুর আইন অধ্যাপক, শ্রীরামপুর মিউনিসিপ্যালিটির প্রথম ভারতীয় চেয়ারম্যান ডাঃ ত্রৈলোক্যনাথ মিত্র এম এ ডি এল, কলিকাতা নগবীর প্রথম ভারতীয় শেরিফ জমিদার সভার অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা, সম্পাদক ও সভাপতি রাজা দিগম্বর মিত্র, উত্তরপাড়ার জমিদার রাজা জয়কৃষ্ণ মুখার্জী, স্থানীয়

চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়, শম্ভুচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, কলিকাতা হিন্দু স্কুলের প্রধান শিক্ষক নিজ ভ্রাতুষ্পুত্র গিরীশচন্দ্র দেব প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য।

কোন্নগরের অন্যতম সুসন্তান চন্দ্রশেখর দেব রামমোহনের আদি শিষ্য-বর্গের অন্যতম শিবচন্দ্রের সমকালীন ও চাকুরীক্ষেত্রে কালেক্টরের পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। সমাজ সংস্কার স্ত্রীশিক্ষা বিস্তার, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা রক্ষা, খৃষ্টান মিশনারী প্রভাবের খর্বতা সাধনে হিন্দু চ্যারিটেবল ইনস্টিটিউ-শনের প্রতিষ্ঠা, বৃটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটির প্রতিষ্ঠা—সংবাদপত্রের স্বাধীনতা হরণে ১৮২৩ সনের ৩নং রেগুলেশনের প্রতিবাদে ১৮৩৫ সালে অনুষ্ঠিত টাউন হলের সভায় বক্তৃতা দান প্রভৃতি ঘটনাও তাঁহাকে সমাজ সংস্কারকগণের অন্যতম নেতারূপে প্রতিষ্ঠিত করে। ১৮৫১ সালে তিনি জ্ঞানোদয় নামে এক শিশু মাসিক পত্র প্রকাশ করেন। বাংলা ভাষায় প্রকাশিত এই পত্রটিই সম্ভবতঃ প্রথম শিশু মাসিক পত্রের মর্যাদার দাবী রাখে।

শিবচন্দ্রের সমসাময়িক কোন্নগরে রক্ষণশীল সমাজের অন্যতমরূপে মহামহোপাধ্যায় দীনবন্ধু ন্যায়রত্ন মহাশয়ের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ন্যায় শাস্ত্রে তাঁর পাণ্ডিত্য ভারতবিশ্রুত ছিল। অন্ধ্র, তামিলনাড়ু প্রভৃতি দূরাঞ্চল থেকেও তাঁর কাছে ন্যায়শাস্ত্রে শিক্ষা লাভের জন্য ছাত্র সমাগম ঘটত। তিনি কোন্নগর ধর্মসভার সভাপতি ছিলেন এবং ধর্মসভা থেকে ১৮৮৫ সালে প্রকাশিত ধর্মমর্ম প্রকাশিকার সম্পাদক ছিলেন। ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে মহারাণী ভিক্টোরিয়ার রাজ্যভার গ্রহণের সুবর্ণ জয়ন্তী উপলক্ষ্যে পাণ্ডিত্যের স্বীকৃতিস্বরূপ যে ৯ জন পণ্ডিতকে প্রথম মহামহোপাধ্যায় উপাধি দান করা হয় তিনি তাঁদের অন্যতম ছিলেন। সমসাময়িক কোন্নগরের বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের মধ্যে পদ্যপাঠ রচয়িতা যদুগোপাল চট্টোপাধ্যায়ের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি কোন্নগরের সমাজ জীবনেও এক গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করেছিলেন। ছাত্র, শিক্ষক ও পরে কোন্নগর উচ্চ বিদ্যালয়ের পরিচালক সমিতির সভ্যপদও অলঙ্কৃত করেন। তিনি এক সময়ে শ্রীরামপুর মিউনিসিপ্যালিটির সভ্যপদেও অধিষ্ঠিত ছিলেন। সমকালে কবি হিসাবে জনপ্রিয়তায় তাঁহার স্থান ছিল ঈশ্বর গুপ্তের পরেই। বিদ্যালয় ও মহা-বিদ্যালয়ের সাহিত্য বিষয়ক পাঠ্যপুস্তকে তাঁহার একাধিক কবিতা স্থান লাভ করেছিল।

ঐ সময়ে অপর উল্লেখযোগ্য ব্যক্তি ছিলেন শশীভূষণ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়। ভারতীয়দের মধ্যে তিনিই সর্বপ্রথম মানচিত্র ও ভূগোলক নির্মাণের পথিকৃৎ। ভারতীয়দের মধ্যে তিনিই প্রথম এফ আর জি এস উপাধি লাভে সম্মানিত হন। তাঁহার রচিত পাঠ্যপুস্তকগুলির মধ্যে নব শিক্ষাপথ, শৈশব পাঠ (১ম-৫ম ভাগ) সচিত্র বর্ণ পাঠ, বাংলা অভিধান ও ব্যাকরণ শিক্ষা উল্লেখযোগ্য।

তিনি 'সহচর' নামক মাসিক পত্রের সম্পাদক ছিলেন। তাঁহার রচিত রামের রাজ্যাভিষেক পুস্তকটি বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রশংসাধন্য।

অভিনেতা, নাট্যকার বসুমতী পত্রিকার সম্পাদক ও উপন্যাস রচয়িতা-রূপে অতুলকৃষ্ণ মিত্র এক সময়ে সাহিত্য ও নাট্য জগতে সুপরিচিত ছিলেন। তাঁহার রচিত নাটক গীতিনাট্য ও প্রহসনগুলির সংখ্যা ৪০। প্রায় সবগুলিই স্টার, মিনার্ভা, কোহিনুর, ক্লাসিক প্রভৃতি থিয়েটারে অভিনীত হয়েছিল।

ন্যাশন্যাল নবগোপাল নামে পরিচিত নবগোপাল মিত্র কোন্নগর মন্দির-পাড়ার অধিবাসী ছিলেন। জোড়াসাঁকো ঠাকুর বাড়ীর পৃষ্ঠপোষকতায় প্রবর্তিত হিন্দু মেলার তিনি ছিলেন প্রাণপুরুষ। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সম্পাদকতায় প্রকাশিত **National Paper**-এর তিনি সহ-সম্পাদক হলেও সম্পাদকের গুরুদায়িত্ব তাঁকেই পালন করতে হয়। বাঙালী যুবকগণের মধ্যে শক্তিচর্চায় উৎসাহ দানের জন্য তিনি শঙ্কর ঘোষ লেনে এক ব্যায়ামাগার স্থাপন করে লাঠি খেলা, কুস্তি লড়া, ঘোড়ায় চড়া প্রভৃতি শিক্ষার ব্যবস্থা করেছিলেন।

সমাজ সেবার ক্ষেত্রে পরবর্তীকালে যাঁদের উল্লেখযোগ্য অবদান রয়েছে তাঁদের মধ্যে নৃসিংহদাস বসু মহাশয়ের নাম বিশেষভাবে স্মরণীয়। তিনি কোন্নগর সাহায্যপ্রাপ্ত বিদ্যালয় সমূহের সম্পাদক ও পরে সভাপতির পদ অলংকৃত করেন। তাঁহার সহকর্মীদের মধ্যে বর্ষীয়ান পীতাম্বর চট্টোপাধ্যায়, রায়বাহাদুর রাধিকানাথ বসু, ননীগোপাল বসু, ডাঃ শরৎকুমার দেব এবং রায়সাহেব জ্যোতিষচন্দ্র গাঙ্গুলী মহাশয়ের নাম উল্লেখযোগ্য। সহকর্মীগণের সহযোগিতায় তিনি উচ্চবিদ্যালয়ের পুরাতন জীর্ণপ্রায় ভবনটির আমূল সংস্কার সাধন ও বর্তমান সুরম্য ভবনটি নির্মাণ করে উচ্চশিক্ষাদানে এক বিশিষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করেন। নৃসিংহবাবুর সংগঠন প্রতিভার শ্রেষ্ঠতম নিদর্শন নূতন কোন্নগর মিউনিসিপ্যালিটির প্রতিষ্ঠা ও নিজস্ব বাসভবন নির্মাণ, হোল্ডিং সমূহের বিজ্ঞানসম্মত বিন্যাসে এবং এক শিশু প্রতিষ্ঠানকে স্বয়ম্ভর স্থায়ী প্রতিষ্ঠানের মর্যাদাদান। ১৯৮৩ সালে তাঁর জন্মগ্রহণের শতবার্ষিকী পালন করে কোন্নগরবাসীগণ তাঁর স্মৃতির প্রতি যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শন করেছে।

কোন্নগরে সমবায় আন্দোলনের ক্ষেত্রে যাঁরা সত্যচরণ মুখোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে সমবায় ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠায় বিশিষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করেন তাঁদের মধ্যে ললিতমোহন ঘোষাল, ইন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, উত্থানপদ মুখোপাধ্যায়, ননীগোপাল বসু, নলেন্দ্রনাথ ঘোষ, প্রফুল্লকুমার দেব ও বিনয়কুমার ঘোষের নাম উল্লেখযোগ্য।

কোন্নগরের সাংস্কৃতিক আন্দোলনে কোন্নগর পাঠচক্রের প্রশংসনীয় অবদান

অবশ্যই উল্লেখযোগ্য। মূলতঃ কাননবিহারী মুখোপাধ্যায়ের পরিকল্পনাপ্রসূত হলেও পাঠচক্রকে কেন্দ্র করে এক সাহিত্যানুরাগী যুবগোষ্ঠীর আন্তরিক প্রয়াসে যে সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল গড়ে ওঠে তাকে কোন্নগরের সাংস্কৃতির নবজাগরণ বলে অভিহিত করলেও অত্যুক্তি হবে না। সংস্কৃতিমূলক সভা সমিতির মাধ্যমে পাঠচক্র কোন্নগরে একমাত্র রবীন্দ্রনাথ ব্যতীত বাংলাদেশের প্রায় সমস্ত খ্যাতনামা সাহিত্যিক ও মনীষীকে কোন্নগরের মানুষের সঙ্গে পরিচয় স্থাপনে সমর্থ হয়েছিলেন। ১৯৩৩ সালের হুগলী জেলা সাহিত্য সম্মেলন অনুষ্ঠান পাঠচক্রের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ঘটনা—১৯৮১ সালে পাঠচক্রের সুবর্ণজয়ন্তী অনুষ্ঠানও পাঠচক্রের অনন্য কৃতিত্বের নিদর্শন।

এই ঐতিহ্যের ধারা অনুসরণ করেই কোন্নগরের উত্তরাঞ্চলের কয়েকজন কিশোর ও যুবক ১৯৩৬ সালে কোন্নগর আইডিয়াল সোসাইটি স্থাপনে উৎসাহিত হয়। অবশ্য কোন্নগর আইডিয়াল সোসাইটির উদ্যোক্তারা কর্মধারাকে সাংস্কৃতিক কার্যকলাপের মধ্যে সীমাবদ্ধ করে না রেখে সমাজ সেবার ক্ষেত্রেও প্রসারিত করেছেন। সম্পূর্ণরূপে সোসাইটির কর্তৃত্বাধীনে পরিচালিত সমবায় বিভাগটি সম্ভবতঃ সমগ্র পশ্চিমবঙ্গে সমবায় পদ্ধতিতে পরিচালিত একমাত্র বেসরকারী প্রতিষ্ঠান।

সূচনার সময় অবসরকালীন সমবয়স্ক বন্ধুবর্গের সহিত সংযোগ স্থাপন ও ভাবের আদান-প্রদানের কথা চিন্তা করা হলেও সেই সংযোগের ক্ষেত্রকে প্রসারিত করে সোসাইটির সভ্যগণ সমাজ সেবার যে উল্লেখনীয় আদর্শ স্থাপন করেছেন তা অকুণ্ঠ প্রশংসার দাবী রাখে। বিশেষতঃ দীর্ঘ ৬০ বৎসরকাল ধরে ঐকান্তিক নিষ্ঠা সহকারে সমাজসেবার এই আদর্শকে সঞ্জীবিত রাখার বিরল দৃষ্টান্ত শুধু কোন্নগরেই কেন নিকটবর্তী অঞ্চলেও বিশেষ লক্ষ্যণীয় নয়। আইডিয়াল সোসাইটির কর্মধারার বিশদ পরিচয় কর্মকর্তাগণ তাঁদের সুবর্ণ জয়ন্তী উৎসবের বিবরণীতে বিস্তৃতভাবে বিজ্ঞাপিত করবেন। তবে যেগুলি বিশেষ উল্লেখ করা প্রয়োজন তা হল সভ্যগণের প্রবর্তিত আভ্যন্তরীণ ক্রীড়া প্রতিযোগিতার মধ্যে তাস, দাবা এবং ক্যারম খেলা ব্যতীত বহিরঙ্গীয় ক্রীড়ানুষ্ঠানের সূত্রে জেলাভিত্তিক বিভিন্ন ক্রীড়া প্রতিযোগিতার মধ্যে দৌড়, লম্ফন (দীর্ঘ এবং উচ্চ), আলু লইয়া দৌড়, দাঁড় টানাটানি, দ্রুত অঙ্ক কষা প্রতিযোগিতায় বালক ও বালিকাগণের যোগদানের অধিকার। তাছাড়া কোন্নগরের এক অঞ্চল হইতে অন্য অঞ্চল পর্যন্ত একটানা দৌড় প্রভৃতির বাৎসরিক অনুষ্ঠান উল্লেখযোগ্য। কয়েক বৎসর চলার পর আঞ্চলিক দৌড় প্রতিযোগিতা ব্যতীত অন্যান্যগুলি বর্তমানে পরিত্যক্ত।

সোসাইটির কার্যধারার দ্বিতীয় উল্লেখযোগ্য ঘটনা হল—নিজস্ব সমবায় বিপণির মাধ্যমে ন্যায্য মূল্যে ভোগ্য পণ্য সরবরাহ। বিপণিটির বৈশিষ্ট্য

হল এই যে তাহা সম্পূর্ণরূপে সোসাইটির নিজস্ব কর্তৃত্বে সভ্যগণের নিকট হইতে সংগৃহীত মূলধনে স্বেচ্ছাশ্রমের মাধ্যমে সমবায় প্রথায় পরিচালিত। সরকারী সমবায় বিভাগের সহিত বিপণিটির সংযোগ না থাকায় এবং কোনও বেতনভুক কর্মচারীর ব্যয় বহন করার দায়িত্ব না থাকায় এ ক্ষেত্রে ক্ষয়ক্ষতির প্রশ্ন অবান্তর। তবে একাধিকবার চুরি ডাকাতির ফলে এই বিপণিটিকে কিছুটা অসুবিধার সম্মুখীন হতে হলেও সোসাইটির স্থায়িত্ব তাতে কোনক্রমে বিঘ্নিত হয় নি। এই বৎসর সমবায় বিভাগের সুবর্ণ জয়ন্তী উৎসব পালিত হবে।

সাংস্কৃতিক বিভাগের মাধ্যমে সভ্যগণ প্রতি বৎসর একটি নাটক অভিনয় করে স্থানীয় অধিবাসীগণকে আনন্দ উপভোগের সুযোগ দান করে থাকেন। তবে সাংস্কৃতিক বিভাগের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য অবদান হল একটি মাসিকপত্র পরিচালনা করে স্থানীয় কিশোয়-কিশোরী তথা তরুণগণের সাহিত্য প্রতিভার উন্মেষের সুযোগ দান। অবশ্য স্থানীয় বয়স্ক ব্যক্তিগণের এই পত্রিকায় রচনা প্রকাশ করার পক্ষে কোন বাধা ছিল না।

পত্রিকাটিতে স্থানীয় সংবাদ বিশেষতঃ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান তথা পৌর প্রতিষ্ঠানের ইতিহাসের উপর দায়িত্বপূর্ণ ব্যক্তিগণ কর্তৃক ধারাবাহিকভাবে প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। নবীন ও প্রবীণ নাগরিকগণ কোন্নগরের বর্তমান ও প্রাচীন ইতিহাসের উপর আলোকপাত করে তথ্যপূর্ণ প্রবন্ধ প্রকাশ করেছেন। তাছাড়া গল্প উপন্যাস নাটক কবিতা সাহিত্য বিষয়ক প্রবন্ধ এবং পত্রের মাধ্যমে স্থানীয় সমস্যা বিষয়ক আলোচনাও নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হয়েছে। এইসব রচনার মাধ্যমে স্থানীয় কিশোর ও তরুণগণ তাঁদের সাহিত্য প্রতিভা বিকাশের যে সহজ সুযোগ লাভ করেছেন সেকথা উল্লেখ করা বাহুল্যমাত্র। পত্রিকাটি বন্ধ হয়ে গেলেও এই ছয় বছরে কোন্নগরের ইতিহাসের উপর যে সকল মূল্যবান তথ্য সম্বলিত প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে কোন্নগরের ভবিষ্যদ্-বংশীয়গণের নিকট তা অমূল্য সম্পদরূপে নিঃসন্দেহে পরিগণিত হবে।

দীর্ঘ ষাট বৎসবকাল প্রতিষ্ঠানকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত ও সঞ্জীবিত রাখার গুরু দায়িত্ব কৃতিত্ব সহকারে পালন করার জন্য সোসাইটির সভাবৃন্দ শুধু ধন্যবাদই নয় অভিনন্দন লাভেরও যে দাবী করতে পারেন সে কথা উল্লেখ করা বাহুল্য মাত্র।

আমার সুনিশ্চিত ধারণা কোন্নগর আইডিয়াল সোসাইটির সভ্যবৃন্দ তাঁদের এই প্রশংসনীয় কৃতিত্বের জন্য কোন্নগরের ইতিহাসে এক গুরুত্বপূর্ণ স্থানের অধিকার লাভ করবে। কোন্নগরবাসীর পক্ষ থেকে আমি এই প্রতিষ্ঠানটির উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি, সাফল্য ও অখণ্ড পরমায়ু কামনা করি।

কোন্নগর সংস্কৃতিচর্চার ইতিহাস ও পাঠচক্রের অবদান

মুদ্রিত পুস্তকের বিচারে কোন্নগরে সংস্কৃতিচর্চার সর্বপ্রথম নিদর্শন পাওয়া যায় ১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দে। ঐ বৎসর কোন্নগর ধর্মসভার মুখপত্র ধর্মমর্ম প্রকাশিকা প্রকাশিত হয়। ঐ সভার সভাপতি ছিলেন মহামহোপাধ্যায় দীনবন্ধু ন্যায়রত্ন ; সম্পাদক ছিলেন গিরীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

১৮৫১ সালে চন্দ্রশেখর দেবের সম্পাদকতায় প্রকাশিত হয় 'জ্ঞানোদয়' নামে এক শিশু মাসিক—বাংলা ভাষায় ইহাই সম্ভবতঃ প্রথম শিশু মাসিকপত্র। ১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দে কোন্নগর নিবাসী শঙ্কর দাস গুরুদক্ষিণা নামে এক কাব্যগ্রন্থ প্রকাশ করেন।

১৮৫৭ সালে যদুগোপাল চট্টোপাধ্যায় রচিত 'চপলা চিত্ত চাপল্য' নাটক প্রকাশিত হয়। তাঁহার রচিত অপর দুইখানি গদ্যগ্রন্থের নাম সেক্সপিয়রের গল্প ও হতভাগ্য মুরাদ। অতঃপর তিনি কয়েক বৎসর পর পর পদ্য পাঠ প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় ভাগ রচনা ও প্রকাশ করেন : যদুগোপালের কবিতার স্বচ্ছতা ঋজুতা ও শব্দ নির্বাচনচাতুর্য তাঁর রচনা-শৈলীর বৈশিষ্ট্য। কবি হিসাবে সমসাময়িককালে যদুগোপালের প্রতিষ্ঠা অনস্বীকার্য। ১৮৫৮ সালে সংস্কৃত কলেজে পঠদ্দশায় শশীভূষণ চট্টোপাধ্যায় ভারতবর্ষের বিশেষ বিবরণ নামে এক ভূগোল পুস্তক রচনা করেন। শিক্ষা বিভাগের অনুমোদন লাভের ফলে বইটি বিদ্যালয়ের পাঠ্যরূপে নির্দিষ্ট হয়। ২১ বছর বয়সে তিনি ভূগোল পরিচয় রচনা ও ভারতবর্ষের মানচিত্র প্রস্তুত করেন। ভারতীয়দের মধ্যে তিনিই প্রথম ভূগোলক (Globe) নির্মাণ করেন এবং এফ আর জি এস ও এফ আর এস ও উপাধি লাভ করেন। তাঁহার রচিত পাঠ্যপুস্তকগুলির মধ্যে নব শিক্ষাপথ, শৈশব শিক্ষা (১ম-৪র্থ বর্ষ), শৈশব পাঠ (১ম-৫ম ভাগ), সচিত্র বর্ষ পাঠ, বাংলা অভিধান ও ব্যাকরণ শিক্ষা উল্লেখযোগ্য। তিনি 'সহচর' মাসিক পত্রের সম্পাদক ছিলেন। তাঁহার রচিত 'রামের রাজ্যাভিষেক' পুস্তকটি বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রশংসা লাভ করে।

১৮৬০ সালে "উত্তরপাড়া" নামক পাক্ষিক পত্রিকাটি বিজয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের সম্পাদকতায় কোন্নগর থেকে প্রকাশিত হয়।

১৮৬২ সালে মহাত্মা শিবচন্দ্র দেব শিশুপালন নামক পুস্তকের ১ম খণ্ড প্রকাশ করেন। পরে ২য় খণ্ডও প্রকাশিত হয়। শিবচন্দ্র রচিত আধ্যাত্ম বিজ্ঞান নামক পুস্তকটি ১৮৬৭ সালে প্রকাশিত হয়।

১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দে পাগলিনী নাটক রচনা ও অভিনয়ের সূত্রে ২০ বৎসর বয়সে অতুলকৃষ্ণ মিত্রের সাহিত্যজীবন শুরু হয়। ১৮৭৭-৮০ সালের মধ্যে তিনি একাধিক গীতিনাট্য রচনা করেন। সবগুলিই ন্যাশন্যাল থিয়েটারে অভিনীত হয়েছিল। তাঁর সাহিত্যকর্ম চলমান থাকাকালেই তিনি এমারেল্ড থিয়েটারে অভিনেতারূপে যোগদান করেন। এখানেও তাঁহার একাধিক নাটক অভিনীত হয়েছিল। কিছুকাল পরে তিনি ঐ থিয়েটারের ম্যানেজার নিযুক্ত হন। ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে সাপ্তাহিক বসুমতী প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি ঐ পত্রিকার পরিচালকের পদ লাভ করেন। নাট্যকার হিসাবে মিনার্ভা ও কোহিনূর থিয়েটারের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ ছিল। তাঁর রচিত নাটকের সংখ্যা ৪০। নাটকগুলির মধ্যে প্রভাস, বিজয়া, আদর্শ সতী, ধর্মবীর হিন্দা হাফেজ, আমোদ প্রমোদ, নন্দ বিদায়, লুলিয়া প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। তাঁর রচিত সব নাটকই বিভিন্ন থিয়েটারে অভিনীত হয়েছিল। তাঁর রচিত একমাত্র উপন্যাসের নাম চিত্রশালা। তাছাড়া তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের কপালকুণ্ডলা ও দেবী চৌধুরাণী উপন্যাস দুটির নাট্যরূপ দান করেন।

১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দে কোন্নগর নিবাসী চুণিলাল মিত্র (সন্ন্যাস গ্রহণের পর মূল চৈতন্য ভারতী) 'বেদান্তদর্শন সোপান' নামে এক দর্শন বিষয়ক গ্রন্থ প্রকাশ করেন।

১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে কোন্নগর উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষকের পদে অধিষ্ঠিত থাকার সময় নিত্যকৃষ্ণ বসু এম. এ. মহাশয় সুরেশচন্দ্র সমাজপতি সম্পাদিত সাহিত্য মাসিকপত্রে ধারাবাহিকভাবে 'সাহিত্য সেবকের ডায়েরী' নামে সমালোচনামূলক প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। মায়াবিনী কাব্য, প্রেমের পরীক্ষা নাটক ও ভবানী নামে গল্পগ্রন্থও তাঁর রচিত। তৎকালীন সাহিত্য জগতে সাহিত্যিকরূপে তিনি সুপরিচিত ছিলেন।

১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে ডাঃ শ্রীনাথ ঘোষ এম. বি. বৈজ্ঞানিক হিন্দুধর্ম ১ম খণ্ড নামে গ্রন্থটি প্রকাশ করেন। কয়েক বৎসর পরে ঐ গ্রন্থের ২য় ও ৩য় খণ্ড দুইটিও প্রকাশিত হয়। ডাঃ ঘোষ চাকুরী ব্যপদেশে মধ্যপ্রদেশে পান্না রাজ্যে বহুদিন বাস করেন—বাংলা দেশে প্রত্যাবর্তনের পর তিনি যশোর জেলার গ্রামাঞ্চলে চিকিৎসা ব্যবসায়ে নিযুক্ত থাকেন। বৃদ্ধ বয়সে কোন্নগরে প্রত্যাবর্তনের পর এখানেই তাঁর দেহাবসান ঘটে। তিন খণ্ডে প্রকাশিত বৈজ্ঞানিক হিন্দুধর্ম তাঁর সাহিত্য সাধনার একমাত্র পরিচয়। বইগুলিতে তৎকালীন হিন্দুসমাজের রক্ষণশীল মনোবৃত্তিসূচক চিন্তাধারা সুপরিস্ফুট।

১৯০৯ সালে কপালিনী নাটক রচনা ও ফ্রেণ্ডস ড্রামাটিক ইউনিয়নের সভ্যগণ কর্তৃক ঐ নাটকের অভিনয়ের সূত্রে মহেন্দ্রনাথ মিত্র কোন্নগরবাসীগণের নিকট সুপরিচিত হন। ইতিপূর্বে কবিরূপেই তিনি সুনাম অর্জন

করেন। তাঁর রচিত বহু কবিতা, নব্যভারত, নবজীবন, পন্থা প্রভৃতি মাসিক-পত্রে প্রকাশিত হয়েছিল। চণ্ডীর পদ্যানুবাদ তাঁর রচিত একমাত্র কাব্যগ্রন্থ।

১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দে কোন্নগর উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষক যতীন্দ্রনাথ রায় সহযোগী শিক্ষক কালিকুমার মিত্রের সহিত যুগ্মভাবে 'গান্ধীজীর পত্র' নামে মহাত্মাজীর কয়েকটি ইংরাজী ভাষায় লিখিত পত্রের বঙ্গানুবাদ গ্রন্থাকারে প্রকাশ করেন। ১৯২৬ সালে উভয়ে সম্মিলিতভাবে রাধারমণ কথামৃত নামে এক সুখ্যাত বৈষ্ণব সাধকের উপদেশাবলী প্রকাশ করেন। তাঁরা উভয়েই বিশেষতঃ শ্রীরায় পাঠচক্র আহূত বহু সভার আলোচনায় সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেন। প্রকাশ কালিকুমার মিত্র প্রথম কয়েক বৎসর পাঠচক্রের সভাপতি ছিলেন। Study Circle নাম পরিবর্তন করিয়া পাঠচক্র নামকরণ যতীন্দ্র-নাথের প্রস্তাব ক্রমেই হয়েছিল।

১৯২৩-২৪ সালে প্রকাশিত ঝড়ের ফুল ও ছিন্ন তার নামক উপন্যাস দুইটির মাধ্যমে নির্মল দেবের সাহিত্য প্রতিভার বিশিষ্ট পরিচয় সূচিত। ঝড়ের ফুল উপন্যাসটি কথাশিল্পী শরৎচন্দ্রের প্রশংসা লাভ করে। তাছাড়া একাধিক পত্র-পত্রিকায় তাঁর লেখা প্রবন্ধ ও কবিতা প্রকাশিত হয়েছে। ১৯৪৬ সালে পাঠচক্রের এক সভায় তিনি নজরুল সাহিত্য বিষয়ে এক প্রবন্ধ পাঠ করেন। প্রবন্ধটি কোন্নগর প্রকাশিকায় মুদ্রিত হয়। পাঠচক্রের সহিত নির্মলবাবুর যোগাযোগ ছিল।

১৯২৬ সালে প্রকাশিত 'পারের গান' নামক পুস্তকটি কোন্নগর রাজরাজেশ্বরীতলার ঘোষাল বংশের সন্তান কিশোরীমোহন ঘোষালের রচিত প্রথম কাব্যগ্রন্থ। শ্রীঘোষাল মহাশয়ের সাহিত্যচর্চা শুরু হয় বর্তমান শতাব্দীর সূচনাতেই। সেই সময়েই সহপাঠী বন্ধু নৃসিংহদাস বসু, রাধিকানাথ বসু ও প্রতিবেশী গজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহায়তায় তাঁরা একটি হাতে লেখা পত্রিকা প্রকাশ করেন। ঐ পত্রিকায় গল্প, প্রবন্ধ ও উপন্যাস প্রভৃতি প্রকাশিত হত। ৩।৪ বছর চলার পর পত্রটির প্রকাশ বন্ধ হয়। পরবর্তীকালে তিনি 'অভিযাত্রী' ও 'সাগরিকা' নামে দুইখানি কাব্যগ্রন্থ প্রকাশ করেন। ১৯৪৯ সালে প্রকাশিত 'পূর্ণাহুতি' নাটক তাঁর শেষ মুদ্রিত রচনা। কিশোরীবাবু পাঠচক্রের বহু আলোচনা সভায় সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন এবং একাধিক সভায় সভাপতির পদ অলংকৃত করেন।

১৯৩৫-৩৬ (বাংলা ১৩৪৩-৪৪) সালে মাসিক বসুমতী পত্রিকায় উপেন্দ্রনাথ জ্যোতীরত্ন মহাশয় হুগলী জেলার ইতিহাস বিষয়ে ধারাবাহিক ভাবে ১৫।১৬টি প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। প্রবন্ধগুলিতে হুগলী জেলার ভাগীরথী তীরবর্তী অঞ্চলসমূহ সম্বন্ধে বহু মূল্যবান তথ্য সংকলিত আছে।

১৯৫১ সালে প্রকাশিত সংক্ষিপ্ত মহাভারত গ্রন্থটি বিপিনবিহারী চন্দ্র

মহাশয়ের সাহিত্য সাধনার বিশিষ্ট পরিচয়। চাকুরীরত অবস্থায় তিনি কোন্নগরের সমাজজীবনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত ছিলেন। অবসর জীবনে পাটনায় থাকাকালেও কোন্নগরের সহিত তাঁর মানসিক যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয় নি। গ্রামের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে ও প্রতিষ্ঠানে আর্থিক সাহায্যদানে তিনি কখনও কার্পণ্য প্রকাশ করেন নি। প্রাচীন কোন্নগর সম্বন্ধে তাঁর লেখা বহু তথ্য প্রকাশিকার বিভিন্ন সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছে। তাঁর রচিত একাধিক কবিতাও প্রকাশিকায় স্থান লাভ করেছে। পাঠচক্রের সহিতও বিপিনবাবুর যোগাযোগ ছিল।

১৯৬৮ সালে প্রকাশিত দিব্য জীবন প্রথম ভাগ শ্যামাচরণ চট্টোপাধ্যায় রচিত প্রথম মুদ্রিত গ্রন্থ। গ্রন্থটিতে শ্রীঅরবিন্দের **Life Divine**-এর মর্মানুবাদ প্রকাশিত হয়েছে। অন্তঃপর তিনি দিব্যজীবন দ্বিতীয় ভাগ ও যোগসমন্বয় নামক গ্রন্থ দুইটিও প্রকাশ করেন। ছাত্রজীবন থেকেই শ্যামাচরণ পাঠচক্রের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন। কোন্নগরে থাকাকালে তিনি পাঠচক্রের সভায় নিয়মিতভাবে যোগ দিতেন এবং একাধিক সভায় বিভিন্ন বিষয়ে প্রবন্ধ পাঠ করেছেন। চাকুরী জীবনে পাঠচক্রের সহিত বাস্তব যোগাযোগ ছিন্ন হলেও পাঠচক্রের প্রতি তাঁর অনুরাগের কোন ব্যতিক্রম ঘটে নি। উত্তরজীবনে তিনি শ্রীঅরবিন্দের দার্শনিক চিন্তাধারার প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হন ও শ্রীঅরবিন্দের বিশিষ্ট ভক্তমণ্ডলীর অন্যতমরূপে পরিগণিত হন। তাঁর লেখা অরবিন্দ দর্শন বিষয়ে তিনখানি গ্রন্থ তাঁর অরবিন্দের প্রতি অনুরাগের প্রকৃষ্ট পরিচয়।

১৯৩০ সালে কোন্নগর ক্লাইপার রোড নিবাসী কালিচরণ মিত্র 'আনন্দ-প্রসাদ' নামে একটি গ্রন্থ প্রকাশ করেন। গ্রন্থটিতে অনুলোম বিলোম তত্ত্ব নামক হিন্দুধর্মের জটিল দার্শনিক তত্ত্বসমূহ আলোচিত হয়েছে।

এই প্রসঙ্গে কোন্নগরবাসিনী দুইজন নারী-সাহিত্যিকের সাহিত্য প্রচেষ্টার কথার উল্লেখ না করলে স্থানীয় নারী সমাজের প্রতি সুবিচার করা হবে না।

শ্রীমতী হেমলতা সেন সাংসারিক জীবনে কোন্নগরের উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষক রজনীকান্ত সেন মহাশয়ের পত্নীরূপেই পরিচিত। তিনি 'পদ্যমালিকা' নামে এক কবিতা পুস্তক প্রকাশ করেন। ঐ পুস্তকে সন্নিবিষ্ট একাধিক কবিতা তাঁর কবিতা রচনা শক্তির স্বাক্ষর বহন করে।

শ্রীমতী কৃষ্ণবিনোদিনী মিত্র সাংসারিক জীবনে জি. টি. রোড নিবাসী পরলোকগত নিবারণচন্দ্র মিত্রের সহধর্মিণী। পিতৃপরিচয়ে তিনি গৌড়ীয় মঠের প্রতিষ্ঠাতা ভক্তিবিনোদ সরস্বতীর কন্যা। তাঁহার লিখিত একাধিক কবিতায় ভক্তিভাবের নিদর্শন সুপ্রকাশ। পারিবারিক ঘটনার স্মৃতিসূচক কয়েকটি কবিতাও সুলিখিত।

কোন্নগর গ্রামের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য যাঁহারা সংস্কৃতিচর্চায় অংশগ্রহণ করেছেন তাঁদের রচনা অনেক ক্ষেত্রেই ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত—কারো কারো প্রচেষ্টা অনুবাদের মধ্যে সীমাবন্ধ। কাহারো রচনা স্থানীয় পত্র-পত্রিকায় প্রবন্ধরূপে প্রকাশিত অথবা সংস্কৃত ভাষায় রচিত--কিংবা অন্য কোন কারণে যাঁদের রচনার মৌলিকতার দাবী স্বীকৃত তাঁদের সাহিত্য সাধনার ইতিহাসও এখানে সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করা হল। এই সকল সাহিত্যিকগণের মধ্যে শিশিরকুমার মিত্র ও হরিসত্য ভট্টাচার্যের সাহিত্য সাধনায় কৃতিত্বের দাবী অনস্বীকার্য।

শিশিরকুমার মিত্রের সমস্ত রচনাই ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত। ভারতীয় সংস্কৃতি ও ইতিহাস বিষয়ে প্রবন্ধ রচনা করে তিনি বিশেষজ্ঞ মহলে প্রশংসিত হন। ফরোয়ার্ড, মডার্ন রিভিয়ু ও বোম্বাইয়ের একাধিক পত্র-পত্রিকায় তাঁর ভারতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিষয়ক প্রবন্ধ প্রকাশিত। তাঁহার রচিত অনেক গ্রন্থই আন্তর্জাতিক খ্যাতি অর্জনে সমর্থ হয়েছে এবং বিদেশীয় প্রকাশকের দ্বারা প্রচারিত হয়েছে। শিক্ষকরূপে প্রথমে তিনি শান্তিনিকেতন এবং পরবর্তীকালে পণ্ডিচেরীর শ্রীঅরবিন্দ আশ্রমের সহিত যুক্ত ছিলেন। তাঁহার রচিত The Liberator ও Sri Aurobinda and the New world গ্রন্থ দুটিতে শ্রীঅরবিন্দের জীবন ও দর্শন সম্বন্ধে বহু মূল্যবান তথ্য পরিবেশিত হয়েছে।

হরিসত্য ভট্টাচার্য জৈন দর্শন সম্বন্ধে গবেষণা করে কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয় থেকে পি এইচ ডি উপাধিলাভ করেন। তিনি জিনবাণী নামক মাসিকপত্রের সম্পাদক ছিলেন। পাঠচক্রের সভায় জৈনধর্ম সম্বন্ধে তিনি ভাষণ দেন। শিবচন্দ্র দেবের দৌহিত্র অতুলচন্দ্র ঘোষ রচিত মাইকেলের Captive Lady ও জয়দেবের প্রসন্ন রাঘবের বঙ্গানুবাদ উল্লেখযোগ্য। নৃসিংহ দাস বসু মহাশয়ের পরিচয় প্রধানতঃ সমাজসেবী ও আইনজ্ঞ রূপে। ইংরেজী ভাষায় রচিত তাঁর আইন গ্রন্থগুলি বিশেষজ্ঞমহলে সমাদৃত। নিম্বার্ক সম্প্রদায়ের শিবপুর মঠ থেকে প্রকাশিত বঙ্গভাষায় রচিত শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থের তিনি অন্যতম টীকাকার ছিলেন।

নির্মলানন্দ স্বামী (পূর্বাশ্রমে যজ্ঞেশ্বর ভট্টাচার্য) কোন্নগরবাসীগণের নিকট শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত, বৈদান্তিক সন্ন্যাসী ও ওঙ্কারমঠের প্রতিষ্ঠাতা রূপেই পরিচিত। সংস্কৃত ভাষায় রচিত তাঁর স্তোত্র রত্নমালা, তত্ত্বসার সন্দর্ভ ও আগম তন্ত্রসার সন্দর্ভ নামক গ্রন্থগুলি উল্লেখযোগ্য।

ডাঃ ত্রৈলোক্যনাথ মিত্র একজন প্রখ্যাত আইনজ্ঞ ও কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের প্রথম ডিন। ডাঃ মিত্র কর্তৃক ইংরেজী ভাষায় রচিত হিন্দু বিধবাগণের 'দায়াধিকার' নামক পুস্তকটি আইনজ্ঞ মহলে প্রামাণ্য গ্রন্থরূপে

স্বীকৃত। রায়বাহাদুর রাধিকানাথ বসু একজন বিশিষ্ট শিক্ষাব্রতীরূপে পরিচিত। শ্রীবসু কর্তৃক ইংরেজী ভাষায় রচিত Rhetoric & Prosody গ্রন্থখানি ছাত্র ও শিক্ষকমহলে অপরিহার্য বলিয়া বিবেচিত।

সিদ্ধিমোহন মিত্র সাংবাদিক রূপেই পরিচিত। তিনি আরবী ও ফারসী ভাষায় বিশেষ অভিজ্ঞ ছিলেন। সাংবাদিকরূপে তিনি ১০ বৎসরকাল Deccan Post-এর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। ১৯০৫ সাল হইতে তিনি ইংলণ্ডে স্থায়ীভাবে বাস করেন এবং বিদেশেই তাঁর দেহাবসান ঘটে। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ সম্পাদিত ফরোয়ার্ড পত্রে তাঁর একাধিক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে।

নবগোপাল মিত্র, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের অনুরাগী শিষ্য এবং সর্বপ্রকার জাতীয় চেতনার প্রবক্তা, হিন্দুমেলার উদ্যোক্তা ও দেশপ্রেমের উদ্দীপকরূপে পরিচিত হলেও তাঁর সাহিত্য কর্মের নিদর্শন হিসাবে ন্যাশন্যাল পেপার নামক ইংরেজী দৈনিকের সম্পাদকতা অবশ্যই উল্লেখের দাবী রাখে।

দিগম্বর মিত্রের রচিত কোন গ্রন্থের পরিচয় পাওয়া না গেলেও তিনি ইংরেজী ভাষায় একাধিক প্রতিবেদন রচনা করেছেন। ফিবার কমিশনের একমাত্র সদস্যরূপে তিনি ইংরাজী ভাষায় দীর্ঘ বিবরণী রচনা করেন। ননীগোপাল বসু কোন্নগরের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি সম্বন্ধে বহু জ্ঞাতব্য তথ্য বাংলা ভাষার মাধ্যমে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিকা মাসিকপত্রে প্রকাশ করেন।

রায়সাহেব জ্যোতিষচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় কোন্নগর উচ্চ বিদ্যালয়ের শত-বার্ষিকী উৎসবকালে প্রকাশিত স্মারক গ্রন্থে বিদ্যালয় সম্বন্ধে বহু মূল্যবান তথ্য প্রকাশ করেন। স্মরণিকায় প্রকাশিত তারাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়ের জীবনীটি রায়সাহেব গাঙ্গুলীর রচনা।

বিখ্যাত বিপ্লবী সংস্থা যুগান্তর দলের মুখপত্র 'যুগান্তর' পত্রের সম্পাদক বারীন্দ্রনাথ গ্রেপ্তার হওয়ায় এবং রাজরোষে পত্রিকাটির প্রকাশ বন্ধ হওয়ায় যুবক ইন্দ্রনাথ চক্রবর্তী ও অক্ষয়কুমার মুখোপাধ্যায় ঐ সময় ঐ পত্রটি সংক্ষিপ্ত আকারে দীর্ঘকাল গোপনে কোন্নগর শ্রীনাথ নিবাসের সরস্বতী প্রেসে মুদ্রিত করে প্রকাশ করেন। গোয়েন্দা বিভাগ বহু চেষ্টা করেও প্রকাশের সূত্রটি আবিষ্কার করতে সক্ষম হয় নি। পরবর্তীকালে ইন্দ্রনাথ চক্রবর্তী দীর্ঘকাল পাঠচক্রের সভাপতি পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন এবং পাঠচক্রের একাধিক সভায় স্বরচিত কবিতা পাঠ করেন। শ্রীচক্রবর্তীর প্রথম পুত্র অকাল প্রয়াত রবীন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর একাধিক কবিতা কোন্নগর প্রকাশিকা, ভারতবর্ষ ও বিচিত্রায় প্রকাশিত হয়েছে। পেশায় উকীল হলেও স্বর্গীয় কালীপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় সঙ্গীতজ্ঞরূপে সুপরিচিত ছিলেন। তাঁর রচিত একাধিক অপেরা সঙ্গীতের কথা গ্রামবৃদ্ধগণ এখনও প্রশংসা সহকারে উল্লেখ করেন।

কোন্নগরে সাংবাদিকতা, সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক চিন্তাধারার প্রচারকার্যে

কোন্নগর আইডিয়াল সোসাইটি কর্তৃক প্রকাশিত "প্রকাশিকা" নামক মাসিক পত্রিকাটির গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা অনস্বীকার্য। কোন্নগরে পাঠচক্রের আদর্শে অনুপ্রাণিত তৎকালীন তরুণ তথা বয়স্ক সাহিত্যিক গোষ্ঠীর প্রায় প্রত্যেকেই এই পত্রিকার মাধ্যমে সাহিত্যচর্চার সুযোগ লাভ করেন। পাঠচক্রের কেহ কেহ নিয়মিতভাবে অন্যেরা প্রায়শই এই পত্রিকায় রচনা প্রকাশ করে তাদের সাহিত্যিক প্রতিভা বিকাশের পথ উন্মুক্ত করেন। পাঠচক্রের পৃষ্ঠায় প্রকাশিত সংবাদ, স্থানীয় ঘটনার বিবরণ কোন্নগর সম্বন্ধে বিবিধ জ্ঞাতব্য তথ্যসমূহ কোন্নগরের ভবিষ্যৎ ইতিহাস রচনায় মূল্যবান উপকরণ হিসাবে নিঃসন্দেহে ব্যবহৃত হবার গৌরব অর্জনের দাবি রাখে। ছয় বৎসর (১৯৪৮-৫৩) প্রকাশের পর পত্রিকাটি বন্ধ হওয়ার ফলে কোন্নগরের সাংস্কৃতিক ও নাগরিক জীবনের অপূরণীয় ক্ষতি সাধিত হয়েছে। বহির্জগতের সহিত কোন্নগরের পরিচয়ের সূত্র হিসাবে এই ধরনের একটি মাসিক পত্রের প্রকাশ বর্তমানে অপরিহার্য। পত্রিকাটির প্রথম প্রকাশের সময় পাঠচক্রের বিশিষ্ট সভ্য শ্রীযুক্ত অধীরকুমার মুখোপাধ্যায় পত্রিকাটির সম্পাদক ছিলেন তাঁহার বিদেশগমনের পরবর্তীকালে শ্রীগোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁহার স্থলাভিষিক্ত হন।

পাঠচক্রের অন্যতম সদস্য শ্রীসন্তোষকুমার মিত্রের সম্পাদকতায় কোন্নগর থেকে প্রকাশিত হুগলী মাসিক পত্রটি কয়েক সংখ্যা প্রকাশের পর বন্ধ হয়ে যায়। পাঠচক্রের সম্পাদক শ্রীপ্রভাসলাল দাসের সম্পাদনায় কোন্নগর থেকে একটি সাহিত্যপত্রিকা প্রকাশিত হয়। পাঠচক্রের শ্রীরাসবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায় এর প্রকাশক।

সাধারণ গ্রন্থাগার পরিচালনায় সভ্যগণের যোগদান নিঃসন্দেহে পাঠচক্রের ইতিহাসের এক গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়। ঐ সময়ের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ঘটনা পাঠচক্রের সভ্যগণের উদ্যোগে ১৯৩৫ সালে গ্রন্থাগারের শিশু বিভাগের প্রতিষ্ঠা এবং পরিচালনার সম্পূর্ণ দায়িত্ব গ্রহণ। শিশুবিভাগটি তৎকালীন ভারতবর্ষের শিশু গ্রন্থাগার-সমূহের মধ্যে দ্বিতীয় স্থানাধিকারের যোগ্যতা অর্জন করে। বার্সিলোনায় অনুষ্ঠিত গ্রন্থাগার সম্মিলনে মুনীন্দ্রদেব রায় মহাশয় গ্রন্থাগারটির সপ্রশংস উল্লেখ করেন। বিভাগটি রবীন্দ্রনাথের আশীর্বাদধন্য। গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষের অনুমতিক্রমে গ্রন্থাগার ভবনে পাঠচক্রের কার্যালয় স্থাপিত হয় এবং প্রতি শুক্রবার রাত্রে গ্রন্থাগার ভবনে কয়েক বৎসর ধরে পাঠচক্রের সাহিত্য আলোচনার আসর অনুষ্ঠিত হয়।

মূলতঃ সাংস্কৃতিক সমিতিরূপে প্রতিষ্ঠিত হলেও পাঠচক্রের সভ্যগণের কার্যকলাপ সমাজ জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে সম্প্রসারিত হওয়ার ফলে পাঠচক্রের সভ্যগণ স্থানীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নাট্যানুষ্ঠান, সমবায় ব্যাঙ্ক, পৌরসভা ও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান প্রভৃতির পরিচালনায় গুরুত্বপূর্ণ স্থান গ্রহণ করে

গ্রামের সামগ্রিক উন্নয়নে বিশিষ্ট ভূমিকায় অবতীর্ণ হন।

কলিকাতা সাহিত্যিকার প্রতিষ্ঠায় এবং ঐ সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের পরিচালন সমিতির পদাধিকারীরূপে পরলোকগত ইন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, শ্রীঅনিলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, শ্রীকাননবিহারী মুখোপাধ্যায় ও শ্রীমুরারিমোহন মিত্র প্রভৃতির সক্রিয় ভূমিকা অনস্বীকার্য। প্রতিষ্ঠানটির কার্যকলাপ এখনও নিয়মিতভাবে অনুষ্ঠিত হচ্ছে।

নিখিল ভারত বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের মত সর্বভারতীয় সাংস্কৃতিক সংস্থায়ও পাঠচক্রের সভ্যগণ বিশিষ্ট ভূমিকা গ্রহণের নিদর্শন স্বরূপ গত ১৯৮০ সালের মার্চ মাসে কোন্নগর উচ্চবিদ্যালয়ে ঐ সংস্থার দুইদিনব্যাপী সাফল্যজনক আঞ্চলিক সম্মেলনের অধিবেশন সম্ভব হয়েছিল।

বস্তুতঃ কোন্নগর পাঠচক্রকে মাত্র একটি সংস্কৃতিচর্চার কেন্দ্ররূপে গণ্য করলে তার প্রতি সুবিচার করা হবে না। পাঠচক্র একটি গোষ্ঠী বা সম্প্রদায় যার কর্মধারা কোন্নগরের সমাজ জীবনের সঙ্গে তো বটেই এমনকি পশ্চিমবঙ্গের তথা ভারতবর্ষের সাংস্কৃতিক ও জনকল্যাণমূলক প্রচেষ্টার সঙ্গে আত্মিক সংযোগের দাবী রাখে। সেই কর্মধারাকে অব্যাহত রাখার প্রয়োজনীয়তাকে অগ্রাধিকার দেওয়ার উদ্দেশ্যেই পাঠচক্রের কয়েকজন সভ্য বয়সের হিসাবে জীবনের ছয়দশক অতিক্রম করেও সুবর্ণজয়ন্তী অনুষ্ঠানকে পাঠচক্রের আদর্শের প্রতীকরূপে গ্রহণ করেন এবং তাদের সমগ্র শক্তি প্রভাব ও পরিশ্রম সেই উদ্দেশ্যে নিয়োজিত করেন। ফলে অনুষ্ঠানটি যে সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়েছে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই তথাপি এ কথা অনস্বীকার্য যে পাঠচক্রের আদর্শের প্রতি কোন্নগরের সমাজসেবায় উদ্বুদ্ধ তরুণ সম্প্রদায়কে যথেষ্ট পরিমাণে আকৃষ্ট করার মধ্যেই নিহিত রয়েছে সুবর্ণজয়ন্তী অনুষ্ঠানের প্রকৃত সার্থকতা।

কোন্নগর মাতৃসদন ও শিশুমঙ্গল প্রতিষ্ঠান

১৯৫৭ সালের ২৬শে জানুয়ারী প্রতিষ্ঠানটি শুরু হয়। প্রথমে হাতিরকুলে স্বর্গত নন্দদুলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ীর একতলায় তদানীন্তন স্বাস্থ্যমন্ত্রী ৺ডাঃ অমূল্যধন মুখোপাধ্যায় মাতৃসদনের দ্বার উদ্ঘাটন করেন এবং ঐ দিনই সি. এস. মুখার্জী ষ্ট্রীটে ৺পীতাম্বর চট্টোপাধ্যায় মহাশয়

প্রদত্ত জমির উপর মাতৃসদনের নিজস্ব ভবনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। ১৯৬০ সালের ১২ই জুন মাতৃসদনের নূতন ভবনের দ্বারোদ্ঘাটন করেন তৎকালীন স্বাস্থ্যমন্ত্রী অনাথবন্ধু রায়। সভাপতিত্ব করেন ৺নৃসিংহদাস বসু। সাধারণের দানে পুষ্ট হলেও বিপিন মুখার্জী ট্রাষ্ট ফাণ্ড, চারুদুর্গা ট্রাষ্ট ফাণ্ড, হরিপ্রসাদ মেমোরিয়াল ট্রাষ্ট ফাণ্ড নিয়মিতভাবে বার্ষিক অনুদান দিয়ে থাকেন। ইংলণ্ড প্রবাসী ভবেশ ব্যানার্জীর এককালীন দানও (২·৩০ লক্ষ) হাসপাতালের উন্নয়নে যথেষ্ট সহায়ক হয়। কোন্নগর আরবন ডেভেলপমেণ্ট রিলিফ অর্গানাইজেশনের সঙ্গে চুক্তিমত হরিপ্রসাদ মেমোরিয়াল মেডিক্যাল ওয়ার্ডে এখনও ঐ ওয়ার্ডে রোগীভর্তি শুরু হয় নি। বর্তমানে এখানে প্রসূতি, হার্ট, চর্ম, দন্ত, প্যাথলজি, ই. সি. জি. প্রভৃতির কাজ চালু আছে। প্রসূতি বিভাগে ৫টি কেবিন সহ ৪০টি ও চক্ষু বিভাগে ১০টি শয্যা আছে। প্রাথমিক চিকিৎসা বিভাগ সারা দিনরাত নাগরিকদের সেবায় নিয়োজিত।

অবকাশ যাপন ও জনসেবা

বয়স্ক মানুষের পক্ষে অবকাশ যাপন শরীর ও মনের ক্রিয়াকলাপের যথাসম্ভব নিষ্কৃতির প্রয়াস যে সর্বক্ষেত্রেই এক লক্ষ্যণীয় প্রবণতা।

আমাদের ছেলেবেলায় আমাদের পিতৃপিতামহ প্রভৃতির পক্ষে ছুটির দিন ছাড়া হালকাভাবে অবকাশ যাপন করার কথা প্রায় অচিন্ত্যনীয় ছিল।

তাঁদের অধিকাংশই প্রায় নাওয়া খাওয়া করে ৮/৯টার মধ্যে অফিসে কাজে বেরিয়ে যেতেন—ফিরতে রাত্রি ৮টা/৯টা হয়ে যেত—সুতরাং তাঁদের পক্ষে শারীরিক ক্লান্তি দূর করার পর রাত্রির আহার শেষ করে শয্যাগ্রহণ করার মধ্যে অবকাশ যাপনের সুযোগ অল্পই থাকত।

যাঁদের তাস, পাশা, দাবা খেলার নেশা থাকত কয়েকজন বন্ধুবান্ধব মিলে দু আড়াই ঘণ্টা খেলা করে সময় কাটিয়ে বাড়ী ফিরতেন।

গ্রামের উত্তর মধ্য ও দক্ষিণাঞ্চলে দু তিনটে থিয়েটার ক্লাব ছিল। থিয়েটায়ের নেশা যাঁদের ছিল তাঁরা ক্লাবে গিয়ে অভিনয়ের মহড়া দিতেন বাকী সকলেই খাওয়া সেরে শয্যা আশ্রয় করতেন।

পরবর্তীকালে অফিসে কাজের সময় প্রায় নির্দিষ্ট করা হয়েছিল।

কার্যকাল প্রায় সকাল ১০টায় শুরু হয়ে ৬টার মধ্যে সীমিত করা হয়। ফলে কেরাণীরা ৭টা-৭-৩০ মিনিটের মধ্যে বাড়ী ফিরতে পারতেন। খাওয়া সেরে ক্লাবে গিয়ে অবসর বিনোদনের সুযোগ পেতেন।

তবে এই অবকাশকে সমাজ সেবামূলক কাজে অথবা সংস্কৃতিচর্চার কাজে নিয়োগ করার প্রয়াস তেমনভাবে দানা বেঁধে উঠতে কিছুটা সময় লাগার কথা।

এই সংস্কৃতিচর্চার ক্ষেত্রে পাঠচক্রের প্রতিষ্ঠা এক উল্লেখযোগ্য ঘটনা। নিয়মিতভাবে সাহিত্য চর্চা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, নববর্ষ উৎসব, শিবচন্দ্রের জন্মদিন উপলক্ষ্যে সভা সমিতির অনুষ্ঠান—প্রয়াত মনীষীগণের জন্মদিবসের অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে পাঠচক্রের উদ্যোগে সভা অনুষ্ঠিত হত।

পাঠচক্রের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের অবিস্মরণীয় কীর্তি হল হুগলী জেলা সাহিত্য সম্মিলন অনষ্ঠান।

ঐ সভায় শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেন। তাছাড়া রবীন্দ্রনাথ ছাড়া তৎকালীন বাঙলাদেশের প্রায় সব উল্লেখযোগ্য সাহিত্যিকই যোগদান করেন।

প্রায় ৭৫ বছর আগে কোন্নগরের জনসংখ্যা পাঁচ হাজারের বেশী ছিল না। পাড়ার মধ্যে বাড়ীর সংখ্যা যা ছিল—তার সব ঘর ব্যবহারের প্রয়োজন হত না। ঐ সব অব্যবহৃত ঘরে পাড়ার যুবকেরা বসে তাস, পাশা, দাবা খেলা ছাড়া, অভিনয়ের মহড়া দিত। কোথাও বা ক্যারম কিংবা লুডো খেলাও চলত। এ হল বড়দের কথা। ছোট ছেলেরা স্কুল থেকে ফিরে জলখাবার পর —ফাঁকা জায়গায় চু কপাটি, গাদি অথবা ডাণ্ডাগুলিও খেলত। টেনিস বল নিয়ে ফুটবল খেলাও চলত।

যারা পড়াশুনা করতে ভালবাসত তারা একটা আলমারী যোগাড় করে নিজের প্রাইজের বই এবং অভিভাবকের কাছ থেকে কিছু অর্থ সংগ্রহ করে লাইব্রেরী তৈরী করত। বিকালে সেখানে বসে পড়াশুনা, গল্পগুজব ও আলোচনা করত।

ফুটবলের মরসুমে ফুটবল খেলা হত পাড়ার ফাঁকা জমিতে,—তখনকার দিনে পাড়ার মধ্যে এ ধরনের ফাঁকা জমির অভাব হত না।

স্কুলের ছেলেদের পক্ষে তার চেয়ে বেশী করা সম্ভব হত না। স্কুলের গণ্ডী পেরিয়ে তাদের একদল হয়ত ফুটবল ক্লাবে যোগ দিত—আর একদল ব্যায়াম সমিতি স্থাপন করে ব্যায়াম চর্চা অথাৎ ডম্বল মুগুর ভাঁজত, ডন বৈঠক করে স্বাস্থ্যোন্নতির ব্যবস্থা করত।

এইভাবেই পরবর্তীকালে গড়ে উঠেছিল স্বাস্থ্য কুটীর মধ্য কোন্নগরের চড়কতলায়, শক্তি সঙ্ঘ দক্ষিণপাড়ায় এবং উত্তরাঞ্চলে কিশোর ব্যায়াম প্রতিষ্ঠান।

পরবর্তীকালে কোন্নগরের বিভিন্ন জায়গায় একাধিক ব্যায়াম প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়েছে। তার মধ্যে মনসাতলা ব্যায়াম সমিতি, সপ্তর্ষি ব্যায়াম মন্দির, নবারুণ সমিতির নাম করা যেতে পারে। রাজরাজেশ্বরীতলার ছেলেরা রাজরাজেশ্বরীর মাঠে খেলাধূলা করত। আর তাদের সঙ্ঘের নাম দেয় রাজরাজেশ্বরী যুব সমিতি।

সংস্কৃতি অনুরাগী ছেলেরা সাহিত্যচর্চায় আগ্রহ প্রকাশ করে যেসব সমিতি প্রতিষ্ঠা করে তার মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য প্রতিষ্ঠান হল কোন্নগর পাঠচক্র। এ সম্পর্কে ইতিপূর্বেই আলোচনা করা হয়েছে।

সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান হিসাবে কোন্নগর আইডিয়াল সোসাইটির অবদান সপ্রশংস উল্লেখের দাবী রাখে। এই সমিতির অবিস্মরণীয় কীর্তি হল কোন্নগর প্রকাশিকা নামে এক মাসিক পত্রের প্রকাশ। ৬ বছর প্রকাশের পর (১৩৫২-৫৭ সাল) ঐ পত্রিকার প্রকাশ বন্ধ হয়ে যায়।

এই সমিতির আর এক উল্লেখযোগ্য অবদান হল সমবায় সমিতি স্থাপন করে ন্যায্য মূল্যে ষ্টেশনারী দ্রব্য এবং কাপড় জামা বিক্রয়ের ব্যবস্থা করা। তাঁরা সুষ্ঠুভাবে এই কার্য এখনও পর্যন্ত সম্পন্ন করে চলেছে। তাঁরা প্রতিযোগিতামূলক ক্রীড়া অনুষ্ঠানেরও ব্যবস্থা করেছিলেন—তার মধ্যে আন্তঃ কোন্নগর দৌড় প্রতিযোগিতা এখনও প্রতি বৎসর অনুষ্ঠিত হচ্ছে।

বর্তমানে কোন্নগরের লোকসংখ্যা ৭০ হাজারের মত। সুতরাং প্রতি পাড়ায় একাধিক সমিতিও স্থাপিত হয়েছে। ঐ সব সমিতির সভ্যেরা অবসর সময়ে ঘরের মধ্যে বসে খেলাধূলা করা ছাড়া সংস্কৃতিচর্চা করলেও তাদের অবসর সময় শুধু বিনোদনের মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে কিছুটা সমাজ সেবার মধ্যে প্রসারিত করার আগ্রহে জাগো বিদ্যালয়ের ছাত্রদের মধ্যে আবৃত্তি, সঙ্গীত, অঙ্কন প্রভৃতি প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করেছে। যদিও এ ধরনের প্রতিযোগিতা কোন্নগরের একাধিক প্রতিষ্ঠান তাদের সংস্কৃতির অঙ্গ হিসাবে গ্রহণ করেছে। তা হলেও কোন্নগর বিশালক্ষ্মী-সড়কে 'জাগো' কালচারাল ইউনিট এ বৎসর থেকে এই ধরনের প্রতিযোগিতার মাধ্যমে স্থানীয় বালক বালিকাদের উৎসাহিত করার যে প্রয়াস গ্রহণ করেছে তার জন্য ঐ সমিতির সভ্যেরা কোন্নগরের গ্রামবাসীগণের কাছ থেকে সাধুবাদ, কৃতজ্ঞতা ও অভিনন্দন লাভে যে সমর্থ হবে সে বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ। আমি তাদের এই প্রচেষ্টার সর্বাঙ্গীণ সাফল্য কামনা করি।

কোন্নগর ওলিম্পিক ইনষ্টিটিউট

বর্তমানে যেখানে ওলিম্পিক মাঠ, আগে ঐ জায়গাটার নাম ছিল পাত্রবাগান। পাত্রবাগান স্পোর্টিং ক্লাব ও ওলিম্পিক ক্লাবের একত্রীকরণের পর এর নূতন নাম হয় 'কোন্নগর ওলিম্পিক ইনষ্টিটিউট'। সেটা ১৮৯৪ সাল। ৺বিপিনবিহারী মুখোপাধ্যায়-এর বদান্যতায় ও ইচ্ছানুসারে এখন মাঠটির নাম 'ডাঃ বঙ্কিম ময়দান'। ঘোষ পরিবারের (৺রঞ্জিত ঘোষ) বদান্যতায় এখানে গড়ে উঠেছে একটা 'শিশু উদ্যান'। বর্তমানে জমির পরিমাণে কমবেশী এগার বিঘা। সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণের জন্য ১৩ জনকে নিয়ে একটা **Trustee Board** গঠন হয়েছে।

১৮৯৪ সালে প্রতিষ্ঠিত হলেও খেলার বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায় না। তবে ১৯৩০ সাল থেকে ক্লাবে খেলাধূলার প্রাণচাঞ্চল্য দেখা যায়। তখন 'কোন্নগর ক্রিকেট ক্লাব' আলাদা সংস্থা ছিল। এই সংস্থাটি ১৯৪৬-৪৭ সালে ওলিম্পিক ইনষ্টিটিউটের ক্রিকেট বিভাগে পরিণত হয়। ১৯৩৬ সালে হকি বিভাগ প্রবর্তিত হয়। ১৯৬৩ সালে টেনিস বিভাগ খোলা হলেও খেলোয়াড়ের অভাবে ও আর্থিক অপ্রতুলতায় বন্ধ হয়ে যায়।

এছাড়াও রায়সাহেব ডি. কে. মুখার্জীর পরিচালনায় কয়েক বছর বেশ উদ্দীপনার সঙ্গে চারুকলার প্রদর্শনীর ব্যবস্থা হয়েছিল।

মাঠটি তিনদিকে ঘেরা। এর মধ্যে ক্লাবহাউস আছে। এই ইনষ্টিটিউটের বিভিন্ন খেলোয়াড় কলিকাতার নামী ক্লাবে খেলে প্রশংসা লাভ করেছে।

ফ্রেণ্ডস ইউনিয়ন ক্লাব

আগে যে জায়গাটিকে রায়বাগান বলা হত, সেখানেই ফ্রেণ্ডস ইউনিয়ন ক্লাবের অবস্থান। স্থাপিত হয় ১৯০৪ সালে। জায়গাটা ছোট হওয়াতে একটা পুরো খেলার মাঠ করা সম্ভব ছিল না। আশপাশের লোকেরা ছেলেদের খেলায় উৎসাহ দেখে জমি দান করাতে মাঠটি খেলার উপযুক্ত করা হয়। ক্লাবের উন্নতির জন্য ছেলেরা বার্ষিক যাত্রা অভিনয়ের আয়োজন করে টাকা জোগাড় করতে এবং জমি কিনতে এখনও সচেষ্ট। ফুটবলের সঙ্গে এঁরা ক্রিকেট ও হকি বিভাগ খোলেন। ১৯৪৭ সালে ক্লাব টেণ্ট গঠন করেন। ছেলেদের উদ্যোগ প্রশংসনীয়। এই ক্লাবের অনেক খেলোয়াড় কলিকাতার নামী ক্লাবে খেলে কোন্নগরের সুনাম বজায় রয়েছে। আশা করা যায় প্ল্যাটিনাম উৎসব করার পর শতবার্ষিকী উৎসব পালন করতে সক্ষম হবেন।

কোরাপুটে সমবায় চিন্তা

সমবায়ের সংজ্ঞা নিয়ে যথেষ্ট মতভেদ আছে। তবে রবীন্দ্রনাথকে অনুসরণ করে বলা চলে যে মানুষের মধ্যে যে ঐক্যমূলক মহা সত্য আছে সমবায় হল তার বাহ্য-প্রকাশ। পরিপূর্ণ মনুষ্যত্বের সাধনাই হল সমবায়ের লক্ষ্য। সভ্যতার আরণ্যক পর্বে অরণ্যজাত ফলমূল খেয়ে অথবা পশু শিকার করে মানুষ ব্যক্তিগত ভাবে তার ক্ষুন্নিবৃত্তি সাধন করেছে; কৃষিবিদ্যা আয়ত্ত হলে বহুলোকের অন্ন উৎপাদনে বহুলোকের সমবেত শ্রমের প্রয়োজন অনুভূত হল। বহুলোক একত্রিত হয়ে গড়ে তুলল জনপদ। এই বহুলোকের মিলনেই মানবের সত্য, এই মিলনেই তার সভ্যতা।

অন্ন সাধনার ক্ষেত্রে কৃষিবিদ্যা যেমন মানুষকে ব্যক্তিগত খণ্ডতার থেকে বৃহৎ সম্মিলিত সমাজের ঐক্যে প্রতিষ্ঠিত করেছে—ধর্ম সাধনার ক্ষেত্রে ব্রহ্মবিদ্যা ও তেমনি আত্মায় আত্মায় এবং আত্মায় পরমাত্মায় মিলনের সুগভীর ও সুবিস্তীর্ণ ঐক্যবোধের সন্ধান দিয়েছে।

জীব সৃষ্টির ব্যাপারে যে মতবাদ এক সময় সাধারণ মানুষের ধারণায় তথা বৈজ্ঞানিক মহলে সুপ্রচলিত ছিল তাহলে জীবের স্বতন্ত্র সৃষ্টি। ডারউইনের আবিষ্কার যখন জীবে জীবে ঐক্যবোধের সন্ধান দিলে সেই সত্যের আলোকে জীবে জীবে তথা জড়ে জীবের ঐক্যবুদ্ধির পথ অবারিত হয়ে দেখা দিল।

জ্ঞানের এবং ধর্মের সাধনায় এই ঐক্যবোধ স্বীকৃতি লাভ করলে ও বিশ্ব-ব্যাপারের সবক্ষেত্রে এই মহাসত্য প্রতিষ্ঠা লাভ করেনি। আর্থিক ও রাষ্ট্রের প্রতিযোগিতায় এই মহাসত্য প্রায় সর্বত্র অস্বীকৃত হয়েছে। সত্য বিচ্যুত মানুষ কি বঞ্চনা ও ধ্বংসের মুখে তার সভ্যতাকে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে—জগৎ জুড়ে প্রায় সর্বত্রই তার নিদর্শন কি আমরা প্রতিদিন চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি না?

বিপুল সম্পদ ও সমৃদ্ধির অধিকারী কয়েকটি বৃহৎ রাষ্ট্রের পক্ষে এই ধ্বংসের বিলাসিতা সম্ভব হলেও বিশ্বের দরিদ্র মানব সমাজ এই মনোবৃত্তিকে কখনই প্রশ্রয় দিতে পারেনি। আত্মরক্ষার প্রয়োজনে ক্ষুদ্র স্বার্থবুদ্ধিকে বিসর্জন দিয়ে পরস্পর মিলিত হয়ে দরিদ্র মানবগোষ্ঠীকে মহতী বিনষ্টির হাত থেকে রক্ষা পেতে হয়েছে।

ঐক্যবোধের এই মহৎ প্রয়াস আমরা দেখেছি ডেনমার্কের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দুগ্ধ ব্যবসায়ীর মধ্যে। স্বল্পবিত্ত দুগ্ধ ব্যবসায়ীগণের পক্ষে অধিক সংখ্যায়

গোপালন এক লাভজনক ভাবে দুগ্ধজাত দ্রব্য উৎপাদন ও বিক্রয় অসুবিধাকর হওয়ায় তাঁরা সমবেত ভাবে দুগ্ধ ব্যবসায়ের সংকল্প করেন এবং প্রত্যেকের নিকট থেকে সাধ্যানুযায়ী মূলধন সংগ্রহ করে সমবায়মূলক দুগ্ধ প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন। মূলধনের সাহায্যে সংগৃহীত অর্থে দুগ্ধ রক্ষার উপযোগী গৃহ নির্মাণ ও যন্ত্র ক্রয় করে দুগ্ধজাত পণ্য উৎপাদনের ব্যবস্থা দ্বারা তাঁরা ঐ সকল পণ্য বিদেশে রপ্তানি করতে থাকেন। লাভের পরিমাণ পর্যাপ্ত হওয়ায় পরিচালন ব্যয়ের অতিরিক্ত অর্থ পরস্পরের মধ্যে আনুপাতিক হারে বণ্টন করে তাঁর নিজেদের আর্থিক সঙ্গতির উল্লেখযোগ্য উন্নতি সাধন করেন।

সমবায় পদ্ধতির প্রয়োগ শুধু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী সমাজের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকেনি। ঊনবিংশ শতাব্দীর উত্তরার্ধে ইউরোপের একাধিক রাষ্ট্রে জীবন যাত্রার বিভিন্ন ক্ষেত্রে এই প্রচেষ্টার প্রয়োগ উল্লেখযোগ্য ভাবে প্রসার লাভ করে। জার্মানী, ফ্রান্স, ইটালী, ডেনমার্ক, হলাণ্ড, স্পেন, গ্রেট-ব্রিটেন ও আয়ারল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশে সমবায় প্রথার সার্থক প্রয়োগ এই প্রসঙ্গে বিশেষ-ভাবে স্মরণীয়। তবে এই পদ্ধতির প্রথম প্রয়োগের দাবী যে জার্মানীর প্রাপ্য সে কথা অনস্বীকার্য।

জার্মানীতে প্রায় একই সময়ে গ্রামাঞ্চলে কৃষিজীবীদের মধ্যে ও শহরাঞ্চলে অল্পবিত্ত শিল্পজীবী ও ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের মধ্যে এই পদ্ধতির সাফল্যজনক প্রয়োগের সূচনা হয়। (কারিগর সম্প্রদায়)

ইউরোপে, বিশেষতঃ জার্মানীতে এই পদ্ধতির সম্ভাবনা যাদের চিন্তায় প্রথম দেখা দিয়েছিল বাইফসেন ও সুলজ-ডেলিস নামক সেই দুই সমাজ হিতৈষীর অবদান সমবায় আন্দোলনের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকবে।

দুঃখের বিষয় ভারতবর্ষের মত দরিদ্র দেশে, যেখানে এই পদ্ধতির প্রয়োগ ছিল সমাজ কল্যাণের এক অপরিহার্য অঙ্গ সেখানে এই প্রেরণায় কোন সমাজহিতৈষীকে অগ্রণী হতে দেখা যায় নি, সরকারী মহলেই এই উদ্যোগের সূচনা। ঋণভার জর্জরিত কৃষি-জীবিদের উৎপাদন ব্যাপারে সাহায্য ও আর্থিক সঙ্গতির উন্নয়ন সাধনের উদ্দেশ্যে ১৯০৪ সালে কো-অপারেটিভ সোসাইটির আইন বিধিবদ্ধ করা হয়। মূলতঃ ঋণদানই ছিল এই সোসাইটি-গুলির উদ্দেশ্য ; ১৯১২ সালে এই আইনের সংশোধন করে অন্যান্য ক্ষেত্রেও সমবায় পদ্ধতির ব্যাপক প্রয়োগের পথ উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়।

প্রথম মহাযুদ্ধের পর মণ্টেগু চেমসফোর্ড সংস্কারের প্রবর্তনের ফলে সমবায় বিভাগটি প্রাদেশিক সরকারের আওতায় আসে এবং বাংলাদেশের একাধিক জেলায় বেসরকারী মহলে এই পদ্ধতির পরীক্ষা শুরু হয়। এই প্রসঙ্গে কোন্নগরে সমবায় প্রচেষ্টার ধারাবাহিক ইতিহাস যতটুকু সংগ্রহ করা সম্ভব হয়েছে তার পরিচয় এখানে দেওয়া হল।

পরিচয়পঞ্জীর মধ্যে কোন্নগর সমবায় ব্যাঙ্কের বিবরণ দেওয়া হয়নি। অন্যত্র সম্পাদকের বিবরণীর মধ্যে তার বিস্তৃত পরিচয় পাওয়া যাবে।

তবে হুগলী জেলা তথা পশ্চিমবাংলার ঋণদান সমিতিগুলির মধ্যে কোন্নগর সমবায় ব্যাংক যে সুষ্ঠু পরিচালনাগুণে উন্নয়নশীল ও আদর্শ প্রতিষ্ঠানরূপে পরিগণিত হবার দাবী রাখে সে কথা অস্বীকার করা যায় না। এই সমবায় ব্যাঙ্কের উপবিধি ও কার্যকরী নিয়মাবলীর মধ্যে এমন কতকগুলি রক্ষাকবচের ব্যবস্থা আছে যে কিছুটা সততার সঙ্গে পরিচালিত হলে ব্যাঙ্কের পক্ষে কোনদিন সহসা কোন সংকটের সম্মুখীন হতে হবে না। সুতরাং ব্যাঙ্কের প্রতিষ্ঠাতাগণের দূরদৃষ্টি ও কর্মকুশলতা অবশ্যই প্রশংসনীয়।

তাছাড়া সভ্যগণকে ঋণদান করার পরও আমানতী অর্থের উদ্বৃত্ত অংশ আরও লাভজনকভাবে নিয়োগ করার চিন্তা পরিচালকগণের সব সময় মনে থাকায় সংলগ্ন জমিতে একটি দ্বিতল গৃহ নির্মাণ করে কোন্নগর ডাকঘরকে এবং নিজস্ব ভবনের দ্বিতল ঘর নির্মাণ করে কর্মচারী রাজ্যবীমা কর্পোরেশনকে ভাড়া দিয়ে সুনিশ্চিত আয়ের পথ সুগম করা হয়েছে।

সম্প্রতি ঋণদানের ক্ষেত্র প্রসারিত করার উদ্দেশ্যে সভ্য ব্যতীত অন্যান্য ব্যক্তিবর্গকেও ঋণদানের ব্যবস্থা করা হয়েছে। ব্যক্তিগত জামিন ছাড়া সম্পত্তি, স্বর্ণালঙ্কার, কোম্পানীর কাগজ, শেয়ার প্রভৃতির কাগজ জমা রেখে ঋণদান করার উপযোগী আইনও পাশ করা হয়েছে। এর ফলাফল সম্বন্ধে বর্তমানে কোন মন্তব্য করা সম্ভব নয়।

তবে যে প্রতিষ্ঠান দীর্ঘ পঞ্চাশ বছর ধরে কোনরূপ সংকটের সম্মুখীন না হয়ে স্থানীয় জনসাধারণের সেবা করে এসেছে তার পক্ষে নূতনতর ক্ষেত্রে যথেষ্ট সতর্কতা সহকারে অর্থ বিনিয়োগেও লাভের সম্ভাবনা যে কিছুটা সুনিশ্চিত সে আশা অবশ্যই অমূলক নয়।

কোন্নগর কো-অপারেটিভ ষ্টোর ১নং

প্রথম মহাযুদ্ধের পর নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের অভাব ও অতিরিক্ত মূল্যস্ফীতির ফলে মধ্যবিত্ত চাকুরীজীবী সম্প্রদায় যে আর্থিক সংকটের সম্মুখীন হন স্থানীয় কয়েক ব্যক্তি সেই পরিস্থিতির মোকাবিলা করার উদ্দেশ্যে একটি কো-অপারেটিভ ষ্টোর স্থাপনের পরিকল্পনা করেন। ষ্টোর থেকে অল্প লাভে দ্রব্য সরবরাহ করে তাঁরা নিজেদেরকে তথা স্থানীয় জনসাধারণকে দ্রব্যাভাব ও অতিরিক্ত মূল্যস্ফীতির কবল থেকে অব্যাহতি দেওয়ার প্রয়াস করেন। উদ্যোক্তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন ৺শশিশেখর সরকার, ৺হরিসত্য মিত্র, ৺পরেশনাথ মিত্র, ৺সতীশচন্দ্র মিত্র, ৺জ্যোতিষচন্দ্র মিত্র, ৺ননীগোপাল বসু ও ৺বিপিনবিহারী চন্দ্র।

কোন্নগরের বাজার অঞ্চলে ৺রজনী মিত্রের একটি ঘর ভাড়া করে ১৯২০ সালে এই দোকানটি খোলা হয়। উদ্যোক্তাগণ প্রধানতঃ নিজেদের মধ্য থেকে এবং পরিচিত বন্ধুবান্ধবগণের কাছ থেকে মূলধন সংগ্রহ করেন। দোকান খোলার পর সভ্য সংখ্যা বাড়তে থাকে এবং ৺রজনী মিত্র ও শ্রীনির্মলচন্দ্র মিত্র প্রমুখ স্থানীয় ভদ্রব্যক্তিগণ পরিচালক মণ্ডলীর অন্তর্ভুক্ত হয়ে অবসর সময়ে হিসাব পত্রাদি দেখা এবং ক্রয় বিক্রয়ের তদারকীর ব্যবস্থা করতে থাকেন।

কিন্তু নিয়মিত ভাবে দোকান খোলা এবং বিক্রয়ের ভার বেতনভুক কর্মচারীদের উপর ন্যস্ত থাকে। ধারে বিক্রয়ের ব্যবস্থা থাকায় ক্রেতাগণের নিকট বহু টাকা অনাদায়ী পড়ে থাকে। তাছাড়া চুরি যাওয়ার ফলে বছর তিন চলার পর দোকানটি বন্ধ হয়ে যায়।

অসার্থক প্রয়াস হলেও প্রতিষ্ঠানটির উদ্যোক্তাগণ কোন্নগরে সমবায় পথিকৃৎরূপে অবশ্যই স্মরণীয়।

কোন্নগর কো-অপারেটিভ ষ্টোর ২নং

কোন্নগর দক্ষিণাঞ্চলের খেলাঘর নাট্যসমিতির সভ্যগণ ১৩৪৩ সালের গোড়ার দিকে বাজারে জিনিসপত্রের অগ্নিমূল্য তথা অভাবের কথা চিন্তা করিয়া একটি কোঅপারেটিভ ষ্টোর স্থাপন করে এই পরিস্থিতির সম্মুখীন হবার পরিকল্পনা করেন। কয়েকজন উৎসাহী সভ্য কোঅপারেটিভ আইনের বইপত্র সংগ্রহ করে অন্যান্য সভ্যদের সম্মতিক্রমে এ, এল ব্যানার্জী স্ট্রীটে শ্রীঅতুলকৃষ্ণ বসু মহাশয়ের বাড়ীর একখানি ঘরে ষ্টোরের কার্যালয় স্থাপন করেন। ৯ জন সভ্য নিয়ে যে প্রথম পরিচালক সমিতি গঠিত হয়। তার সম্পাদক ছিলেন শ্রীপ্রভাতকুমার রায় মিত্র।

ষ্টোরের কাজকর্ম বাড়ার জন্য কার্যালয় শ্রীঅরবিন্দ রোডে ৺শশাঙ্কমোহন করের পুরাতন বাটীর একটি বড় ঘরে স্থানান্তরিত করা হয়। কয়লা ও কাপড় বিক্রয়ের উপর সরকারী নিয়ন্ত্রণ বাঁধ প্রবর্তনের ফলে কো-অপারেটিভ প্রতিষ্ঠান সমূহকে প্রদত্ত সুযোগ গ্রহণ করিয়া ষ্টোরে কয়লা ও কাপড় বিক্রয়েরও ব্যবস্থা করা হয়। বস্ত্রাদি মজুত রাখার জন্য ষ্টোরের কার্যালয় সংলগ্ন ৺রাজকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়ের একটি ঘর ভাড়া নেওয়া হয়। ১৯৫০ সালে ষ্টোরের পরিচালক সমিতি পুনর্গঠিত হয় এবং মনোজকুমার বসু, দুর্গাপদ বসু ও মনীন্দ্রনাথ মিত্র যথাক্রমে সভাপতি, সম্পাদক ও কোষাধ্যক্ষ নির্বাচিত হন।

কার্যের পরিধি যথেষ্ট সম্প্রসারিত হলেও পরিচালনার অব্যবস্থার ফলে ষ্টোরের ক্ষতির পরিমাণ ক্রমশই বেড়ে যেতে থাকে। ১৯৫২ সালের হিসাব-পরীক্ষক প্রদত্ত বিবরণে লোকসানের পরিমাণ দেখে সাধারণ সভায় কয়েকজন

সভ্য ষ্টোরের আয়ব্যয়ের হিসাব পুনরায় পরীক্ষার প্রস্তাব করিলে যথেষ্ট তর্ক বিতর্কের উদ্ভব হয়। অল্প ভোটাধিক্যে প্রস্তাবটি নাকচ হইলে—কর্তৃপক্ষের প্রস্তাব অনুযায়ী ষ্টোরের ব্যবসায় সংক্রান্ত কাজকর্ম বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়।

কোন্নগর আইডিয়াল সোসাইটি

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় জিনিসপত্রের দাম অস্বাভাবিক বৃদ্ধি পাওয়াতে মূলতঃ সভ্যগণকে সুবিধা দেওয়ার জন্য ১৯৪৫ সালে 'মিউচুয়াল বেনিফিট ফাণ্ড' নামে সমবায় বিভাগ খোলে। এই বিভাগে কোন বেতনভুক কর্মচারী নেই। কেনা-বেচা সবই সভ্যেরাই করে থাকে। স্বল্পভাবে বিক্রয় করায় এই প্রতিষ্ঠানের প্রতি দিন দিন সকলের আগ্রহ বাড়তে থাকে। দিনে মাত্র অনধিক তিন ঘণ্টা খোলা হলেও ঐ সময়ের মধ্যেই ক্রেতারা তাঁদের জিনিসপত্র সংগ্রহ করেন। এর ফলে অল্পদিনের মধ্যেই সোসাইটি দ্বিতল বাটী তৈরী করতে সমর্থ হয়। তাই এই বাড়ীটির নাম দেওয়া হয়েছে "বেনিফিট হাউস"। লভ্যাংশ থেকে বিভিন্ন জনহিতকর প্রতিষ্ঠানে প্রতি বছর দান করা হয়। এছাড়াও 'Poor Fund' মারফৎ দরিদ্রদের চিকিৎসা বা বিবাহ প্রভৃতি ব্যাপারে দান করা হয়ে থাকে। এ বছর এঁরা ১এর পল্লী মণ্ডনির্মাণে ও মাতৃ-সদনে Free-bed দেওয়ার ব্যবস্থা করছেন। এছাড়াও বিশিষ্ট প্রয়াত সভ্য অজয়কুমার মুখোপাধ্যায়, সন্তোষকুমার দত্ত ও অনন্তকুমার মিত্রের স্মৃতিতে কোন্নগর সমবায় ব্যাঙ্কে তিনটি Endowment Fund এঁরা গঠন করেছেন। এই ফাণ্ডের অর্জিত সুদ থেকে স্থানীয় বিদ্যালয়গুলির মেধাবী ছেলেমেয়েদের উপযুক্ত বার্ষিক পুরস্কার দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে। এই বৎসর (১৯৯৫) এঁরা মহাসমারোহের সহিত সমবায় বিভাগের সুবর্ণ জয়ন্তী উৎসব পালন করছেন।

কোন্নগর স্বেচ্ছাসেবক-বাহিনী কনজিউমাস কো-অপারেটিভ ষ্টোর্স

প্রধানতঃ শক্তিচর্চা ও জনগণের সেবার উদ্দেশ্য নিয়ে ১৯৪১ সালে স্থানীয় কয়েকজন উৎসাহী যুবকের সম্মিলিত প্রচেষ্টার ফলে কোন্নগর স্বেচ্ছাসেবক-বাহিনী গঠিত হয়। কুখ্যাত লীগ শাসনের আমলে বাংলার শাসক গোষ্ঠীর পৃষ্ঠাপোষকতায় সারা দেশে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের আগুন যেভাবে ছড়িয়ে পড়ে তার ফলে লীগ বহির্ভূত বিভিন্ন সংখ্যা লঘু সম্প্রদায়ের জীবন ও সম্পত্তি বিনাশের সমূহ আশঙ্কা দেখা দেয়। সেই আসন্ন বিপদ থেকে জনগণকে রক্ষা, তাদের মনে সাহস সঞ্চার তথা সেবার উদ্দেশ্যেই এই সংগঠনের প্রতিষ্ঠা। বাহিনীর কার্যালয় স্থাপিত হয় গৌরধামে।

স্বাধীনোত্তর যুগে খণ্ডিত বঙ্গের পশ্চিম অঞ্চলে সেই প্রয়োজনের অবসান

ঘটার ফলে বাহিনী এখন মূলতঃ একটি সেবামূলক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে। ইতিপূর্বে বাহিনীর সভ্যবৃন্দ জনগণকে খাঁটি সরিষার তেল সরবরাহের উদ্দেশ্যে একটি ছোট তেল কলের প্রতিষ্ঠা করে। সেখানে বিদ্যুৎ চালিত ঘানির সাহায্যে তেল নিষ্কাষণ করা হত। ক্রমাগত লোকসানের ফলে, কয়েক বছর চলার পর প্রতিষ্ঠানটি বন্ধ হয়ে যায়।

কনজিউমার্স কো-অপারেটিভ ষ্টোর্স স্থাপনা এঁদের দ্বিতীয় উল্লেখযোগ্য সেবামূলক প্রচেষ্টা। ১৯৬৪ সালের ১১ই জানুয়ারী সভ্যগণ কর্তৃক বাহিনীর কো-অপারেটিভ ষ্টোর্স স্থাপনের পরিকল্পনা গৃহীত হয়। ঐ বছরেই প্রতিষ্ঠানটি কো-অপারেটিভ সোসাইটির আইন অনুযায়ী রেজিষ্টারী করা হয়। ১২ জন সভ্য নিয়ে যে পরিচালক সমিতি গঠিত হয় তার প্রথম সভাপতি ও সম্পাদক ছিলেন যথাক্রমে শ্রীশিশির ঘোষ (ছোট) ও শ্রীঅমল-কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। ৫০০০ টাকার মূলধন ৫০০টি ১০ টাকার শেয়ারে বিভক্ত করা হয়। ১৫ই সেপ্টেম্বরের সাধারণ সভায় শতকরা ৫ টাকা লভ্যাংশ ঘোষণা করা হয়।

যতদিন সভ্যগণের স্বেচ্ছাশ্রমে প্রতিষ্ঠানটি পরিচালিত হচ্ছিল ততদিন লোকসানের প্রশ্ন ছিল অবান্তর। কিন্তু বিভাগীয় ষ্টোর্স থেকে সরবরাহের অপ্রতুলতা অনিশ্চয়তার জন্য বাধ্য হয়ে সাধারণ বাজার থেকে মাল কিনে অন্যান্য ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করে বিক্রয় করার ফলে লাভের পরিমাণ অতি সামান্য হতে থাকে। সুতরাং প্রতিষ্ঠানটি সুষ্ঠুভাবে চালনা দুরূহ হয়ে পড়ে।

১৯৬৬ সালে দ্বিতীয়বার রেশন প্রথা প্রবর্তনের পর সভ্যগণ একটি রেশন দোকান নেওয়ার প্রস্তাব গ্রহণ করেন এবং মূলধন বাড়িয়ে ৬০,০০০০ টাকা করা হয়। এর মধ্যে ছিল ১০ টাকার A শ্রেণীর ৪০,০০০ শেয়ার এবং B শ্রেণীর ২০ টাকা ১০০০ শেয়ার। ১৯৬৬ সালের জুলাই মাসে রেশন দোকানটি খোলা হয়।

দোকানটির রেজিষ্টারী করা অফিসের ঠিকানা গৌরধামে হলেও বিক্রয় কেন্দ্র হল বর্তমানে ৭৩নং ক্রাইপার রোডের একটি বাড়ীতে। বাড়ীটির মালিক শ্রীমতী অপর্ণা ঘোষ।

সাধারণ বিভাগে বেতনভুক কর্মচারী নিয়োগ করে ও অন্যান্য খরচ চালিয়ে সোসাইটিকে প্রায় প্রতি বছর লোকসান করেই চালাতে হচ্ছে। এটা নিঃসন্দেহে চিন্তার বিষয়। অবশ্য রেশন বিভাগের লাভের থেকে সেই ক্ষতি পূরণ করা হলেও একক ভাবে কনসিউমার্স কো-অপারেটিভ সোসাইটির পরিচালনার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে জনসাধারণের মনে হতাশার সঞ্চার হওয়া যে অস্বাভাবিক নয় সে কথা উল্লেখ করা বাহুল্য মাত্র।

কোন্নগরে নাট্যচর্চার ঐতিহ্য

বৎসর তিনেক আগে সম্ভবতঃ ১৯৮৮ সালে কোন্নগর সাধারণ পাঠাগারের কর্মীদের বিশেষতঃ গ্রন্থাগারিক মহাশয়ের উদ্যোগে এবং স্থানীয় কয়েকজন নাট্যামোদী যুবকবৃন্দের সহায়তায় কোন্নগর উচ্চ বিদ্যালয়ের বিনোদ ভবনে ঔপন্যাসিক ৺তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'দুই পুরুষ' নাটকটি মঞ্চস্থ করা হয়।

তদুপলক্ষে, গ্রন্থাগারিকের অনুরোধে ধারাবাহিকভাবে কোন্নগরে নাট্য-চর্চার ইতিহাস বিষয়ে একটি প্রবন্ধ রচনা করি। প্রবন্ধটি তাঁহাদের স্মরণিকায় ছাপা হয়।

বর্তমানে আবার কোন্নগর জাগো কালচারাল ইউনিটের পক্ষ থেকে কোন্নগরে নাট্যচর্চা বিষয়ে রচনার অনুরোধ আসায় এই প্রবন্ধের অবতারণা এবং প্রবন্ধের নামেরও কিছুটা পরিবর্তন করা হয়েছে।

বলা বাহুল্য সময়াভাবে সবিস্তারে আলোচনা বর্তমানে সম্ভব নয়। তাই সংক্ষেপে যতদূর সম্ভব বিবৃত করার প্রয়াস করেছি।

কোন্নগরে নাট্যচর্চায় সঙ্ঘবদ্ধ প্রচেষ্টার সূচনা গত শতাব্দীর শেষ দশকে। মূলতঃ মধ্য কোন্নগরের মিত্র পরিবারের তৎকালীন যুবকবৃন্দই এই নাট্যাভিনয়ের উদ্যোক্তা। আবার এই সময়েই তাঁহাদের উদ্যোগেই "কোন্নগর অলিম্পিক ইনষ্টিটিউটের" স্থাপনা। মিত্র পরিবারের একাধিক যুবকই ছিলেন স্থানীয় "ডি ওয়ালডি" কোম্পানীর ভাঁটিখানার কর্মচারী। বসু উপাধিধারী মিত্র পরিবারের ভাগিনেয়গণও ডি ওয়ালডি কোম্পানীতে চাকুরি করিতেন। এঁরাই প্রতিষ্ঠা করেন ফ্রেণ্ডস ইউনিয়ন ড্রামাটিক ক্লাব। তাছাড়া ঐ অঞ্চলের মন্মথনাথ মিত্র (খুদিবাবু নামেই যিনি বিশেষ পরিচিত) এই 'ফ্রেণ্ডস ইউনিয়ন ড্রামাটিক ক্লাবের একজন বিশেষ উৎসাহদাতা ছিলেন।

অভিনেতাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ছিলেন প্রকাশচন্দ্র মুস্তাফী। যিনি পরবর্তীকালে কলিকাতার পেশাদারী দলে যোগদান করে অভিনয় পারদর্শিতা প্রদর্শন করে সুনাম অর্জন করেন। এই ক্লাবের অভিনয় কৃতিত্বের জন্য পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের একাধিক গ্রামেও অভিনয়ের আহ্বান আসিত। এই ক্লাবের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য অবদান হল কোন্নগর হিন্দু বালিকা বিদ্যালয়ের সম্প্রসারণ উপলক্ষ্যে নির্মলশিব বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'নবাবী আমল' নাটকের অভিনয়। পরবর্তীকালে মিত্রবংশীয় সন্তানগণ ও আত্মীয়বর্গ ফ্রেণ্ডস ড্রামাটিক ইউনিয়নের নাম নিয়ে অভিনয় করলেও তাঁদের অভিনয় সৌকর্য

পূর্ববর্তীকালের অভিনেতাগণের অভিনয় সৌকর্যের সমকক্ষ হতে পারেনি।

বর্তমান শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে প্রধানতঃ কালীপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে কোন্নগরের উত্তরাঞ্চলে এক অপেরা পার্টির স্থাপনা হয়। কালীপ্রসন্ন বাবু পাখোয়াজ প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্রের সহযোগে স্বরচিত একাধিক সঙ্গীত বাজাতে পারতেন। তাঁর নেতৃত্বে কোন্নগর বিশালক্ষ্মী সড়ক, থিয়েটার লেন ও হাতীরকুলের প্রৌঢ়বয়স্কেরা এক অপেরা দল স্থাপন করে বেলতলা বাড়ীতে "নল দময়ন্তী" পালাটি কৃতিত্বের সহিত অভিনয় করেন। অপেরা অভিনয় সাধারণতঃ দিনের বেলায় হত বলে আমরা বাল্য জীবনে অভিনয় দেখার সুযোগ লাভ করেছি। অভিনেতারা অধিকাংশই বেশ বয়স্ক ছিলেন। তবে কালীপ্রসন্ন বাবুর পরলোকগমনে ঐ দলের অস্তিত্ব বিলোপ পায়।

কয়েক বছর পর কোন্নগরের উত্তরাঞ্চলে 'বীণাপাণি ড্রামাটিক ক্লাবের' স্থাপনা হয় বর্তমান শতাব্দীর তৃতীয় দশকে। কর্ণধারগণের মধ্যে সুধীরকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, নির্মলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ও তুলসীচন্দ্র নাগের নাম উল্লেখ-যোগ্য। পরবর্তীকালে চতুর্থ দশকে নগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের (বন্দোবাবুর) নেতৃত্বে 'বীণাপাণি ড্রামাটিক ক্লাব' নব জীবন লাভ করে। এই ক্লাব একাধিক নাটক সাফল্যের সঙ্গে অভিনয় করেন।

কোন্নগরের দক্ষিণাঞ্চলে মূলতঃ ভবানীচরণ সেনগুপ্তের পরিচালনায় 'ভিলেজ রিক্রিয়েশন' নামে এক নাট্যসংস্থা গড়ে তোলেন বর্তমান শতাব্দীর শেষার্ধে। এই দলে সুবোধ চট্টোপাধ্যায়, সুবোধ মুখোপাধ্যায়, আদল বাদল চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। সুবোধ মুখোপাধ্যায় পরবর্তীকালে মঞ্চে ও পর্দায় অভিনয় করে সুনাম অর্জন করেন। আদল, বাদল ভ্রাতৃদ্বয় শিশির ভাদুড়ী সম্প্রদায়ের 'সীতা' নাটকে লব-কুশের ভূমিকায় কৃতিত্ব সহকারে অভিনয় করেন।

পরবর্তীকালে রাজরাজেশ্বরীতলায় 'রাজরাজেশ্বরী নাট্য সমিতি' স্থাপিত হয়েছে। এখানে সুখ্যাত অভিনেতা বিপিন মুখার্জী মহাশয়ের নাট্যাভিনয়ে হাতেখড়ি। নগেনবাবু (বন্দোবাবু)ও এই সমিতিতে অভিনয় করেন। হাতীরকুলে স্থাপিত হয় 'সয়েরী ক্লাব', চড়কতলায় 'মেরী ক্লাব', দক্ষিণপাড়ায় 'শান্তি সংঘের নাট্যবিভাগ', শম্ভু চ্যাটার্জী স্ট্রীটে 'কাদের ক্লাব', প্রসাদময়ী দেবী লেনে 'কোন্নগর ক্লাব', এবং জি. টি. রোডে 'কোন্নগর আইডিয়াল সোসাইটির নাট্য বিভাগ'। তবে এই সময়ের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ঘটনা হল কিশোর ব্যায়াম সমিতির 'নাট্য বিভাগ' স্থাপন। ক্লাবের সভ্যরা তো একাধিক নাটকে অভিনয় করেছেনই তবে এই সমিতির বিশেষ কৃতিত্ব হল নাট্য প্রতিযোগিতার অনুষ্ঠান। পূর্ণাঙ্গ নাটক ও একাঙ্ক নাটক উভয় ক্ষেত্রেই প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়েছিল। বিচারক হিসাবে স্থানীয় ও কলিকাতার

প্রখ্যাত অভিনেতাগণকে বিচারকরূপে আনা হয়েছিল। উদ্বোধক হিসাবে শিশির ভাদুড়ী স্থানীয় অভিনেতাদের অভিনয়ের প্রশংসা করেছিলেন। তবে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হল বিচারকরূপে আমন্ত্রিত প্রখ্যাত নাট্যকার মন্মথ রায় কর্তৃক বিপিন মুখার্জীকে 'নটশ্রী' উপাধি দান।

কোন্নগরে একাধিক যাত্রাদলও ছিল। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল হাতীরকুলে হরিদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে এবং ক্লাইপার রোডে ভূতনাথ পাত্রের নেতৃত্বে দুই যাত্রাদল। বর্তমানে প্রায় প্রতি পল্লীতে একাধিক নাট্যসমিতি স্থাপিত হয়েছে। স্বতন্ত্র এইসব নাট্যসমিতিগুলির উল্লেখ করা এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে সম্ভব না হওয়ায় আমি দুঃখিত। প্রতি বৎসর অন্ততঃ একবার নাট্যসমিতিগুলি অভিনয়ের উদ্দেশ্যে নিকটবর্তী অঞ্চলের কোন ফাঁকা জমি অথবা ফুটবল ক্লাবের মাঠে অথবা পার্কে অস্থায়ী অভিনয়োপযোগী ভবন নির্মাণ করে তাঁরা অভিনয় করেন। ফলে তাঁদের প্রচুর অর্থ ব্যয়ের সম্মুখীন হতে হয় —তাছাড়া অকাল বর্ষণে একাধিক ক্ষেত্রে অভিনয় স্থগিত রাখতে হয়েছে।

এই সমস্যার একমাত্র সমাধান হল স্থায়ী ভবন নির্মাণ, যেখানে স্থায়ী অভিনয়োপযোগী মঞ্চ ব্যতীত অন্ততঃ দেড় হাজার দর্শকের বসিবার উপযোগী আসন থাকিবে। নিকটবর্তী অঞ্চলের রিষড়া, শ্রীরামপুর প্রভৃতি স্থানে রবীন্দ্রভবন নির্মাণ করে এই সমস্যার সমাধান করা হয়েছে।

কোন্নগরেও অধুনালুপ্ত ফ্রেন্ডস ড্রামাটিক ক্লাবের অছি পরিষদের অন্যতম ভারপ্রাপ্ত সদস্য সত্যহরি রায়মিত্র মহাশয় ঐ ক্লাবের সংগৃহীত এক বিস্তীর্ণ জমি—স্থায়ী মঞ্চ ও ভবন নির্মাণের জন্য কোন্নগর পৌর কর্তৃপক্ষের হাতে সমর্পণ করেছেন। পৌর কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ঐ জমির সংস্কার সাধন করে একটি মঞ্চের পাটাতন পর্যন্ত নির্মাণ করেছেন এবং জমিটিও প্রাচীরের দ্বারা ঘিরে ফেলেছেন। তবে ভবন নির্মাণের কোন প্রয়াসের কথা তো এখন পর্যন্ত শোনা যায় না। কোন্নগরের যে সমস্ত নাট্যসমিতি প্রতি বৎসরের অভিনয় উপলক্ষ্যে অস্থায়ী প্যাণ্ডেল নির্মাণ ও প্রচুর অর্থ ব্যয় করে অভিনয় করে থাকেন তাঁরা যদি অন্ততঃ এক লক্ষ টাকা পৌর কর্তৃপক্ষের হাতে অর্পণ করেন তবে অদূর ভবিষ্যতে এই সমস্যার সমাধান হওয়ার সম্ভাবনা অনিশ্চিত না হতে পারে। আমার এই প্রস্তাবটি স্থানীয় নাট্য সমিতিগুলি গ্রহণযোগ্য কিনা বিবেচনা করে দেখতে পারেন।

কোন্নগর পরিক্রমা

এবার আমরা কোন্নগরের জি. টি. রোডের রাস্তার দুপাশে যা কিছু দেখবার এবং জানবার মত আছে তার সঙ্গে যতদূর সম্ভব পরিচয় করে নিই।

গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোডের উত্তর প্রান্ত থেকে বরাবর দক্ষিণ দিকে চলে আসা যাক। শহরের উত্তর সীমানায় অবস্থিত বাঘের খাল যার বর্তমান নাম রাইল্যাণ্ড চ্যানেল। বহু পূর্বে এসব অঞ্চল জঙ্গলে ভর্তি থাকায় সময়ে সময়ে এখানে ছোট জাতের বাঘের উপদ্রব ছিল—বাঘের বসতির সংলগ্ন খাল বলে এর নাম হয়েছিল বাঘের খাল।

দক্ষিণদিকে একটু এগোলেই রাস্তার পশ্চিমদিকে ফোর্ট উইলিয়াম কোম্পানীর ইস্পাতের দড়ির কারখানা প্রায় বছর তিরিশ হল কারখানাটি স্থাপিত হয়েছে। যে জমির উপর কারখানাটি গড়ে উঠেছে সেই জায়গা আগে ছিল এক বিস্তীর্ণ জলাভূমি—গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড থেকে রেল লাইন পর্যন্ত বিস্তৃত। নাম ছিল হিদের জলা—হৃদয় বলে কোন লোকের নাম অনুযায়ী। আগে এখানে ধান চাষ হত।

আর একটু এগোলেই আর একটি ছোট কারখানা নজরে পড়বে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় এখানে একটি দেশলাই তৈরীর কল ছিল—বৃদ্ধ লোকেরা এখনও এটাকে দেশলাইয়ের কলই বলে থাকে। সম্ভবতঃ বাংলায় এটা প্রথম দেশলাই কারখানা। কিছুদিন চলার পর কারখানাটি বন্ধ হয়ে যায়। পরে ঐ বাড়ীতে Techno Chemical নাম দিয়ে ঔষুধের কারখানা করা হয়। ঐ কারখানাও বেশী দিন চলে নি। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় এখানে দমকলের ঘাঁটি ছিল। এখন মাড়োয়ারী ফুলচাঁদ ভগতের ভাইয়েরা এখানে ছোট একটি তেলকল এবং কাপড়ের কল করেছিল। প্রায় সামনাসামনি রাস্তার পূর্বদিকে উত্তমানন্দ মাতৃ আশ্রম। এখানে আশ্রম প্রতিষ্ঠাত্রী ভীমা মায়ের স্বপ্নলব্ধ ধনকালীর মূর্তি স্থাপিত আছে। আশ্রমটি ১৯৩২-৩৩ সালে প্রতিষ্ঠিত—ভীমানদা ব্রহ্মচারিণী কর্তৃক। আশ্রমে স্থানীয় লোকেরও যথেষ্ট সাহায্য আছে। এখানে শুধু স্ত্রীলোকেরাই বাস করে। বছরে একবার কার্তিক মাসে গুরু উত্তমানন্দের জন্মতিথি উপলক্ষে উৎসব পালন করা হয়। আশ্রমের ঠিক দক্ষিণে বর্তমান দমকলের ঘাঁটি—৺অক্ষয় নন্দীর বাগান-বাড়ীতে। অক্ষয়বাবু কোন্নগর মাতৃসদনে ১০০০০ টাকা সাহায্য করেছেন। এর পরেই হাতীরকুলের স্নানের ঘাট—নাম নিশান ঘাট। কোন্নগরের জেলেরা বর্ষাকালে ইলিশ মাছ ধরার সময় নৌকায় এই ঘাট পর্যন্ত ভাঁটার সময় উজান

বেয়ে এসে ফিরে যেত বলে—এর নাম হয় নিশান ঘাট।

এই নিশান ঘাটের গায়েই ক্যানাল অয়েল মিল এখন বন্ধ আছে। প্রচুর জমি সহ বিরাট বাড়ী বর্তমানে পরিত্যক্ত। এই স্থানটির সঙ্গে অনেক ঐতিহাসিক স্মৃতি জড়িত। শ্রীরামপুর দিনেমারদের অধিকৃত থাকাকালে এখানে দিনেমারদের জাহাজ তৈরীর কারখানা বা ডক ছিল। তার চিহ্ন এখনও খুঁজলে পাওয়া যেতে পারে। আমাদের বাল্যকালে এখানে Bull কোম্পানীর ইঁটখোলা ছিল। তখনই দেখেছি ভাগীরথী নদীর থেকে একটি খাঁড়ি দিয়ে জোয়ারের জল ভিতরে প্রবেশ করে এক বিরাট পুকুরে গিয়ে পড়ত—সম্ভবতঃ জাহাজগুলিকেও তৈরী করার পর ঐ পথে নদীগর্ভে নিয়ে যাওয়া হত। পুকুরটি বুজিয়ে ছোট করা হলেও তার চিহ্ন এখনও বিলুপ্ত হয়নি।

অনেকদিন পড়ে থাকার পর ১৯৩০-৩১ সালে এখানে লোক গণনার অফিস খোলা হয়। কিছুকাল পরে বাটা কোম্পানী এখানেই প্রথম তাদের জুতার কারখানা খোলে, অবশ্য লোক গণনার অফিস খোলার আগে **Anderson Wright Company** এখানে হাতীরকুল অয়েল মিল নাম দিয়ে তেলের কল বসায়। কিছুদিন চলার পর ঐ কলও বন্ধ হয়ে যায়।

বাটা কোম্পানী এখান থেকে তাদের কারখানা নুঙ্গিতে সরিয়ে নিয়ে গেলে মাড়োয়ারী ফুলচাঁদ ভগৎ এখানে **Canal Oil Mill** নাম দিয়ে তেল কল বসিয়ে প্রায় কুড়ি বছর চালায়। এখন তেল কল বন্ধ হয়ে গেছে।

ক্যানাল অয়েল মিলের দক্ষিণে বিশালক্ষ্মী ঘাট। ঘাটের সামনে গঙ্গা-গর্ভে এক ঘূর্ণাবর্ত ছিল—নাম ছিল বিশালক্ষ্মীর দহ। দহের পাশ দিয়ে নৌকাগুলি যাওয়ার সময় বিশালক্ষ্মী দেবীর নামে নদীগর্ভে কিছু জিনিষ ফেলে দিয়ে যেত। ইঁট বোঝাই নৌকা থেকে ইঁট, অন্য নৌকা থেকে ঠাকুরের নাম করে পয়সা ফেলে দিত—বিশালক্ষ্মী মায়ের কোপ থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার আশায়। ঘাটের উপরে এক বিরাট বটগাছ ছিল, তার নীচে রাখা সিঁদুর মাখান পাথরটি বিশালক্ষ্মী মায়ের প্রতীক রূপে পুজো করা হত। পাশে ছিল বাবাঠাকুরের একটি ছোট মন্দির। বাবাঠাকুরের ছিল মাথায় জটা, গোল মুখ, চোখ দুটি ভাঁটার মত, দুই কানে গাঁজার কলকে, বিরাট ভুঁড়ি। মুখে ছাগল দাড়ি, এক হাতে ত্রিশূল, অন্য হাতে সাপ মুঠো করে ধরা আছে। শনি, মঙ্গলবারে পুজো হত। গাছের দুপাশে দুটি স্নানের ঘাট, উত্তরে পুরুষদের, দক্ষিণে মেয়েদের জন্য। বিশালক্ষ্মী সড়ক নিবাসী অবস্থাপন্ন চাকুরীয়া ৺কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পত্নী শ্রীমতি কামিনী দেবী কর্তৃক ১৩০৬ বঙ্গাব্দে নির্মিত। এখন ভাগীরথীর ঘাট দুটিই ভেঙে গেছে। বট গাছও পড়ে গেছে, জোয়ারের বানের জলোচ্ছ্বাসে। ঘাটের উপরেই উত্তর কোণে এক শিবমন্দির আছে—এঁদেরই স্থাপিত। ঘাটের পথ ধরে গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক

রোডে পড়ার মুখে দক্ষিণদিকে এক বাঁধান বেদীতে মনসা গাছ। এখানে ভাদ্রমাসের সংক্রান্তিতে বারোয়ারী মনসা পূজা হয়। রাস্তা ধরে একটু এগোলেই আইডিয়াল সোসাইটির মিউচিয়াল বেনিফিট ফাণ্ডের বাড়ী রাস্তার পশ্চিমে। এই অঞ্চলের কয়েকজন আদর্শবাদী যুবক খেলাধুলা সাহিত্যচর্চা নাট্যাভিনয় প্রভৃতির উদ্দেশ্যে ১৯৩৬ সালে এই সোসাইটির প্রতিষ্ঠা করে। এরা ১৩৫৫ বঙ্গাব্দে "প্রকাশিকা" নাম দিয়ে এক মাসিকপত্র প্রকাশ করে—এতে সাহিত্যচর্চা ছাড়া বিশেষ করে স্থানীয় সংবাদ এবং সেই বিষয়ে আলোচনা প্রকাশ করা হত। ছয় বছর চলার পর পত্রিকাটির প্রকাশ বন্ধ হয়ে যায়। সমবায় প্রথায় নিজেদের মধ্যে থেকে চাঁদা তুলে এঁরা মিউচিয়াল বেনিফিট ফাণ্ড নাম দিয়ে এক সমবায় ভাণ্ডার গড়ে তুলে একটি সমবায় বিপণির অর্থে নিজস্ব একটি পাকাবাড়ী নির্মাণ করেছে, সে জন্য এদের নিশ্চয়ই বাহবা পাওয়া উচিত। আইডিয়াল সোসাইটির বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা এক সময় খুব জনপ্রিয় ছিল। বেশ কয়েকবছর চলার পর প্রতিযোগীর সংখ্যা খুব কমে যাওয়ায় এরা ঐ প্রতিযোগিতা তুলে দিয়েছে। এখন ২৫শে ডিসেম্বর Cross Country Race এর প্রবর্তন করেছে।

একটু এগোলেই রাস্তার পূর্বদিকে ভূতোড়িয়া ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কস্ স্থাপিত হয়েছে। বিভিন্ন কলকারখানায় ব্যবহৃত যন্ত্রপাতির অংশ এখানে তৈরী করা হয়। কারখানাটি যেখানে নির্মিত হয়েছে সেটি আগে একটি বাগানবাড়ী ছিল—উত্তর কলকাতার সুবর্ণ বণিক সম্প্রদায়ের মল্লিক বংশের। ঐ বাগানে নানা রকমের দুষ্প্রাপ্য ফলফুলের গাছ ছিল। মল্লিকদের আর্থিক অবস্থা খারাপ হওয়ায় ইদানীং বাগানটিও অরক্ষিত হয়ে পড়ে থাকত। কারখানা গড়ে ওঠায় তার সদগতি হয়েছে বলা যেতে পারে। কারণ এর ফলে কিছুসংখ্যক স্থানীয় লোকের অন্নসংস্থানের ব্যবস্থা হয়েছে। এরই সামনে গড়ে উঠেছে বিরাট সুদৃশ্য মন্দির সহ রাজরাজেশ্বরী সেবা মঠ। শোনা যাচ্ছে ১৯৯৬ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে রাজরাজেশ্বরী মাতার প্রতিষ্ঠা ও নবনির্মিত মন্দিরের উদ্বোধন হবে। ভূতোড়িয়ার ঠিক দক্ষিণেই দ্বাদশ মন্দির ঘাট। সারা কোন্নগরে এর মত রমণীয় ও দর্শনীয় স্থান আর কিছু নেই। প্রায় দেড়শ বছর হল ১৮২১ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতা হাটখোলা দত্তবংশীয় জমিদার ৺হরসুন্দর দত্ত বারোটি শিবমন্দির সমেত ঘাটটি নির্মাণ করেন। ঘাটটি শুধু স্নানের ঘাট রূপেই ব্যবহৃত হয় না। দুই দিকের মন্দিরের সামনে পিছনে যে বিস্তৃত খোলা জমি আছে, সেখানে সকাল সন্ধ্যায় বহু লোক বেড়াতে আসে—বিশেষ করে নদীর ঠিক উপকূলে নদীর উপরের জমিতে। ঘাটের প্রশান্ত সোপান-শ্রেণীতে শনি রবিবার এবং ছুটির দিনে সান্ধ্য বায়ু সেবন ও গল্পগুজব করে অবসর যাপনের উদ্দেশ্যে প্রচুর জনসমাগম হয়ে থাকে। ঘাটের ঠিক

ওপরেই এক বিরাট চাতাল। মাথার উপরে চাঁদোয়া। সুতরাং বর্ষার দিনে এর তলায় আশ্রয় নেবার অসুবিধা নেই। পূর্ণিমা অমাবস্যার কোটালের জোয়ারের প্রবল জলোচ্ছ্বাসে ঘাটটি ধ্বংসের উপক্রম হয়েছিল। সংস্কারের অভাবে মন্দিরগুলি বিশেষ করে চাঁদোয়াটিও ভেঙে পড়ার উপক্রম হয়েছিল। ৺দত্ত মহাশয়ের উত্তরাধিকারীগণ বহু শাখায় বিভক্ত হওয়ায় এবং দ্বাদশ মন্দিরের সম্পত্তির আয়ও যথেষ্ট পরিমাণে হ্রাস পাওয়ায় বিশেষতঃ তাঁরা কলিকাতা ও অন্যান্য দূরবর্তী স্থানে অবস্থান করায় উপযুক্ত তত্ত্বাবধানের কোন ব্যবস্থা ছিল না। কোন্নগরের এই ঐতিহাসিক সম্পদকে রক্ষা করার উদ্দেশ্যে প্রায় কুড়ি বছর আগে ৺হরিসাধন বন্দ্যোপাধ্যায়ের চেষ্টায় দ্বাদশ মন্দির ঘাট সংরক্ষণী সমিতি গড়ে তোলা হয়। সমিতির সভ্যদের সত্বাধিকারীগণ ঘাটের সম্পত্তির ভার একটি ট্রাষ্ট বোর্ডের হাতে তুলে দেন। সংরক্ষণী সমিতি মিউনিসিপ্যালিটির অর্থসাহায্যে এবং জনগণের কাছ থেকে চাঁদা তুলে ৫০০০ টাকা সরকারী সেচ বিভাগে জমা দিলে ঐ বিভাগ ঘাটের দুপাশে বাঁধ তৈরী করে দেওয়ায় ঘাটটি নিশ্চিত পতনের হাত থেকে রক্ষা পেয়েছে। সমিতির ঐকান্তিক প্রয়াসের ফলে ১৯৬৭ সালে বিড়লা জনকল্যাণ ট্রাষ্ট ৫০,০০০ টাকা খরচ করে সীমানার পাঁচিল এবং মন্দিরগুলির সংস্কার করে দিয়েছেন। চাঁদোয়ার ছাদটিও ফেলে দিয়ে নতুন করে তৈরী করা হয়েছে। নিত্যপূজা ও সন্ধ্যারতি ছাড়াও এখানে শিবরাত্রি ও চৈত্র সংক্রান্তির দিনে বিশেষ উৎসব অনুষ্ঠিত হয়—ঐ সময় যে মেলা বসে সেখানে প্রচুর লোক জমায়েত হয় এবং জিনিষপত্রের কেনা-বেচাও হয়ে থাকে।

মন্দির ছাড়িয়েই লক্ষ্মীনারায়ণ জুট মিলের জেটী ছিল দ্বাদশ মন্দিরের জমি ইজারা নিয়ে গড়ে উঠেছে। মিল উঠে যাওয়ায় জেটীর কাজ এখন বন্ধ।

এর পরেই ৺শম্ভুচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের স্নানের ঘাট। এ ঘাটটিও বেশ চওড়া। ঘাটের উপরে চাঁদোয়া যুক্ত চাতাল ও শ্মশানবাসীর দুটি ঘর। চাঁদোয়াটি প্রায় সম্পূর্ণই ভেঙে পড়েছে। ভগ্নপ্রায় অংশটুকু স্নান যাত্রীদের আতঙ্কের কারণ হয়ে রয়েছে। ঘাটের উপরের জমিতে উত্তরদিকে দুটি শিব মন্দির—বিগ্রহের নাম যথাক্রমে ত্রিলোচন ও শম্ভুনাথ। ঘাটের দক্ষিণে যে শ্মশানঘাটটি ছিল নদীর জলোচ্ছ্বাসে তা এখন গঙ্গাগর্ভে। ঘাটটির উত্তর-দিকের জমি এখন শ্মশানরূপে ব্যবহৃত হচ্ছে। ঘাট এবং মন্দির ১২৭১ বঙ্গাব্দে নির্মিত। ঘাটের উপরে দক্ষিণদিকের জমিতে সূর্য্যবাবার আশ্রম ও আনন্দময়ী কালী মন্দির। এই মন্দিরে কালী মূর্তি ছাড়াও রাধাকৃষ্ণের মূর্তি এবং শিবলিঙ্গও আছে, এখানে হিন্দু সমাজে প্রচলিত বৎসরের সকল পূজাই অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। মন্দিরটি ১৩২৮ বঙ্গাব্দে নির্মিত।

দক্ষিণদিকে একটু এগোলেই রাস্তার পশ্চিমে ওঁকার মঠ। ভিতরে দুটি

মন্দিরে যথাক্রমে বিন্দুবাসিনী কালী মূর্তি ও দীননাথ শিবলিঙ্গ। মঠের প্রতিষ্ঠাতা স্বামী নির্মলানন্দের সমাধির উপর একটি মন্দির প্রতিষ্ঠা করে স্বামীজীর এক মর্মরমূর্তিও স্থাপন করা হয়েছে। মঠের বর্তমান তত্ত্বাবধায়ক ও পূজারী স্বামীজীর মধ্যম জামাতা শ্রীঅক্ষয়কুমার শাস্ত্রী।

স্বামীজী একজন ভারত বিখ্যাত বৈদান্তিক ছিলেন। পূর্ব আশ্রমের নাম ছিল যজ্ঞেশ্বর বেদান্ত ভূষণ বেদান্ততীর্থ। আদি নিবাস ফরিদপুর জেলার কোটালীপাড়া পরগণার হরিণহাটী গ্রামে। স্বামীজী ছিলেন ঐ গ্রামের ঠাকুর চক্রবর্তী নামক বিখ্যাত পণ্ডিত বংশের সন্তান। ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন ও জীবিকা অর্জনের উদ্দেশ্যে কলিকাতার বাগবাজারে থাকাকালে কোন্নগরের জমিদার ৺শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সহিত তাঁর পরিচয় ঘটে। চট্টোপাধ্যায় কোন্নগরে তাঁর বসবাস ও চতুষ্পাঠী স্থাপনের সুযোগ করে দেন। ১৩৪১ বঙ্গাব্দে তিনি কাশীধামে রামেশ্বরানন্দ তুরীয়াবধূতের নিকট সন্ন্যাসের দীক্ষা গ্রহণ করেন। কলিকাতার ভবানীপুর অঞ্চলে এবং ভারতের অন্যান্য দূরবর্তী অঞ্চলেও তাঁর অনেক ভক্ত ও শিষ্য আছে। ১৩৫৯ বঙ্গাব্দের ২রা অগ্রহায়ণ ৮৮ বৎসর বয়সে স্বামীজী দেহরক্ষা করেন। মঠ প্রতিষ্ঠিত হয় ১৩৪৫ বঙ্গাব্দে—কালী মূর্তির প্রতিষ্ঠা বাংলা ১৩৫৮ সালে। মঠ ও তৎসংলগ্ন জমি ৺সতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের দান। সম্পত্তিটি রক্ষার জন্য একটি অছি কমিটি আছে।

মঠের ঠিক দক্ষিণে ব্রাহ্ম সমাজ মন্দির। বর্ষীয়ান ব্রাহ্মনেতা সমাজ কল্যাণব্রতী কোন্নগরের জনকরূপে পরিচিত এবং বর্তমান কোন্নগরের স্রষ্ট্রা মহাত্মা ৺শিবচন্দ্র দেব কর্তৃক ১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দে উপাসনা মন্দিরটি নির্মিত হয়। এখানে ফাল্গুন-চৈত্র মাসে একটি উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। উৎসবের অঙ্গরূপে সকালে নগর সংকীর্তন এবং বৈকালে ধর্মবিষয়ে বক্তৃতা ও ধর্মীয় সঙ্গীতের ব্যবস্থা করা হয়। কলিকাতা থেকে অনেক বিখ্যাত অধ্যাপক ও প্রখ্যাত বক্তা উৎসব উপলক্ষে কোন্নগরে এসেছেন।

মন্দিরের এলাকাভুক্ত জমিতে শিবচন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হোমিওপ্যাথিক দাতব্য চিকিৎসালয়টি বর্তমানে লুপ্ত হয়েছে। তবে সম্প্রতি মন্দির ভবনে যে মহিলা শিল্প বিদ্যালয়টি স্থাপিত হয়েছে—সেখানে স্থানীয় মহিলাগণ শিল্প শিক্ষার সুযোগ পেয়ে যথেষ্ট উপকৃত।

ব্রাহ্ম সমাজের সামনেই গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোডের ওপারে শিবচন্দ্র প্রতিষ্ঠিত সমাজঘাট নামক স্নানের ঘাট।

ব্রাহ্ম সমাজের সংলগ্ন দক্ষিণের জমিতে মহাত্মা শিবচন্দ্রের অন্যতম কীর্তি কোন্নগর হিন্দু বালিকা বিদ্যালয়। প্রতিষ্ঠাকাল ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দ। হিন্দু সমাজে স্ত্রীশিক্ষা যে সময়ে নিন্দিত ও নারী সমাজের অধঃপতনের কারণ বলে

অভিহিত ছিল। দুর্জয় সাহস ও দূরদৃষ্টির সাহায্যে সর্বপ্রকার বাধাবিঘ্ন উপেক্ষা করে নারী-সমাজের সর্বাঙ্গীণ উন্নতির সহায়ক এই বিদ্যালয়টি সেই সময়ে স্থাপন করে শিবচন্দ্র তাঁদের প্রভূত কল্যাণসাধন করেছেন। প্রাথমিক বিদ্যালয়রূপে প্রতিষ্ঠিত হয়ে এটি ক্রমশঃ উন্নীত হয়ে বর্তমানে উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে পরিণত। বর্তমান বছরে বিজ্ঞান বিভাগও খোলা হয়েছে। চালাঘর থেকে বিদ্যালয় ভবনটি এখন একটি ত্রিতল অট্টালিকায় পরিণত হয়েছে। শিক্ষাদান ব্যাপারে বিদ্যালয়টি সুনাম অর্জন করায় পার্শ্ববর্তী অঞ্চল থেকেও বহু ছাত্রী এখানে শিক্ষালাভের জন্য আসে।

বিদ্যালয় ভবনের দক্ষিণের রাস্তা পার হলেই কোন্নগর সাধারণ গ্রন্থাগার ভবন। গ্রন্থাগারটিও শিবচন্দ্রের কীর্তিরাজির অন্যতম নিদর্শন। স্থাপিত হয় ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে কোন্নগর উচ্চবিদ্যালয় সংলগ্ন জমিতে। ১৮৯৭ সালের ভূমিকম্পে ঐ গৃহ ধ্বংস হওয়ার পর উচ্চ বিদ্যালয়ের একটি গৃহে গ্রন্থাগারটি স্থানান্তরিত করা হয়। ১৯২৯ সালে গ্রন্থাগারের নিজস্ব গৃহ নির্মিত গ্রন্থাগারটিকে এখানে উঠিয়ে নিয়ে আসা হয়েছে। গ্রন্থাগারের মধ্যে একটি অবৈতনিক পাঠকক্ষ জনসাধারণের সাময়িক পত্রিকা ও অন্যান্য পুস্তকাদি পাঠের সুযোগ আছে। টাউন লাইব্রেরীরূপে মনোনীত হওয়ায় গ্রন্থাগার ভবনটি সরকার প্রদত্ত অর্থ সাহায্যে সম্প্রসারিত হয়েছে। দ্বিতলের প্রশস্ত হলঘরটি গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষের অনুমতি নিয়ে সভা সমিতি ও অন্যান্য উৎসব উপলক্ষে ব্যবহার করা যেতে পারে।

গ্রন্থাগারের উদ্দেশ্যে সংগৃহীত জমির দক্ষিণদিকের কিছু অংশ গ্রন্থাগারের কাছ থেকে কিনে নিয়ে কোন্নগর সমবায় ব্যাঙ্ক ভবনটি গত ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দে নির্মিত হয়েছে। ৺সত্যচরণ মুখোপাধ্যায়, ৺ললিতমোহন ঘোষাল, ৺বিনয়ভূষণ ঘোষ, ৺ননীগোপাল বসু ও ৺নলেন্দ্রনাথ ঘোষ প্রমুখ কয়েকজন উৎসাহী সমবায় প্রেমিক যুবকগণ কর্তৃক ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দে ৺রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের এস. সি. মুখার্জী ষ্ট্রীটের বহিঃবাটির একটি কক্ষে ব্যাঙ্কটি স্থাপিত হয়। পরে গ্রন্থাগার সংলগ্ন জমিতে ব্যাঙ্কের নূতন বাড়ী নির্মাণ করা হলে ব্যাঙ্কের অফিস এখানে উঠে আসে। ব্যাঙ্কের লেনদেনের কাজ বাড়লে সামনের জমিতে এক দোতলা বাড়ী তৈরী করে কোন্নগর পোষ্ট অফিসকে ভাড়া দেওয়া হয়েছে। সেই থেকে কোন্নগর পোষ্ট অফিস ঐ বাড়ীতেই রয়েছে। অল্প কিছুদিন হল ব্যাঙ্ক নিজের অফিসের দোতলায় নূতন ঘর তৈরী করে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বীমা কর্মচারী কর্পোরেশনকে তাঁদের স্থানীয় কার্যালয় রূপে ব্যবহারের জন্য ভাড়া দিয়েছে।

পোষ্ট অফিসের সামনের রাস্তা পার হলেই কোন্নগর উচ্চ বিদ্যালয়ের বিরাট অট্টালিকা। ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দে স্থাপিত এই বিদ্যালয়টিও প্রাতঃস্মরণীয়

শিবচন্দ্র দেবের এক অতুলনীয় কীর্তি। এটি একটি সর্বার্থসাধক বিদ্যালয়। কলা, বিজ্ঞান ও কারিগরি তিনটি বিভাগেই শিক্ষাদানের ব্যবস্থা আছে। সামনের দিকের বাড়ীটি প্রায় সম্পূর্ণ নতুন করে নির্মাণ করা হয় ১৯১৮ সালে। ১৯১৭ সালে স্যার আশুতোষ মুখার্জী এর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। ১৯১৮ সালে বাড়ীর নির্মাণের কাজ শেষ হয়। কোন্নগর নিবাসী বর্ধমানের লব্ধপ্রতিষ্ঠিত আইনজীবি বিদ্যালয় গৃহ নির্মাণকল্পে এককালীন ১২,০০০ টাকা দান করেন। বিজ্ঞান বিভাগের নতুন বাড়ীটি নির্মিত হয়েছে ১৯৫৪ সালে। বিদ্যালয়ের তদানীন্তন সম্পাদক রায় সাহেব জ্যোতিষচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়ের আন্তরিক প্রচেষ্টা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ভাগীরথী নদীর সম্মুখে জি. টি. রোডের উপর অবস্থিত বিদ্যালয় ভবনের পরিবেশ ও দৃশ্যাবলী অত্যন্ত মনোরম। গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোডের উপর দিয়ে যাওয়ার সময় বাড়ীটি যে কোন লোকের আকর্ষণ না করে পারে না। বিদ্যালয়ের দক্ষিণ দিকে শিবচন্দ্র বিনোদ ভবনের মঞ্চ ও প্রার্থনা গৃহ। সামনে ছেলেদের খেলা-ধূলার জন্য প্রাচীরবেষ্টিত বড় মাঠ। সব মিলিয়ে এমন সুন্দর পরিবেশের মধ্যে সর্বপ্রকার প্রয়োজনীয় উপকরণ সম্বলিত বিদ্যালয় পশ্চিমবাংলায় খুব বেশী নেই। বিদ্যালয়ের সঙ্গে নানা সূত্রে তৎকালীন বহু বিশিষ্ট ব্যক্তির নাম জড়িত। এঁদের মধ্যে পরিচালক সমিতির সদস্য অথবা পরামর্শদাতারূপে রাজা জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, রাজা দিগম্বর মিত্র, ৺প্যারীচরণ সরকার, ৺গিরিশচন্দ্র দেব, ডাঃ ত্রৈলোক্যনাথ মিত্র, রাজা প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায়, শিক্ষকরূপে মহাত্মা শিশিরকুমার ঘোষ, ৺উমেশচন্দ্র দত্ত—ছাত্ররূপে শ্রীঅরবিন্দ পিতা ডাঃ কৃষ্ণধন ঘোষ, কর্ণেল অনাথবন্ধু পালিত, রায় বাহাদুর রাধিকানাথ বসু, ৺নৃসিংহনাথ বসু, ৺ডাঃ বঙ্কিম মুখোপাধ্যায় প্রভৃতির নাম উল্লেখ-যোগ্য। বিদ্যালয়টি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠারও ৪ বছর আগে স্থাপিত—সুতরাং পশ্চিমবঙ্গের সর্বাপেক্ষা প্রাচীন বিদ্যালয়গুলির অন্যতম বলে পরিগণিত।

১৯৫৪ সালে বিদ্যালয়ের শতবার্ষিকী উপলক্ষে মুখ্যতঃ স্বর্গীয় ডাক্তার বঙ্কিমচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের চেষ্টায় এবং তাঁর দ্বারা সংগৃহীত অর্থে বিদ্যালয়ের সম্মুখের জমিতে মহাত্মা শিবচন্দ্রের আবক্ষ মর্মরমূর্তি স্থাপিত হওয়ায় কোন্নগরবাসী এই মহাপুরুষের প্রতি তাদের কৃতজ্ঞতার ঋণ কিছুটা পরিশোধ করার মত আত্মতৃপ্তি অনুভব করতে পারার সুযোগ লাভ করে ধন্য হয়েছে। প্রাথমিক বিদ্যালয়, উচ্চবিদ্যালয়, বালিকা বিদ্যালয়, সাধারণ গ্রন্থাগার, হোমিওপ্যাথিক দাতব্য চিকিৎসালয়, পোষ্ট অফিস, রেল ষ্টেশন, করদাতা সমিতি, ব্রাহ্ম সমাজ মন্দির প্রভৃতি জনহিতকর প্রতিষ্ঠানগুলি শিবচন্দ্র প্রধানতঃ নিজস্ব চেষ্টায় ও অর্থ সাহায্যে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। এই

প্রসঙ্গে আমরা তাঁর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করি।

উচ্চ বিদ্যালয়ের হাতার মধ্যে পূর্ব-দক্ষিণে তিন কামরাযুক্ত একতলা বাড়ীটি এক সময়ে প্রাথমিক বিদ্যালয়রূপে ব্যবহৃত হত, বর্তমানে ঐটি উচ্চ বিদ্যালয়ের সম্পত্তি বলে গণ্য হওয়ায় এবং বিদ্যালয়ে ছাত্রসংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় উচ্চ বিদ্যালয় ভবনে সকালের দিকে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পাঠক্রম অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। প্রাথমিক বিদ্যালয়টি ১৮৪৬ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম স্থাপিত হয়। কয়েক বছর পরে বিদ্যালয়টি উঠে যায়। পুনরায় শিবচন্দ্র কর্তৃক ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে পুনঃস্থাপিত হয়। প্রাথমিক বিদ্যালয়টির জন্য স্বতন্ত্র পরিচালক সমিতি আছে।

বিদ্যালয়ের প্রাচীরের পূর্বদিকে কোন্নগর মিউনিসিপ্যালিটির খোঁয়াড়। পথে-ঘাটে বিচরণশীল গৃহস্থের ক্ষতি সাধনকারী গবাদিপশু এখানে আটক রাখা হত।

এর দক্ষিণে শ্রীভবনের কয়েকটি কামরা ভাড়া নিয়ে রিষড়া কোন্নগর এলাকার রেশন অফিস স্থাপিত হয়েছে।

শ্রীভবনের ঠিক দক্ষিণে কোন্নগর পৌর প্রতিষ্ঠান ভবনটি কোন্নগর মিউনিসিপ্যালিটির প্রথম সভাপতি লব্ধপ্রতিষ্ঠ আইন পুস্তক প্রণেতা, কোন্নগর উচ্চ বিদ্যালয়ের এককালীন সভাপতি ও সম্পাদক ৺নৃসিংহদাস বসু মহাশয়ের অবিস্মরণীয় কীর্তি। ১৯৪৪ সালের ১৬ই জানুয়ারী ২৯০০০ টাকার মত বার্ষিক আয় এবং এক মাসের পরিচালনার খরচ নিয়ে রিষড়া কোন্নগর মিউনিসিপ্যালিটি থেকে পৃথক হয়ে কোন্নগর মিউনিসি-প্যালিটির পত্তন হয়। নৃসিংহবাবুর সুযোগ্য নেতৃত্বে ও সুদক্ষ পরিচালন ব্যবস্থায় ১৯৫৩ সালে ঐ আয় বৃদ্ধি পেয়ে ১,৪০,০০০ টাকায় পরিণত হয়। ইতিমধ্যে পৌর প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব ভবন, জলকল পরিকল্পনার জন্য অর্থের সংস্থান, মাতৃসদনের জন্য ১৪০০০ টাকা অর্থ সংগ্রহ, বিভিন্ন জনহিতকর প্রতিষ্ঠানে অর্থ সাহায্যের ব্যবস্থা, কোন্নগর হিন্দু বালিকা বিদ্যালয়ে ২০০০ টাকা এককালীন অর্থ সাহায্য, শ্রীরামপুর যক্ষ্মা হাসপাতালে বার্ষিক ১০০০ টাকা সাহায্য—শিবচন্দ্র সাধু খাঁন অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন—প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তারে নিয়মিত অর্থ সাহায্য, রাস্তাঘাটের প্রভূত সংস্কার, বিদ্যুচ্চালিত এলাকার সম্প্রসারণ, রাস্তায় রাস্তায় নলকূপের ব্যবস্থা, প্রসূতি চিকিৎসার জন্য শিক্ষাপ্রাপ্তা ধাত্রী নিয়োগ প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

১৯৬৯ সালে পৌরভবনের দোতলার ছাদের উপর ২০,০০০ টাকা ব্যয়ে নৃসিংহ বসুর স্মৃতি রক্ষার্থে একটি প্রশস্ত হলঘর নির্মিত হয়েছে। ঐ গৃহ-নির্মাণে নৃসিংবাবুর সুযোগ্য পুত্র বর্তমানে কলিকাতা প্রবাসী হাইকোর্টের এ্যাডভোকেট শ্রীসুধীরকুমার বসু এম. এ. বি. এল মহাশয়ের ১২০০০ টাকা

এককালীন দানও তাঁর পিতৃভক্তির উল্লেখযোগ্য নিদর্শন। দক্ষিণদিকে কিছুটা গেলে কোন্নগরের পুলিশ ফাঁড়ি। ফাঁড়ির দক্ষিণের গলির সামনে জি. টি. রোডের পূর্বদিকে একটি স্নানের ঘাট। সিঁড়ির কয়েকটি ধাপ বাঁধান থাকলেও ঘাটটি সম্পূর্ণ উন্মুক্ত।

ঘাটের ঠিক দক্ষিণে পাঁচিল ঘেরা বিস্তৃত জমিতে দেবভিলা নামক বাড়ীটি এক সময়ে ৺রামদুলাল দেবের বাসভবনরূপে ব্যবহৃত হত। রামদুলাল দেব ৺শিবচন্দ্র দেবের জ্ঞাতি বংশীয় সন্তান ছিলেন। ছাত্রজীবনে প্রবেশিকা পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীর বৃত্তি লাভ করেন। এম. এ. বি. এল পাশ করে তিনি মুন্সেফী গ্রহণ করেন এবং সাব জজরূপে অবসর গ্রহণ করে কয়েক বছর কোন্নগরে বাস করার পর কলিকাতা প্রবাসী হন। বিখ্যাত হিসাব পরীক্ষক ৺মলয়কুমায় দেব ও তাঁর ভ্রাতারা ৺দেবের স্মৃতিরক্ষার উদ্দেশ্যে একটি হলঘর নির্মাণের জন্য হিন্দু বালিকা বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের হাতে ৫০০০ টাকা দান করেছেন এবং আরো ৫০০০ টাকা দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। দেবভিলায় একটি মাড়োয়ারী কোম্পানী কর্তৃক এখন প্লাস্টিকের কারখানা স্থাপিত হয়েছে।

দেবভিলার দক্ষিণে উদয়াচল। ৺রামদুলাল দেবের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ৺রামধন দেবের বাসভবন। রামধন বাবুও কোন্নগর উচ্চ বিদ্যালয়ের একজন কৃতী ছাত্র। ৺রামধন দেবের পুত্র ৺নির্মলদেব পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কৃষি বিভাগে চাকরী করার ফাঁকে ফাঁকে সাহিত্যিক হিসাবে যথেষ্ট সুনাম অর্জন করেন। তাঁর ঝড়ের রাতে প্রভৃতি উপন্যাস এক সময় বাঙালি পাঠক সমাজের প্রশংসা অর্জন করেছিল।

উদয়াচলের দক্ষিণে মাতৃনিবাস। কলিকাতা বিশ্বদ্যালয়ের প্রাক্তন রেজিষ্ট্রার ৺জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোডে ভাগীরথীর উপকূলে এক প্রশস্ত জমিতে এই সুদৃশ্য বাসভবনটি নির্মাণ করে তাঁর অবসর জীবনের অধিকাংশ সময় এখানেই বাস করতেন। জ্ঞানবাবুর পরলোক গমনের পর বিখ্যাত যক্ষ্মা চিকিৎসক ডাঃ শচীন সর্বাধিকারী এই বাড়ীটি কিনে ছুটির দিনে এখানে অবসর জীবন যাপন ও ধর্ম সাধনায় অতিবাহিত করতেন। ১৯৪৫ সালে নূতন কোন্নগর মিউনিসিপ্যালিটি স্থাপিত হলে এই বাড়ীটি মিউনিসি-প্যালিটির অফিসরূপে কয়েক বছর ব্যবহৃত হয়েছিল।

এরপরেই শ্মশানঘাট, ফেরীঘাট ও বাজার। এই ঘাটটি সর্বাপেক্ষা পুরাতন। ক্রাইপার রোডের বিভূতি চক্রবর্তীর বংশের পূর্বপুরুষ দ্বারা প্রতিষ্ঠিত। পাশেই শ্মশানঘাট ও মেথরদের বস্তী। বাজারটা আগে আরও দক্ষিণদিকে ছিল। সেজন্য ঐ বাজারকে পুরাতন বাজার বলা হত। পুরাতন বাজারে একটা স্নানের ঘাট আছে।

পুরাতন বাজার সংলগ্ন জমিতে মাধবানন্দ আশ্রম। এখানে একটি শিব-মন্দির প্রতিষ্ঠা করেছেন মাধবানন্দ স্বামী। তাঁর ভক্তশিষ্যদের প্রদত্ত অর্থানুকূল্যে তাঁর প্রয়াণ দিবস উপলক্ষে এখানে উৎসব করেন ভক্তশিষ্যরা।

দক্ষিণদিকে সরু গলি, মুসলমান পল্লী, আরো দক্ষিণ বাগানবাড়ী। এখানেও স্নানের ঘাট আছে। রাস্তার দক্ষিণে বাগানবাড়ী। এখানে অবনীন্দ্র ঠাকুর গৃহনির্মাণ করে বাস করেছিলেন। বর্তমানে তা হস্তান্তরিত হয়েছে। আরো দক্ষিণে মুসলমান পল্লী এবং সংলগ্ন একটা মসজিদ আছে রাস্তার উপর।

বাজারঘাট ও পুরাতন বাজারঘাটের পশ্চিমদিক একসময় ফাঁকা ছিল, একটা পুকুরও ছিল। পুকুর বুজিয়ে প্রথমে পাঁচুগোপাল পাল একটা টালির ঘরে সিনেমা স্থাপন করেন। পরে তা বন্ধ হয়ে যায়। ঐ জমিতে হাতীরকুলের হরিসত্য ভট্টাচার্য মহাশয় একটা সিনেমা করেন। বছর দুই চলার পরে সিনেমাও বন্ধ হয়ে যায়। ঐখানে কাপড়ের কল স্থাপিত হয়। তখন দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ চলছে। কাপড়ের কল দু'বছর চলার পর বন্ধ হয়ে যায়। তখন টকি সিনেমার প্রবর্তন করা হয়। চন্দননগরে এক ভদ্রলোক হোগলার আচ্ছাদনে টকি সিনেমা প্রবর্তন করেন। সেজন্য ঐ টকিকে হোগলা টকি বলা হত।

জি. টি. রোডের পূর্বদিকে রহমান সাহেবদের বাড়ীর দক্ষিণে মসজিদ। মসজিদের সংলগ্ন জমিতে ডি. ওয়ালডি কোম্পানীর কারখানা। প্রথমে রাসায়নিক কারখানারূপে এখানে রাসায়নিক ঔষধাদি তৈরী করা হলেও পরবর্তীকালে লাভজনক মদ্যাদি তৈরীর চাহিদা ভাল থাকায় এখানে **Whisky, Brandy** ইত্যাদি তৈরী করা হত। এখন রাসায়নিক দ্রব্যাদি তৈয়ারী বন্ধ করা হয়েছে।

শ্রীরামপুর মিউনিসিপ্যালিটির প্রথম ভারতীয় চেয়ারম্যান ডাঃ ত্রৈলোক্য-নাথ মিত্র এখানেই জি. টি. রোডের পশ্চিমে বাস করতেন।

দক্ষিণপাড়ার গলিতে রিবড়া-কোন্নগর মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান হরিচরণ চট্টোপাধ্যায় ও কোন্নগর মিউনিসিপ্যালিটির প্রথম ভাইস চেয়ারম্যান ননীগোপাল বসুর বাড়ী।

ডি. ওয়ালডি কোম্পানীর দক্ষিণদিকের রাস্তায় ইটখোলা—তার মধ্য দিয়ে যে সরু নালাটী গেছে তার নাম আমড়াতলার নালা। এটিই কোন্নগর গ্রামের দক্ষিণ সীমানা।

কয়েকটি জনকল্যাণকর প্রতিষ্ঠানের সংক্ষিপ্ত পরিচয়

কোন্নগর পাঠচক্র—শিক্ষা-সাহিত্য-সংস্কৃতির কেন্দ্ররূপে কোন্নগরের পরিচিতি সপ্তদশ শতাব্দী থেকে। স্বনামখ্যাত পণ্ডিত আনন্দচন্দ্র ভট্টাচার্য সার্বভৌমের সময় সংস্কৃত শিক্ষার কেন্দ্ররূপে কোন্নগরের যথেষ্ট খ্যাতি ছিল। ঊনবিংশ শতাব্দীতে প্রখ্যাত নৈয়ায়িক ও পণ্ডিত দীনবন্ধু ন্যায়রত্ন মহামহোপাধ্যায়-এর সময় ন্যায়শাস্ত্র চর্চার কেন্দ্ররূপে কোন্নগরের ভূমিকা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই সময়েই কোন্নগরের ইংরাজী শিক্ষার সূত্রপাত—ডিরোজিও ছাত্র শিবচন্দ্র দেব এই যজ্ঞের হোতা। তাঁর প্রতিষ্ঠিত কোন্নগর উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়, কোন্নগর হিন্দু বালিকা বিদ্যালয়, কোন্নগর পাঠাগার আজও শিবচন্দ্র দেবের শিক্ষাপ্রসারের অগ্রণী ভূমিকার নিদর্শন। ঐতিহাসিক সুধীরচন্দ্র মিত্র তাঁর 'হুগলী জেলার ইতিহাস' গ্রন্থে লিখেছেন, "কোন্নগর শিল্পাঞ্চলের অন্তর্গত হইলেও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে তাহার যথেষ্ট সুনাম আছে। একদিকে এই জায়গাটি শিল্পকে যেমন অঙ্গীভূত করিয়াছে, অন্যদিকে একটি সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যও তেমনি গড়িয়া তুলিয়াছে।"

এই মূল স্রোতেরই উত্তরসূরী কোন্নগর পাঠচক্র। এর উদ্দেশ্য পঠন-পাঠন আলোচনার মাধ্যমে শিক্ষার সম্প্রসারণ ও জ্ঞানের বিকিরণ। প্রজ্জ্বলিত বর্তিকা সমন্বিত পাঠচক্রের প্রতীক চিহ্নে এই ভাবটি পরিলক্ষিত।

কোন্নগরের একদল মেধাবী সাহিত্যরসিক ছাত্র নিজেদের মধ্যে সাহিত্য-পাঠ স্বরচিত গল্প, প্রবন্ধ পাঠ ও আলোচনার জন্য স্টুডেণ্টস স্টাডি সার্কেল নামে একটি প্রতিষ্ঠান সৃষ্টি করে। নিজেদের বাড়ী এবং পরে তরুণ সঙ্ঘ নৈশ বিদ্যালয়ে নিয়মিত এই সমস্ত আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হত। এর কিছু আগে এই ছাত্রদের পূর্বসূরীরা সাধনা লিটারারি ক্লাব নামে একই উদ্দেশে একটি ক্লাব পরিচালনাও করেছিল। এদের দ্বারা পরিচালিত হত 'বাণী' নামে একটি হস্তলিখিত মাসিক পত্রিকা।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শেষ, জালিয়ানওয়ালাবাগের নৃশংস হত্যাকাণ্ডে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের নাইটহুড উপাধি ত্যাগ দেশের দিগন্তে তুমুল আন্দোলনের সৃষ্টি করে এবং তারপর ক্রমান্বয়ে সত্যাগ্রহ, অসহযোগ আন্দোলন, লবণ আইন ভঙ্গ (ডাণ্ডী অভিযান), চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন ইত্যাদি নানা ঘটনা প্রচণ্ড প্রভাব বিস্তার করেছিল তরুণ চিত্তের ওপর। তাই স্টাডিসার্কেল-এ

সাহিত্য-সংস্কৃতি বিষয়ক পঠন-পাঠন ও আলোচনা ছাড়াও দেশাত্মবোধক সাহিত্যের চর্চা বেশ একটা স্থান করে নিয়েছিল। যে সকল পুস্তক পাঠ ও আলোচনা হত তার মধ্যে ভারতবর্ষের ও পৃথিবীর অন্যান্য স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস, মাৎসিনীর অটোবায়োগ্রাফী, মেজর বি. ডি. বসুর 'রাইজ্ অফ্ খ্রীষ্টিয়ান পাওয়ার ইন্ ইণ্ডিয়া', ড্যান ব্রিনের 'মাই ফাইট ফর আইরিশ ফ্রিডম', সখারাম গণেশ দেউস্করের 'দেশের কথা' এবং স্বামী বিবেকানন্দের রচনাবলী ও জীবনী প্রভৃতি পুস্তক বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তরুণ সঙ্ঘ নৈশ বিদ্যালয়টি তাই পুলিশের চোখে ছিল বিশেষস্থান। ১৯৩০ সালে চট্টগ্রাম সশস্ত্র সংগ্রামের পরে কোন্নগরে একটিমাত্র প্রতিষ্ঠান সার্চ হয়— এই নৈশ বিদ্যালয়। এখানেই ১৯২৯ সালের এক সকালে স্টাডি সারকেলের বাঙলা নামকরণ হল 'কোন্নগর পাঠচক্র'।

পাঠচক্রের প্রায় ৬৬ বছরের ইতিহাস নানা কর্মধারায় পরিপূর্ণ। কত উৎসব, আলোচনা সভা, সঙ্গীতের আসর, সাপ্তাহিক আলোচনাসভা, মহাপুরুষদের জন্মতিথি পালন, বিদগ্ধ জ্ঞানীগুণী ব্যক্তিদের ভাষণ, প্রদর্শনী, সম্বর্ধনা সভা ইত্যাদি অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে। আজও তার কর্মধারা অব্যাহত। পাঠচক্রের ৬৬ বৎসরব্যাপী ঘটনাবহুল কর্মকাণ্ডের মধ্যে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটির উল্লেখ করা যেতে পারে।

১৯৩০ ঃ শিবচন্দ্র স্মৃতি উৎসব ঃ সভাপতি-সাংবাদিক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়।

১৯৩৩ ঃ হুগলী জেলা সাহিত্য সম্মেলন ঃ সভাপতি—অপরাজেয় কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। পশ্চিমবঙ্গের বিশিণ্ট সাহিত্যিক, এবং জেলার সমস্ত অঞ্চল থেকে প্রতিনিধিবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ জন্মশতবর্ষ উৎসব সভা ঃ সভাপতি—ডঃ মহেন্দ্রনাথ সরকার, বিনয় সরকার ও স্বামী মাধবানন্দ উপস্থিত ছিলেন।

মুসলীম লীগ মন্ত্রিসভা প্রস্তাবিত 'মাধ্যমিক শিক্ষা বিল'-এর প্রতিবাদে 'শ্রীরামপুর মহকুমা মাধ্যমিক প্রতিবাদ সভা' ঃ বক্তা— ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, ব্যারিস্টার এন. সি. চ্যাটার্জী প্রভৃতি।

১৯৩৫ স্পেনে আন্তর্জাতিক, গ্রন্থাগার ও গ্রন্থপঞ্জী কংগ্রেসের দ্বিতীয় অধিবেশনের প্রতিনিধি কুমার মুনীন্দ্র দেব রায়ের 'গ্রন্থাগার আন্দোলন' বিষয়ে ভাষণ। সভাপতি ঃ কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। সভাপতির ভাষণটি সভাস্থলে লেখা হয়। লেখাটি প্রথমে বিচিত্রায় 'বই এর দুঃখ' শিরোনামে পরে অপ্রকাশিত রচনাবলীতে এবং তার পরে গ্রন্থাবলীতে মুদ্রিত হয়েছে। প্রবন্ধের শেষে পাদটীকায়, পাঠচক্রের সভা কথাটি উল্লেখ আছে।

১৯৫০ ঃ শ্রীঅরবিন্দ আবির্ভাব মহাউৎসব। বক্তা ঃ বিপ্লবী-বারীন্দ্রকুমার ঘোষ, ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। সঙ্গীত পরিবেশন করেন বিখ্যাত গায়ক দীলিপকুমার রায়।

১৯৬১ ঃ রবীন্দ্রনাথের জন্মশতবর্ষ উপলক্ষে প্রদর্শনী এবং বিভিন্ন এলাকায় প্রাসঙ্গিক আলোচনা সভা।

১৯৭১ ঃ রবীন্দ্র জন্ম উৎসব—বক্তা—সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

১৯৭৫ ঃ শরৎচন্দ্র জন্ম শতবর্ষ উৎসব—সভাপতি ঃ ড. অজিতকুমার ঘোষ। বক্তা ঃ নাট্যকার শ্রীমন্মথ রায়।

১৯৮১ ঃ সুবর্ণ জয়ন্তী উৎসব—বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা, মূল্যবান প্রদর্শনী, আলোচনা, কবিমেলা, সঙ্গীত ও আবৃত্তির পরিবেশন। ৩ দিন-ব্যাপী এই উৎসবে ড. অজিতকুমার ঘোষ, সাংবাদিক শান্তিকুমার মিত্র, কবি ড. হরপ্রসাদ মিত্র, কবি শ্রীমতী বাণী রায়, নবনীতা দেব সেন, ড. সুধীরকুমার নন্দী, ড. বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায়ের নাম উল্লেখযোগ্য। প্রখ্যাত সঙ্গীত শিল্পী সবিতাব্রত দত্তের প্রাণমাতানো গান এবং দেবদুলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের আবৃত্তি পরিবেশিত হয়। এই উপলক্ষ্যে বিশেষ মূল্যবান স্মারক গ্রন্থ প্রকাশিত হয়।

১৯৮৯ সাল থেকে ১৯৯২ সাল পর্যন্ত সাপ্তাহিক বৈঠক-এর আসর নিয়মিত বসে। এই সমস্ত সভায় স্বরচিত রচনা পাঠ, মহাপুরুষের রচনা পাঠ, সঙ্গীত প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হয়। এই সময়, বিশেষ অধিবেশনে কোন্নগরের কৃতী সন্তান আমেরিকা নিবাসী লব্ধপ্রতিষ্ঠ চিকিৎসক ডঃ তূষিত মুখোপাধ্যায়ের সম্বর্ধনা সভা, শিশিরকুমার ভাদুড়ী, কালিদাস রায় এবং সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের জন্মশতবর্ষ সভা অনুষ্ঠিত হয়।

১৯৯২—২২শে মার্চ ঃ হীরক জয়ন্তী উৎসব। বিশেষ মর্যাদার সঙ্গে এই উৎসব বর্ষব্যাপী কর্মসূচীর মাধ্যমে পালন করা হয়। সভাপতি ঃ ড. অজিত-কুমার ঘোষ, প্রধান অতিথি বিচারপতি মুকুলগোপাল মুখোপাধ্যায় এবং উদ্বোধক ছিলেন ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। হীরক জয়ন্তী অনুষ্ঠানে পাঠচক্রের সঙ্গে যুক্ত সাহিত্য সংস্কৃতি ও সমাজসেবায় নিবেদিত প্রাণ কোন্নগরের ৮ জন বর্ষীয়ান ব্যক্তিকে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। প্রত্যেককে পুষ্পমাল্য ও স্মারক ফলক উপহার দেওয়া হয়। এঁরা হলেন—সর্বশ্রী অনিল-চন্দ্র মুখোপাধ্যায়, ডঃ নীলমণি বন্দ্যোপাধ্যায়, শিশিরকুমার ঘোষ, দুর্গাপদ ঘোষাল, অনাথনাথ মুখোপাধ্যায়, রামচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, সুধীরকুমার ঘোষ ও মুরারি মিত্র।

হীরক জয়ন্তী উৎসব উপলক্ষে ঃ মে মাস ঃ রবীন্দ্রসাহিত্য আলোচনা—বক্তা ঃ অধ্যাপক শ্রীকাননবিহারী গোস্বামী। জুলাই মাস ঃ বঙ্কিম আলোচনা

সভা। অধ্যাপক শ্রীদেবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 'বঙ্কিম উপন্যাসে হিন্দু মুসলমান সম্পর্ক' বিষয়ে প্রবন্ধ পাঠ ও আলোচনা করেন।

বর্তমানে প্রতি মাসে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। পাঠচক্রের কোন নিজস্ব কার্যালয় এতদিন ছিল না। সম্প্রতি পাঠচক্রের সভাপতি ডাঃ নীলমণি বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর সি. এস. মুখার্জী স্ট্রীটস্থ বাড়ির দ্বিতল কক্ষে পাঠচক্রকে কার্যালয় এবং সভা করার অনুমতি দিয়েছেন। পাঠচক্রের দীর্ঘদিনের এক অসুবিধা দূর হবে বলে আশা করা যায়। সদস্যদের বার্ষিক চাঁদা, বিশেষ দান নিয়েই সভাসমিতির ব্যয় নির্বাহ হয়। হরিপ্রসাদ মেমোরিয়াল ট্রাস্ট থেকে প্রতি বৎসরে অনুদান পাওয়া যায়। ডঃ তৃষিতকুমার মুখোপাধ্যায় তাঁর পিতা বিশিষ্ট সমাজসেবী প্রয়াত অনাথনাথ মুখোপাধ্যায়ের স্মরণে এককালীন ১০,০০০ টাকা দান করেছেন। এই টাকার সুদ থেকে প্রতি বৎসর 'অনাথনাথ স্মৃতি বক্তৃতা' শিরোনামে এক বক্তৃতা-সভায় আয়োজন করা হবে।

৬৬ বছরের কর্মধারার সঙ্গে যাঁরা যুক্ত ছিলেন এবং পাঠচক্রের অগ্রগতিকে যাঁরা এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন—তাঁদের মধ্যে কয়েকজনের নাম উল্লেখ করা যেতে পারে।

সভাপতি পদে প্রয়াত ইন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, প্রয়াত বিপিন মুখোপাধ্যায়, শ্রীঅনিলচন্দ্র মুখোপাধ্যায় (সভাপতি ও সম্পাদক), ডঃ নীলমণি বন্দ্যোপাধ্যায়, কাননবিহারী মুখোপাধ্যায় (সভাপতি ও সম্পাদক), শিশিরকুমার ঘোষ (সভাপতি ও সম্পাদক)।

সম্পাদক পদেঃ শ্রীমুরারি মিত্র, ৺নুটবিহারী চৌধুরী, ৺জিতেন্দ্রনাথ মিত্র, শ্রীঅধীর মুখোপাধ্যায়, ৺শক্তিপদ মুখোপাধ্যায়, শ্রীঅজয়কুমার মুখোপাধ্যায়, শ্রীপ্রভাসলাল দাস (১৯৫৬ সাল থেকে এখনও পর্যন্ত)।

বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে থেকে পাঠচক্রের বিভিন্ন অনুষ্ঠানকে সাফল্যমণ্ডিত করে আসছেনঃ শ্রীঅমলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় (প্রদর্শনী, সংবিধান প্রস্তুত বিষয়ক ভারপ্রাপ্ত), রাসবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায় (কোষাধ্যক্ষ), সমরেন্দ্রনাথ মিত্র (অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি), হরেন্দ্রকুমার মিত্র, সন্তোষকুমার মিত্র, জিতেন্দ্রনাথ দাস, শম্ভুচন্দ্র ভট্টাচার্য, ডঃ অমিতাভ চট্টোপাধ্যায়, কার্তিক বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রণয়কুমার সরকার, উদয় মুখোপাধ্যায় প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য। প্রসঙ্গক্রমে পাঠচক্রের একান্ত আপনজন প্রয়াত কয়েকজনের নাম উল্লেখ করা যেতে পারে—৺গজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ৺যতীন্দ্রনাথ রায়, ৺প্রভাতকুসুম বন্দ্যোপাধ্যায়, ৺নগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, ৺সুবোধকুমার মিত্র, ৺শিবচন্দ্র মাইতি, ৺সুনীলচন্দ্র বসু প্রমুখ।

কিশোর ব্যায়াম প্রতিষ্ঠান—প্রধানতঃ স্বর্গত কাশীনাথ মুখোপাধ্যায়ের

উদ্যোগে ১৯৪০ সালে প্রতিষ্ঠানের শুরু। ব্যায়াম, জিমনাষ্টিক, কুস্তি, লাঠিখেলা প্রভৃতি চর্চাই পূর্ণ উদ্যমে চলতে থাকায় প্রতিষ্ঠানের সভ্যসংখ্যা বাড়তে থাকে। নানা প্রতিকূলতার মধ্য দিয়ে এগিয়ে ৺হরিগোপাল ও তাঁর ভাই ৺বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের আনুকূল্যে দেবপাড়ায় আটকাঠা জমির ওপর নিজেদের খেলার মাঠ সংগ্রহ করেন ১৯৫০ সালে। পাঁচের ও ছয়ের দশকে এঁদের খেলার মান খুব উন্নত হয়। প্রতি বছর ছেলেদের ব্যায়াম প্রদর্শনী খুব আকর্ষণীয় হত। ব্যায়ামাচার্য বিষ্ণুচরণ ঘোষ, বিশ্বশ্রী মনোতোষ রায় প্রভৃতি ব্যায়ামবিদ এদেব অনুষ্ঠানে যোগদান করে ভূয়সী প্রশংসা করেন। নটশ্রী ৺বিপিনবিহারীর আনুকূল্যে এখানে বঙ্কিম মঞ্চ প্রতিষ্ঠিত হয়। এই মঞ্চে প্রায় দশ বছর নাট্য প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করা হত। হাওড়া, হুগলী ও ২৪ পরগণার বিভিন্ন নাট্যানুরাগী দল সেই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেন। গত কয়েক বছর ধরে এঁরা পুষ্পমেলার আয়োজন করে আসছেন।

রাজরাজেশ্বরী যুব সমিতি—মূলতঃ ছেলেদের স্বাস্থ্য গঠনের জন্য ১৯২৮ সালে এই সমিতি গঠিত হয়। তবে আবৃত্তি, নাটক, অঙ্কন ও সঙ্গীত প্রতিযোগিতারও এঁরা ব্যবস্থা করেন। ভলিবল খেলাতে এই সমিতি হুগলী জেলায় একটা বিশিষ্ট নাম। এখান থেকে বেশ কিছু পুরুষ ও মহিলা ভলিবল খেলার মাধ্যমে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছে। বিশিষ্ট সমাজসেবী ৺নগেন্দ্রনাথ মুখার্জীর স্মৃতিতে এখানে একটি হলঘর নির্মিত হয়েছে। সেখানে প্রতি মাসের প্রথম সোমবার ধর্মবিষয় আলোচনা সভা বসে।

কোন্নগর স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী—ছেলেমেয়েদের দেশের প্রতি দায়িত্ব সচেতন হওয়ায় জন্য বাহিনীর শুরু ১৯৪৬ সালে। সাধারণ জ্ঞান, সাঁতার ও ক্রীড়া প্রতিযোগিতা, বিতর্কসভা, শিক্ষামূলক ভ্রমণ ও বৎসরান্তে শিক্ষাশিবিরের মাধ্যমে ছেলেদের উৎসাহিত করা হত। বাহিনী তখন বঙ্গীয় জাতীয় ক্রীড়া ও শক্তিসঙ্ঘের অন্তর্ভুক্ত ছিল। দরিদ্র ছেলেদের পাঠ্যপুস্তক সরবরাহ, রোগীদের শুশ্রূষার জন্য প্রয়োজনীয় সরঞ্জামের ব্যবস্থা করা, রাস্তাঘাট পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্ন ও সময় বিশেষে মেরামত করা। লাইব্রেরীর পুস্তক ঝাড়ামোছা করাও এদের সেবাকাজের অন্তর্ভুক্ত ছিল। একসময় জাতি কল্যাণ শিল্প প্রতিষ্ঠান গঠন করে সভ্যরা সকলকে খাঁটি সরিষার তেল ন্যায্যমূল্যে সরবরাহ করতেন। উপযুক্ত পরিচালকের অভাবে বাহিনী উঠে গেলেও তাঁদের তৈরী কনজিউমার কো-অপারেটিভ স্টোরস আজও চালু আছে।

বাহিনীর স্থায়িত্বকালীন সময়ে যাঁরা সংগঠন দায়িত্বের সঙ্গে সামরিক

যাঁরা সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করেছেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য—সর্বাধিনায়ক ৺কেশবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, সহ-সর্বাধিনায়কদ্বয় ৺অজিতকুমার বসু ও শ্রীঅমল-কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় যিনি সম্পাদকের গুরুভারও বহন করেন। দল অধিনায়ক হিসাবে শ্রীশ্যামসুন্দর বসু, ৺সুশীলকুমার মিত্র, শ্রীকুমুদকুমার চট্টোপাধ্যায়, ৺নীলমাধব চট্টোপাধ্যায়, মহিলা বিভাগে কুমারী নমিতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও শান্তিলতা মিত্র আর ক্ষণপ্রভা ঘোষ (ঠাকুরমা) সর্বসময় বাহিনীর সঙ্গে যুক্ত থেকে সকলকে উৎসাহ ও প্রেরণা জুগিয়েছেন। এছাড়া সর্বশ্রী অসিতকুমার মিত্র, রাসবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রশান্তকুমার ঘোষাল, বিমানবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায়, সমীর বসুমল্লিক, জ্যোতির্ময় চট্টোপাধ্যায়, আশিসকুমার চট্টোপাধ্যায়, ৺জয়দেব চট্টোপাধ্যায়, ৺নবীনমাধব চট্টোপাধ্যায়ও বিভিন্ন দলের পরিচালনা করেছেন।

নবারুণ সমিতি—১৯৫৪ সালের এপ্রিল মাসে সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয়। খেলাধূলা মুখ্য উদ্দেশ্য হলেও সমিতি বিভিন্ন সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতারও আয়োজন করে। আরও কিছু জনকল্যাণমূলক কাজ করতে সভ্যরা আগ্রহী। সম্প্রতি সমিতি বিরাট ব্যয়ে খেলার মাঠ সংগ্রহ করতে পেরেছে। বর্তমান সদস্য সংখ্যা ১১৫।

শক্তিসঙ্ঘ—১৯২৩ সালের 'শক্তিকুটির' ও 'কোন্নগর বয়েজ লাইব্রেরী'র একত্রীকরণের ফলে ১৯৩৫ সালে শক্তিসঙ্ঘের আত্মপ্রকাশ। বিভিন্ন বাড়ীতে অবস্থানের পর সঙ্ঘের আনুকূল্যে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এবং পৌরপ্রতিষ্ঠান, সমবায় ব্যাঙ্ক ও প্রাদেশিক সরকারের সাহায্যে পুষ্ট হয়ে সঙ্ঘ ১৯৫৫ সালে নিজস্ব জমি ক্রয় করে। পরে ১৯৭০ সালে দ্বিতল গৃহ নির্মাণ করে। ব্যায়াম অনুশীলন, ভলিবল লীগ প্রতিযোগিতা ও কিছুকাল হস্তলিখিত পত্রিকা 'শক্তি' প্রকাশের মধ্য দিয়া সঙ্ঘ নিজের অস্তিত্ব বজায় রেখেছিল। বর্তমানে এঁরা একটা ছোট লাইব্রেরী পরিচালনা করছেন।

সেণ্ট্রাল পল্লী উন্নয়ন পরিষদ—পরিষদের তৎপরতায় ৪০ বৎসর পূর্বে ১৭, ১৮ ও ১৯নং ওয়ার্ডে উদ্বাস্তু কলোনী গঠিত হয়। এই কলোনী অরবিন্দ পল্লী নামে খ্যাত। পরিষদের চেষ্টায় রাস্তাঘাট নির্মাণ, জলনিকাশী ব্যবস্থা করা সম্ভব হয়েছে। ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক কর্মসূচী, রক্তদান, দুঃস্থ ছাত্রদের আর্থিক সাহায্য, নিয়মিত রাস্তাঘাট পরিষ্কার প্রভৃতির মাধ্যমে পরিষদ দেশসেবা করে চলেছে।

নিখিল বঙ্গ উৎসব সমিতি—কোন্নগর স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর উদ্যোগে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের ১৩৫২ সালে উৎসব সমিতি গঠিত হয়। প্রাতঃকালীন ও বৈকালিক অনুষ্ঠানে সভাপতি ও প্রধান অতিথির পদ অলঙ্কৃত করেন ইন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, নৃসিংহদাস বসু, ডাঃ শরৎকুমার দেব ও ননীগোপাল বসু মহাশয়গণ। যুগ্ম সম্পাদক ছিলেন শ্রীনরেন্দ্র দেব ও সুধীরকুমার মিত্র। প্রভাতফেরী, সংকল্প বাক্য পাঠ, জাতীয় পতাকা উত্তোলন, বিভিন্ন প্রতিযোগিতা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বিশিষ্ট ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতায় উৎসবটি পঞ্চাশ বছর ধরে চলে আসছে। নবগ্রাম ও কানাইপুরের অধিবাসীবৃন্দ এই সমিতির সহিত এখন জড়িত। অমলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ও রাসবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায় এখনও এই সমিতির সহিত সক্রিয়ভাবে যুক্ত আছেন। পরবর্তীকালে সমরেন্দ্রনাথ মিত্র, জিতেন্দ্রনাথ দাস ও মৃন্ময় সাহার ভূমিকাও বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

নগেন্দ্রনাথ কুণ্ডু বিদ্যামন্দির—কুণ্ডু মহাশয়ের আর্থিক সহযোগিতায় ১৯৬২ সালে বিদ্যালয়টি মাত্র ১৭ জন ছাত্রছাত্রী নিয়ে স্থাপিত হয়। তখন সম্পাদক ও প্রধান শিক্ষক ছিলেন যথাক্রমে নীলমাধব মুখার্জী ও ভোলানাথ শূর। পুনর্বাসন দপ্তরের কাছ থেকে ৪ বিঘা জমি নিয়ে ১৯৬৫ সালে জুনিয়ার হাই ও ১৯৭০ সালে Co-education বিদ্যালয় হিসাবে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের অনুমোদন লাভ করে। বিশিষ্ট ব্যক্তি যাঁরা বিদ্যালয়টিকে বর্তমান অবস্থায় রূপান্তরিত করতে সাহায্য করেছেন তাঁদের মধ্যে বৈদ্যনাথ নাগ, বিনোদবিহারী ভট্টাচার্য, কৃষ্ণচন্দ্র ব্যানার্জী, রামপ্রসাদ ভট্টাচার্য, এম. ভি. বৈদ্য, অধীর মুখার্জী, ডাঃ নীলমণি বন্দ্যোপাধ্যায়, ডাঃ কার্তিক আচার্য প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। বর্তমানে ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা ৮৫০ জন, শিক্ষাকর্মী ২১ জন। মাধ্যমিকে পাশের হার সন্তোষজনক।

এই বিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্র ও বর্তমানে শিক্ষক শ্রীস্বপন হরি কোন্নগর পৌরসভার বর্তমান সভাধিপতি।

সপ্তর্ষি ব্যায়াম মন্দির—১৯৫৮ সালে প্রতিষ্ঠিত। অল্প সময়ের মধ্যেই নিজেদের ব্যায়ামের জায়গা, ক্লাবঘর তৈরী করে নিয়েছে। সভ্যসংখ্যা আনুমানিক দুই শত। আগে প্রতি বছর ব্যায়াম প্রদর্শনী সমেত বার্ষিক উৎসব অনুষ্ঠিত হত। এখনও ছেলেরা ব্যায়াম, যোগাসন, পাওয়ার লিফটিং চর্চা করলেও উৎসাহে ভাঁটা পড়েছে বলে মনে হয়। মাঝে মাঝে থিয়েটারের মাধ্যমে ক্লাবের কিছু আয় হলেও ব্যায়াম প্রদর্শনীর ব্যবস্থা হচ্ছে না।

মিলন বন্দি ক্লাব—স্থাপিত ১৯৫০ সালে। সভ্যসংখ্যা দুইশত-র উপর। আবৃত্তি ও বসে আঁকো প্রতিযোগিতা, ফুটবল ও ক্রিকেট টুর্নামেণ্ট পরিচালনা, দুঃস্থ খেলোয়াড়দের বিশেষ সাহায্য প্রভৃতির মাধ্যমে ক্লাবটি পরিচালিত হচ্ছে।

কোন্নগর সুইমিং ক্লাব—স্থাপিত ১৯৬৮ সালে। বর্তমান সভ্যসংখ্যা ৩০০। মূলতঃ সাঁতার শেখানো ও অন্যান্য ব্যায়াম শেখানো এঁদের উদ্দেশ্য। এখানে প্রতি বছর সাঁতার প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। এঁদের দুই সদস্য অরূপ ও কমল চক্রবর্তী গঙ্গা, নর্মদা অভিযান করে রেকর্ড করেছেন। কলম্বোতে এশিয় প্যাসিফিক সাঁতারে অংশগ্রহণকারী সাঁওতালী সাঁতারু নীলিমা ওঁরাও এই ক্লাবের সদস্য।

আলোড়ন—কয়েক বছর ধরে এই প্রতিষ্ঠানটি ২৬শে জানুয়ারী বালক-বালিকাদের বার্ষিক শৈত্যক্রীড়ার আয়োজন করে। অসংখ্য বালক-বালিকা এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে। প্রবেশ মূল্য না থাকায় উৎসাহিত হয়ে প্রতি বছরই প্রতিযোগীর সংখ্যা বেড়ে চলেছে। প্রতিযোগিতায় উত্তীর্ণ ছেলে-মেয়েদের মূল্যবান পুরস্কার দেওয়া হয়।

শ্রীঅরবিন্দ ভবন, কোন্নগর—১৯৬৫ সালে মণিবাটীতে প্রতিষ্ঠিত হলেও, ১৯৮৬ সালে শ্রীঅরবিন্দের পৈতৃক ভিটা (৯৪ অরবিন্দ রোড) অধিগৃহীত হয় এবং সেখানে অরবিন্দ ভবন নির্মিত হয়। এখানে অরবিন্দ আশ্রম ও সোসাইটির বিভিন্ন সামগ্রী ও পুস্তক প্রদর্শন ও বিক্রয়, 'উত্তরণ' পত্রিকা প্রকাশ, পাঠাগার পরিচালনা, পাঠ ও আলোচনা নিয়মিতভাবে অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। শ্রীঅরবিন্দ সোসাইটির এই শাখাটির কার্যপরিধি আরও বিস্তার লাভ করবে আশা করা যায়।

মনসাতলা ব্যায়াম মন্দির—প্রতিষ্ঠানটি ১৯৫১ সালে স্থাপিত। সভ্যরা নিজেদের চেষ্টায় ও সাধারণের সহযোগিতায় ১৩ কাঠা জমি সংগ্রহ করেছে। শিশুদের জন্য খেলবার মাঠ ছাড়া যোগব্যায়াম, জিমন্যাসটিক, পাওয়ার লিফটিং প্রভৃতির জন্য পৃথক ঘরের ব্যবস্থা করেছে। সভ্যরা জেলা, রাজ্য ও জাতীয়ভিত্তিক প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে সফল হচ্ছে। এশিয়া মহাদেশের প্রতিযোগিতায় ছেলেরা অংশগ্রহণ করবার সুযোগ পাচ্ছে। এদেরই সভ্য অস্ট্রেলিয়ায় বিশ্ব পাউয়ার লিফ্টিং প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে সাফল্য পেয়েছে। এছাড়াও প্রতিষ্ঠানটি বহুদিন ধরে দাতব্য হোমিও চিকিৎসা বিভাগ পরিচালনা করে সমাজসেবায় নিয়োজিত আছে।

কোন্নগর কল্যাণ পরিষদ—দেশবিভাগের পর উদ্বাস্তুদের মধ্যে বহু শিক্ষাব্রতী এখানে বসবাস করতে শুরু করেন। শিক্ষাবিস্তার ও সমাজ সেবার জন্য ১৯৫৬ সালে যে প্রতিষ্ঠান তাঁরা স্থাপন করেন সেটাই হল কোন্নগর কল্যাণ পরিষদ। সমাজসেবা বা শিক্ষাপ্রসারে এঁদের অবদান অনস্বীকার্য। রাজেন্দ্র স্মৃতি বিদ্যালয় (১৯৫৯) ও শ্রীঅরবিন্দ বিদ্যাপীঠ (?) দুইটি উচ্চ বিদ্যালয় ছাড়াও, কল্যাণ পরিষদের (১) শিশু শিক্ষা-সদন প্রাক বুনিয়াদী (১৯৫৯), (২) শিল্প ও কলাকেন্দ্র (১৯৫৬), নিম্ন বুনিয়াদী (১৯৬১), বালিকা শিক্ষাসদন নিম্ন ও উচ্চ বুনিয়াদী (১৯৬২)। বালিকা-শিক্ষাসদন উচ্চবিদ্যালয় (১৯৬৩)। কম্পিউটার ট্রেনিং সেণ্টার (১৯৯৩)। শিক্ষকশিক্ষণ বিদ্যালয় মণ্টেসরী, প্রাক বুনিয়াদী ও প্রাথমিক (১৯৯৪) প্রভৃতি প্রতিষ্ঠা করে কল্যাণ পরিষদ কোন্নগরের বিশেষ কল্যাণ সাধন করেছেন বললে অত্যুক্তি হবে না।

কোন্নগর বিবেকানন্দ যুব মহামণ্ডল—কোন্নগর বিবেকানন্দ যুব মহামণ্ডল অখিল ভারত বিবেকানন্দ যুব মহামণ্ডলের অনুমোদিত একটি শাখা কেন্দ্র। স্থানীয় এই কেন্দ্র স্থাপিত হয় ১৯৭৫-এর একেবারে গোড়ায় এবং ইহার কার্যালয় ৭৩নং ক্রাইপার রোডে অবস্থিত। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে শতাধিক শাখাকেন্দ্রের মাধ্যমে আজ প্রায় দীর্ঘ ৩০ বছর ধরে মহামণ্ডল কাজ করে চলেছে। মহামণ্ডল সম্পূর্ণভাবে স্বামী বিবেকানন্দের ভাবাদর্শে চরিত্র গঠন-মুখী লোকহিতৈষী সংস্থা। মানুষ গড়ার সংকল্পে দেশের তরুণ ও যুবকদের উদ্বুদ্ধ করাই মহামণ্ডলের লক্ষ্য। মূলতঃ মহামণ্ডল একটি মানুষ হওয়ার আন্দোলন। এই শাখাকেন্দ্রগুলিতে মহামণ্ডলের কর্মধারা অনুযায়ী জীবনের উদ্দেশ্য ও আদর্শ, যুবমানসের নৈতিক ভিত্তি এবং মূল্যবোধ সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা গড়ে তুলতে সহায়তার জন্যে বহুরকমের সেবামূলক কাজের ব্যবস্থাও আছে। যেমন—ছাত্রসহায়ক কেন্দ্র, দাতব্য চিকিৎসা কেন্দ্র, শিশুবিভাগ (বিবেক বাহিনী), বয়স্ক শিক্ষণ কেন্দ্র, পাঠাগার, পাঠক্রম, আলোচনা সভা, স্বাস্থ্যচর্চা ইত্যাদি। এই উদ্দেশ্যে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে বিভিন্ন সময়ে আঞ্চলিক ও সর্বভারতীয় যুব প্রশিক্ষণ শিবিরের ব্যবস্থা করা হয়। মহামণ্ডল একটি দ্বিভাষিক (ইংরাজী ও বাংলা) মাসিক মুখপত্র "বিবেক জীবন"—এই আদর্শও সংস্থার সংবাদাদি প্রচারের জন্যে প্রকাশ করে থাকে।

সম্প্রতি ৭৭/এইচ, ক্রাইপার রোডে অখিল ভারত বিবেকানন্দ যুব মহামণ্ডলের অসম্পূর্ণ ভবনের একতলাটি নির্মিত হওয়ায় সেখানে নানাবিধ সভা, সাংগঠনিক কাজ ও অনুষ্ঠান হয়ে চলেছে। বর্তমানে কোন্নগর মহা-মণ্ডল শাখাকেন্দ্রের সদস্যসংখ্যা ৫২ জন।

যুক্তিমন—স্থাপিত ১৯৮৭। প্রতি বৎসর এঁরা বিজ্ঞানমেলার আয়োজন করেন। 'বীক্ষণ' নামে ত্রৈমাসিক দেওয়াল পত্রিকা প্রকাশ, অংকন ও আবৃত্তি প্রশিক্ষণ প্রভৃতির মধ্য দিয়ে নিজেদের প্রসার করে চলেছেন। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও বুদ্ধিজীবী মানুষ এঁদের কাজে সহযোগিতা করছেন।

সঞ্চারী—স্থাপিত ১৯৮০ সাল। মূলতঃ ইহা একটি নাট্যামোদী সংস্থা। প্রতি বছর এঁরা ভিন্ন স্বাদের নাটক অভিনয় করে দর্শকগণের পরিতৃপ্তি সাধন করেন। ছোটদের জন্য আবৃত্তি ও অংকন প্রতিযোগিতা, আন্তঃক্লাব ক্যারম প্রতিযোগিতা ও খেলাধূলার আয়োজনও করে আসছেন।

নিখিল ভারত বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন (হুগলী শাখা)—বিশ বছর আগে সাহিত্যানুরাগীদের প্রচেষ্টায় এই শাখা কার্যালয় কোন্নগরের দয়াল শিরোমণি লেনে প্রতিষ্ঠিত হয়। শাখাটির বর্তমান সদস্য সংখ্যা শতাধিক। এই শাখার বর্তমান সভাপতি রাসবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায় (কোন্নগর) ও সম্পাদক পিনাকীভূষণ চক্রবর্তী (সিঙ্গুর)।

কোন্নগর মিলন সংঘ—১৯৫৪ সালে প্রতিষ্ঠিত হলেও ১৯৫৬ সাল থেকে ক্রিকেট, ফুটবল প্রতিযোগিতায় সংঘ সাফল্য লাভ করতে শুরু করে। টেবিল টেনিসেও জেলা বা রাজ্য স্তরে এদের দক্ষতার পরিচয় পাওয়া যায়। সংঘের একটা নিজস্ব লাইব্রেরী আছে। লাইব্রেরীর সভ্যসংখ্যা দুই শতাধিক, পুস্তক সংখ্যাও তিন সহস্রের উপর। নিজেদের চেষ্টায় ও সাধারণের সহযোগিতায় এঁরা ক্লাইপার রোডে দ্বিতল ভবন তৈরী করতে সফল হয়েছেন। প্রতি বছর উৎসবের মাধ্যমে সংগৃহীত অর্থে গরীব ছেলে-মেয়েদের জামাকাপড় দান, দুঃস্থ পরিবারের মেয়ের বিবাহে আর্থিক সাহায্য, অসুস্থ রোগীদের চিকিৎসা ব্যবস্থা প্রভৃতি সেবামূলক কাজও এঁরা করে থাকেন।

জাগো কালচারাল ইউনিট—বারোজন সভ্য নিয়ে শিশুশিক্ষা প্রসারের উদ্দেশ্যে ১৯৬৫ সালে স্থাপিত। বিভিন্ন কারণে কিছুদিন পরে চালানো সম্ভব হয়নি। তবে আবৃত্তি, অংকন প্রতিযোগিতা ও বার্ষিক নাটক পরিচালনা করে চলেছে বর্তমান ২৫ জন সভ্য নিয়ে। এখন ইউনিটের নিজস্ব ঘর তৈরী হয়েছে।

কোন্নগর আইডিয়াল সোসাইটি—কোন্নগরের সমাজজীবনে ইহা একটি বিশিষ্ট প্রতিষ্ঠান। ১৯৭৬ সালে প্রতিষ্ঠিত এই প্রতিষ্ঠান ২৫ বছর ধরে

বার্ষিক শৈত্যক্রীড়া পরিচালনা করে বিশেষ আলোড়নের সৃষ্টি করেছিল। ছয় বছর ধরে 'কোন্নগর প্রকাশিকা' মারফৎ কোন্নগরের বিভিন্ন তথ্য ও সংবাদ প্রকাশ করে সকলের প্রশংসাভাজন হয়ে উঠে। সমগ্র প্রকাশিকা কোন্নগর লাইব্রেরীতে উত্তরসূরীগণের জন্য রাখা আছে। এদের সমবায় বিভাগ 'মিউচুয়াল বেনিফিট ফাণ্ড' ১৯৪৫ থেকে চালু আছে। অরেজিষ্ট্রীকৃত এইরূপ প্রতিষ্ঠান আর কোথাও আছে কিনা সন্দেহ। এরা নিজেদের চেষ্টায় নিজস্ব দ্বিতল বাটী নির্মাণ করেছে। এই প্রতিষ্ঠানটি কোন্নগর সমবায় ব্যাঙ্কে কয়েকটি এনডাউমেণ্ট ফাণ্ড সৃষ্টি করেছে। এই ফাণ্ডের সুদ থেকে স্থানীয় স্কুলগুলির ভাল ছেলেমেয়েদের পুরস্কার দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে। এদের গঠিত 'Poor Fund' থেকে গরীবদের চিকিৎসা ও বিবাহ বাবদ সাহায্য দেওয়া হয়। সমবায় বিভাগের ৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষে কোন্নগর মাতৃসদনে ফ্রী বেডের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এই উপলক্ষে 'আমাদের কোন্নগর' নামে একটা তথ্যসম্বলিত পুস্তক প্রকাশিত হচ্ছে। বার্ষিক উৎসবে নাট্যানুষ্ঠানও এদের একটি বৈশিষ্ট্য।

এ ছাড়াও দশ বছর আগে মহিলামঙ্গল প্রতিষ্ঠান স্থাপন করে মহিলাদের সেলাই শিক্ষা দেওয়া হয়। শিক্ষান্তে অনেক মহিলা স্বোপার্জনের ব্যবস্থা করে নিতে পেরেছে।

—